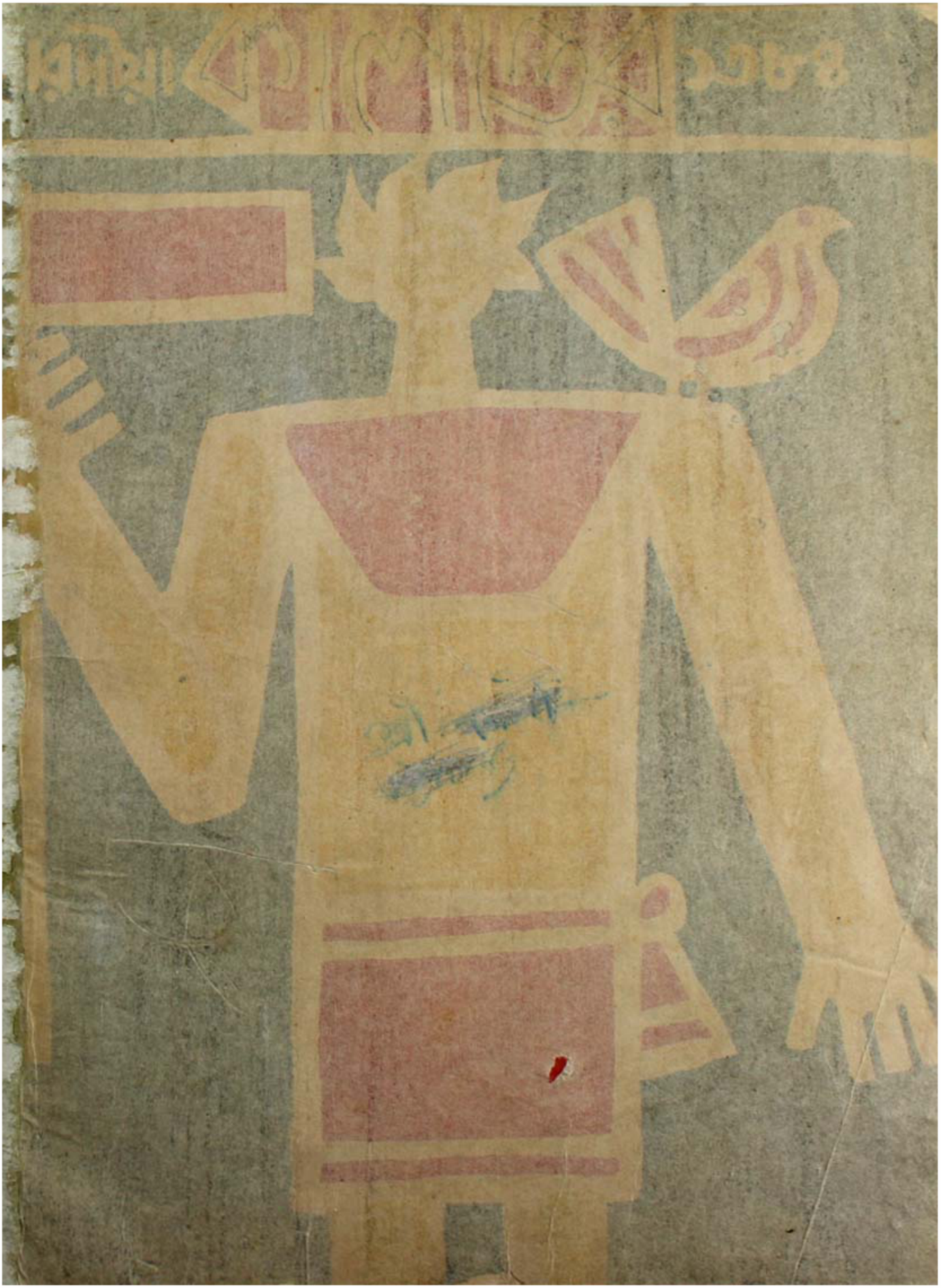

উৎসবের মেজাজে আনতে চাই...

কেয়ো-কার্পিন

কেশ তৈল

Dey's দে'জ মেডিকেলের তৈরী

শারদীয় কালান্তর

আশ্বিন ১৩৮৪ অক্টোবর ১৯৭৭

প্রবন্ধ

নভেম্বর বিপ্লবের ষাট বর্ষ পূর্তি ১ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
রাজনীতিতে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৮ গোপাল হালদার
বর্তমান চীন ও মাও সে তুং-এর অপ্রচলিত দলিল ২৬ অমলেশ দাশগুপ্ত
রাজনৈতিক শক্তিসাম্যের পুনর্বিন্যাসের বর্তমান স্তরে
মতাদর্শগত সংগ্রামের ভূমিকা ৪৪ সুনীল মুখার্জি
পেছনের টান : অগ্রগতির অন্তরায় ৭১ জ্যোতি দাশগুপ্ত
ইতিহাস নিয়ে রাজনীতি ৮০ নরহরি কবিরাজ
ঈশ্বরচন্দ্র ও লোকায়ত জীবন ১১৭ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

.....

রিপোর্তাজ

পৌষ পেরিয়ে ৫০ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

উপন্যাস

বিবাহ বার্ষিকী ১৬ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ন্যাশি ৩৪ গোলাম কুদ্দুস
ভারতবর্ষের মুখ দেখিয়াছি ৬৩ সৌরি ঘটক
জলান্তর ৭৯ চিত্তরঞ্জন ঘোষ
বলির বাজনা ৮৩ অমলেন্দু চক্রবর্তী
এই সব কেলে রেখে ৯৩ মলয় দাশগুপ্ত

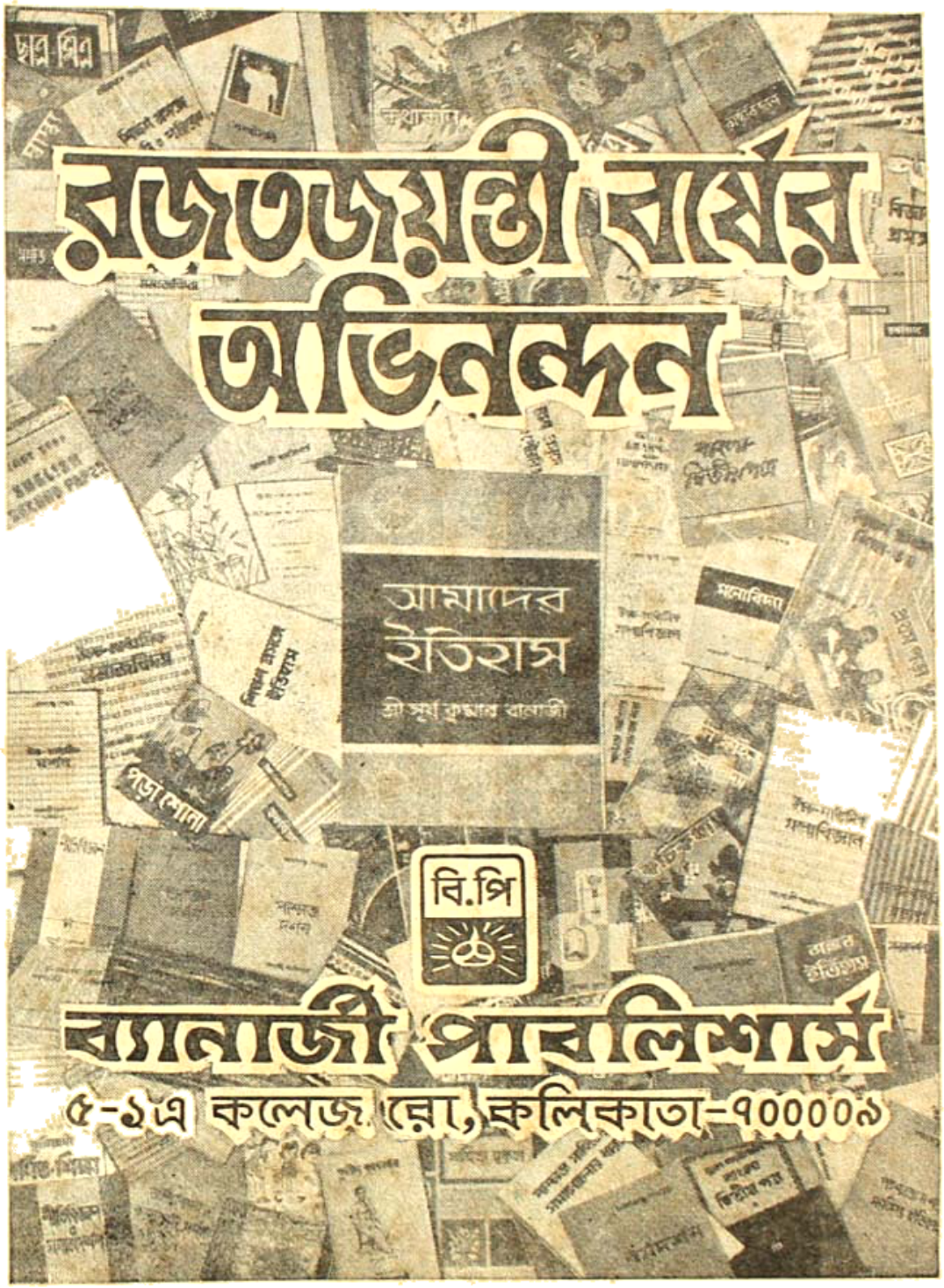
রজতজয়ন্তী বর্ষের
অভিনন্দন
আমাদের
ইতিহাস
বি.পি
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫-১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

রম্য রচনা

এমন হ'লে কেমন হয় ? ১৮ চিত্তপ্রিয় রায়

কবিতা

মিত্র ৫৬ বিষ্ণু দে ৭৩ বিমল চন্দ্র ঘোষ ৫৬ অন্নদাশঙ্কর রায় ৫৭ যতীন্দ্র রায় ৫৭ রাম বসু ৫৮
মিতাভ দাশগুপ্ত ৫৮ সিদ্ধেশ্বর সেন ৫৯ তরুণ সান্যাল ৬০ চিত্ত ঘোষ ৬০ গণেশ বসু ৬১
তুলসী মুখোপাধ্যায় ৬১ রণজিৎ কুমার সেন ৬২ শিবশম্ভু পাল ৬২ সত্য গুহ ৬৩
শুভ বসু ৬৩ রত্নেশ্বর হাজরা ৬৪

খেলা

ম্যাচম্যান একজনই ১০১ মতি নন্দী
টেবিল টেনিস ফুল : একটি রিকচিহ্ন ১০৩ শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
ফুটবল থেকে ফুটবল লড়াইয়ে ১০৭ রূপক সাহা
স্টেডিয়ামে বাংলার মান অন্তাদশপ্রায় ১১০ বিশু শর্মা
ভালবেসে খেলাধূলা হতে পারে ১১৫ প্রসাদ রায়

যাত্রা ও চলচ্চিত্র

যাত্রা শিল্প ১১৪ সত্য ঘোষাল
বাংলা চলচ্চিত্র বিষয়ে কিছু ভাবনা ১১৯ পর্যবেক্ষক

চিত্র

দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ১১, ৪২, ৮২, ১২৫, ১৩১, ১৪১
সীতেশ রায় ৬৪, ১৫
সুবোধ দাশগুপ্ত ৫০
মেক্সিকোর শিল্পী অঙ্কিত সুনীতিকুমারের প্রতিকৃতি ১

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

অলঙ্করণ
রণজিৎ সেনগুপ্ত

সম্পাদক : জ্যোতি দাশগুপ্ত

শুদ্ধিপাঠ : কবিতা অংশে পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪২—৪৪'র স্থলে পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৭—৬৪ পড়তে হবে।

ক্রমবর্ধমান খরচের প্রয়োজন মেটাতে সঞ্চয় করতে থাকুন...

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক-এর

মনি মাল্টিপ্লায়ার ডিপজিট স্কীম-এ টাকা লগ্নী করুন

দেখুন কিভাবে ৫০০০ টাকা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১০,০৪০ টাকায় মাত্র ৭ বছরে এবং ১৩,৫৩৫ টাকা হয় মাত্র ১০ বছরে।

এইভাবে, মনি মাল্টিপ্লায়ার ডিপজিট স্কীমে আপনার সঞ্চয় কত তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় যার ফলে আপনার প্রয়োজনীয় খরচ অনায়াসে মেটাতে পারেন।

খরচের চেয়ে সঞ্চয় সবসময় বেশী থাকে।

বিনা বিবরণের জন্যে আপনার কাছাকাছি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক-এর শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করুন

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

যে ব্যাঙ্ক নানা দেশে নানা লোকের সেবায় আগ্রহী

CBI-004/71 BN

টনিক থেকে আই-ড্রপ—
লক্ষ লক্ষ গৃহস্থের আমরা পারিবারিক বন্ধু

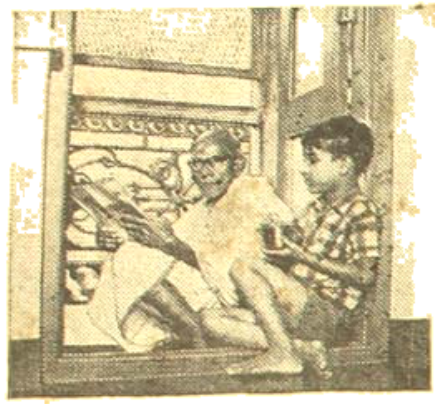

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স্—লক্ষ লক্ষ
দেশবাসীকে যুগিয়ে চলেছে উৎকৃষ্ট ওষুধ

'অসুখে ঠেকায় আমরা বন্ধু চেনা যায়'—যে কেউ প্রবাদ অনুযায়ী আমাদের যাচাই ক'রে নিতে পারেন। শুধু তাদেরকে ভাগ্যবানদের কথা নয়, এদেশের লক্ষ লক্ষ গৃহস্থের কাছে ছোটবড় সকলেরই আমরা পারিবারিক বন্ধু। বুড়ো ঠাকুরমার তৈরী যেমন আই-ড্রপ, তেমনি বাড়ন্ত শিশুর জন্যে টনিক—আমরা যুগিয়ে থাকি। তাছাড়াও আমরা তৈরি করি বিস্তর ধরনের আধুনিক ওষুধপত্র—সকলের সাধ্যে কুলোয় এমন দামে।

এ কাজে আমরা হাত দিই সেই ১৯৩৬ সালে। অভিজ্ঞ কয়েকজন বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ আর ভেষজতত্ত্বজ্ঞ মিলে সাধারণ মানুষকে ওষুধ যোগাবেন ব'লে গড়ে তুলেছিলেন ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড। ওষুধের গবেষণা, উৎপাদন আর বিক্রিব্যবস্থায় নিজেদের পায়ে দাঁড়ানো—এই ছিল তাঁদের ব্রত।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্ লিমিটেড আপনাদের সেবায়

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ
সুস্থ ও সবল শিশুই জাতির সম্পদ

আজই যে কোন নিকটবর্তী
হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে
যোগাযোগ করে শিশুকল্যাণ
কর্মসূচীর সুযোগ নিন।

পশ্চিমবঙ্গ পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা সংস্থার
মাস মিডিয়া ডিভিসন হইতে প্রচারিত।

বিজ্ঞাপন সংখ্যা : ৬২/৭৭-৭৮

দ্বিতীয় শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত হাজার বছরের সংস্কৃত সাহিত্য

সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার

বাংলা হরফে মূলসহ বঙ্গানুবাদ

অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, ভারবি, বিষ্ণুশর্মা, অমরু, ভর্তৃহরি, দণ্ডী, বানভট্ট, হর্ষ, শূদ্রক, বিশাখদত্ত, ভবভূতি, ভট্টনারায়ণ, মাঘ, কৃষ্ণমিশ্র, শ্রীহর্ষ, নারায়ণপণ্ডিত, জয়দেব প্রমুখের শ্রেষ্ঠ অবদান।

প্রধান উপদেষ্টা : ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী

গ্রাহক মূল্য : ১২০, টাকা। ২০, টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে। প্রথম দাত খণ্ড ১৭ টাকা করে এবং শেষ খণ্ড ২২, টাকা দেয়। জানুয়ারীতে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবে। গ্রাহক করা হচ্ছে। এককালীন গ্রাহক চাঁদা ২০০ টাকা।

নেতাজী অন্তর্ধান রহস্য

নেতাজীর ভারত ত্যাগের একমাত্র সঙ্গী ভগতরাম তলোয়ারের নিজস্ব অভিজ্ঞতার কাহিনী। ভগতরাম হলেন সেই ব্যক্তি একমাত্র যাঁর কাছে বার্লিন ও টোকিও থেকে নেতাজীর নির্দেশ আসতো।

গ্রাহক মূল্য : ১৫, টাকা। ৭, টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে। বই প্রকাশের পর বাকী ৮; টাকা দেয়। ডিসেম্বরে প্রকাশিত হবে। গ্রাহক করা হচ্ছে।

ভারতের নৃত্যকলা

লেখিকা গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়। খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পীর গবেষণাধর্মী মূল্যবান গ্রন্থ।

শতাধিক আর্টপ্লেট শোভিত।

গ্রাহক মূল্য : ২০, টাকা। ১০, টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে। বাকী ১০, টাকা বই নেওয়ার সময় দিতে হবে। গ্রাহক করা হচ্ছে।

তুলসী দাসের

রামচরিতমানস

বাংলা হরফে মূলসহ বঙ্গানুবাদ

দুই খণ্ডে সমাপ্য। গ্রাহক মূল্য : ৩০, টাকা। ১০, টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে। প্রতিখণ্ড নেওয়ার সময় ১০, টাকা করে দিতে হবে। ফেব্রুয়ারীতে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবে।

গ্রাহক করা হচ্ছে।

আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি বই

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের

কে কোথায় যায়

পার্টি হোলটাইমারদের জীবন নিয়ে লেখা

অসাধারণ উপন্যাস। ৭'০০

ডাকবাংলোর ডায়রী

গ্রাম বাংলার জীবনচিত্র। ২য় মুদ্রণ। ১০'০০

ভূতের বেগার

গল্পের মতো করে লেখা মার্কসবাদী

অর্থনীতির মূলকথা। ৮'০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী

আদি কলকাতার গহনের যুগের

প্রামাণিক কাহিনী। ২০'০০

প্রফুল্ল বসুর

অন্য দিক

অবহেলিতা নারীজীবনের জীবনচিত্র

দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭'০০

বিমল করের

বনভূমি

লেখকের প্রথম উপন্যাস। ১২'০০

হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শিকার

নিছক অভিজ্ঞতা কাহিনী। ২০'০০

নবগ্রন্থ প্রকাশন

৪৯ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

With best Compliments of :

ESTD. 1919

HUKUMCHAND JUTE MILLS LIMITED

Regd. Office : 15, INDIA EXCHANGE PLACE, CALCUTTA-700001

JUTE MILLS DIVISION :

Manufacturers & Exporters of :

QUALITY HESSIAN, SACKING, CARPET BACKING CLOTH. TWINE, COTTON BAGGING, JUTE YARN, JUTE FELT ETC.

MILLS AT :

NAIHATI, P.O. HAZINAGAR. Dist. 24-PARGANAS (WEST BENGAL)

CHEMICALS DIVISION :

Manufacturers of :

CAUSTIC SODA LYE (Rayon Grade) LIQUID CHLORINE, HYDROCHLORIC ACID & HYPOCHLORITE

PLANT AT :

AMLAI, P.O. AMLAI PAPER MILLS, Dist. SHAHDOL (M. P.)

নভেম্বর বিপ্লবের ষষ্টিবর্ষ পূর্তি

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১২৭৭ সালে আমাদের এই ভারতবর্ষ উদ্‌যাপন করছে তার স্বাধীনতার ত্রিশবর্ষ পূর্তি আর সোভিয়েট ভূমিতে সোস্যালিস্ট ব্যবস্থার বয়স হবে ষাট। এই বছরেরই প্রথমার্ধে লোকসভা (আর বহু রাজ্যে বিধানসভা) নির্বাচনের আগেকার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ওলট-পালট ঘটেছে, ক্ষমতার পালা-বদল হয়েছে, দেশ কোন পথে চলবে বা না চলবে তা নিয়ে ঘোরতর জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেছে যে একটা ব্যাপারে এদেশে তেমন একটা মতভেদ নেই—সবাই চায় যে ভারতবর্ষ এবং সোভিয়েটের মধ্যে যে বন্ধুতা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে প্রাকস্বাধীনতা যুগ থেকেই যা বিকাশ পেয়ে এসেছে, প্রায় সর্ববিধ দলমত নির্বিশেষে সেই বন্ধুতাকে আমরা অটুট রাখতে চাই। এজন্যই উভয় দেশে এবার যে শুভ বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তা একেবারে সময়োচিত ও সমুচিত ও সুখকর।

ভারতবর্ষে আমাদের আজও সমস্যার পর সমস্যা—তার যেন কোনো অবধি নেই—জনজীবনে জঞ্জাল এত জমেছে যে এখনও তাকে সরিয়ে স্বাধীন-সুখী দেশ গড়ার কাজে আমাদের অনেক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে যেতে হবে। খুব বেশি দিনের কথা নয়, যে বিশাল রুশ সাম্রাজ্যে সোভিয়েট শাসনের পত্তন হয় ষাট বছর আগে, ইয়োরোপ-এশিয়ার বিস্তৃত সেই সাম্রাজ্য ছিল 'বহু জাতির কারাগার', আমাদের চেয়ে বেশি বই কম পশ্চাৎ-পদ নয় এমন নানা অঞ্চল তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ দেশের সবচেয়ে কাছে, একেবারে আফগানিস্তানের লাগোয়া হল তাজিকিস্তান, যা সর্বদিক থেকে ভারতবর্ষের প্রায় যে-কোনো এলাকার চেয়ে পিছিয়ে ছিল, উজবেকিস্তান, কিরঘিজস্তান, তুর্কমেনিস্তার প্রভৃতির মতো মধ্য এশিয়ার মরুপ্রধান দেশগুলো যেখানে মধ্যযুগীয় ধনাত্মকারেই বিদ্যমান ছিল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী সরকার এক-সময় ভারতবাসীকে ধোঁকা দিত এই বলে যে এদেশের স্বাধীনতা সম্ভব নয় কারণ এখানকার হেলাফেলা আর অন্যান্য অজস্র সমস্যা এমনই যে নিজের দেশের ভার নিজের হাতে তুলে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, সদাশয় ইংরেজ সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় বাস করা হল আমাদের যেন এক বিধিদত্ত বিধান। আজকের স্বাধীন দেশেও মুক্তির পরিণতি যে সমাজবাদী ব্যবস্থা ব্যাপক জনজীবনে স্বস্তি আর সৌষ্ঠব আনবে বলে আমাদের আশা, তা পরিপূর্ণ হবার স্পষ্ট লক্ষণ বেশি নেই। কারণ আবার শোনা যায় এ দেশের অর্থনীতি এবং মুদ্রাস্ফীতি সমস্যার কথা। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন অল্প-কালের জন্য সোভিয়েট দেশে গিয়ে-ছিলেন, তখন সে দেশে আজকের সমৃদ্ধি নেই, তারা তখনও প্রায় অসম্ভব রকম প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে নিজের পায়ে শুধুমাত্র দাঁড়াতে পেরেছে—কিন্তু তখনই বহু জাতির এবং একাধ বিভিন্ন স্তরের মানুষকে একত্র করে এগিয়ে যাওয়ার সেই প্রদীপ্ত প্রয়াস দেখে কবির মন তৃপ্ত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ঐ "ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ" না দেখলে তাঁর জীবনের পরিক্রমা অসম্পূর্ণ থেকে যেত, এবং বলেছিলেন, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা দেখে যাক "এনিমি ডিফিকাল্টিজ" ("প্রচণ্ড সমস্যাপুঞ্জ") অতিক্রম করে সোভিয়েট সমাজ কেমনভাবে নবজীবন নির্মাণ করতে পেরেছে।

ইতিহাসের মাপকাঠিতে ষাট বৎসর খুব একটা দীর্ঘ সময় নয়। খ্রীস্টানদের ধর্মগ্রন্থ 'বাইবেল' অনুযায়ী মানুষের জীবনের মেয়াদ হল 'তিন কুড়ি-দশ' অর্থাৎ সত্তর। একজনের আয়ুষ্কালের চেয়ে দশ বৎসর কম হল আজ সোভিয়েট সমাজের বয়স। এই ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে তার কীর্তি নিয়ে জগৎ জুড়ে পর্যালোচনা চলছে—সমাজবাদ সাম্য-বাদের শত্রু যারা, তারা অবশ্য একে উপেক্ষা করার প্রয়াস করবে, উল্টো-পাল্টা কথা তুলে, অপবাদ রটিয়ে, নানাভাবে এই বার্ষিকীর ঐতিহাসিক গুরুত্বকে ম্লান করার চেষ্টা করবে। কিন্তু ইতিহাসে প্রথম সমাজবাদী রাষ্ট্র এবং তার ষাট বছরের কার্যকলাপ দুনিয়ার মানচিত্রে শুধু নয়, সর্বদেশে মানুষের মনে যে ছাপ এঁকেছে, তাকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

কেউ বলবে না, এবং বললে হাস্যাস্পদ হবে যে, সোভিয়েট ভূমিতে স্বর্গ রাজ্য দেখা দিয়েছে—স্বর্গ যদি থাকে তো মানুষ সেখান থেকে বিদায় নিতেই চাইবে, অক্লম এই জগতে তার জীবন, অথর্ব বেদের ভাষায় 'মাতা ভূমিঃ, পুত্রোঽহম্ পৃথিব্যাঃ'

('মাটি আমার মা, আমি পৃথিবীর পুত্র'), স্বর্গের বাস্তুকৃত প্রশান্তিতে তার অরুচি, সম্পূর্ণ নিখুঁৎ নীরক্ত অবিচল পরিবেশে তার প্রাণহীনতাবোধ—কেন জানতে চাব যে সোভিয়েটে বা অন্য কোনো কল্পরাজ্যে সবই হল শুদ্ধ, মানুষের ব্যবহারে দোষ নেই ত্রুটি নেই গ্লানি নেই ভুলভ্রান্তি নেই দুর্বলতা নেই, মার্কসবাদের জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় চক্ষু উন্মীলিত হওয়ার ফলে সবাই অতিমানুষের স্তরে উঠে গেছে? আমাদেরই মতো দোষেগুণে পড়া মানুষ বাস করে সে দেশে—ঘটনা সমাবেশে ইতিহাসের বিধানে, এবং সেই বিধানকে কার্যকরী করার হাতিয়ার হিসেবে লেনিনের মতো বিরাট পুরুষের নেতৃত্বে চালিত বলশেভিক-দের ভূমিকার ফলাফলে, বিপ্লবের জন্ম সেখানে ঘটেছে, এবং ঘটেছে বলেই সোটা দুনিয়াতে, কোথাও কম কোথাও বেশি, এক ধরনের ভূমিকম্প হয়েছে, ধনবাদী কাঠামোর এমন ফাটল দেখা দিয়েছে যার মেরামত সম্ভব নয় বলে তার পতন হল অনিবার্য—এ জন্যই মন্তেরর বিপ্লব সর্বজনের নমস্য ঘটনা, এমনই নমস্য যে সোভিয়েট সমাজের কোনো ত্রুটি বা অবিবেচনা বা অবাধ্যতা বা অপূর্ণতা সেই বিপ্লবের মহিমাকে খর্বন করতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের কথা আগেই একটু বলা হয়েছে—আরও অনেক কিছু একই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। ১৯২৭ সালে পিতা মতিলাল নেহরুর সঙ্গে জওহরলাল সোভিয়েট দেখে যান এবং লেখেন যে রুশ দেশ যদি দারিদ্র্য আর নিরক্ষরতার সমস্যা সমাধান করতে পারে তো এ দেশে আমাদের কাজ সহজ হবে। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিরূপে তিনি বলেন যে বহু ব্যাপারে মতভেদ সত্ত্বেও তিনি জানেন যে "আমাদের এই আপাতকালের যুগে সোভিয়েট দেশে এক নতুন ব্যবস্থা আর নতুন সভ্যতাকে উর্ধ্বে তুলে ধরার বিরাট ও মনোহর প্রয়াস হল ভবিষ্যতের প্রেক্ষ প্রতিশ্রুতি।" তিনি আরও বলেন: "ভবিষ্যত যদি আজ আশাপূর্ণ হয় তো বহুলাংশে তার হেতু হল সোভিয়েটের অস্তিত্ব, এবং বিশ্বব্যাপী কোনো বিপর্যয় যদি বাধা-স্বরূপ হয়ে না দাঁড়ায় তো এই নতুন সভ্যতা অচিরে দেশে ছড়িয়ে পড়বে আর ধনতন্ত্র যে যুদ্ধের আগুনে ইন্ধন দেয় তাকে নিঃশেষ করবে।" জওহরলাল নেহরু ভাবের দিক থেকে সাম্যবাদকে গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু স্বাধীনতা ও সমাজবাদের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক তিনি জানতেন। ১৯৩৩ সালের এক রচনায় তিনি লেখেন: "আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কাজ করি, কারণ আমার জাতীয়তাবাদী সত্তা বিদেশী প্রভুত্ব সহ্য করতে পারে না। এজন্য আমি কাজ করি আরও বেশি, কারণ আমার বিচারে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দিকে এগোতে হলে স্বাধীনতা চাই-ই চাই।" রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক মুক্তি সোভিয়েট ভূমির বহুজাতিক জনযূথ আয়ত্ত করে ইতিহাসে নবযুগের প্রবর্তন করেছে। সমাজবাদ সোভিয়েট ভূমি থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে আজ পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। সমাজবাদী দুনিয়া অবশ্য এখনও সর্বথা সংহত নয়; চীন সেখানে প্রকারান্তরে ধনতান্ত্রিক শক্তিকে আনুকূল্য দিতে অস্বীকৃত নয়, কারণ সোভিয়েট ও অন্যান্য সোস্যালিস্ট দেশের সঙ্গে তার তাত্ত্বিক বিতর্ক মেটে নি এবং কেমন যেন বিষাক্ত রূপ নিয়েছে; বর্তমান জটিল বিশ্ব পরিস্থিতিতে সমাজবাদী দেশগুলির নিজস্ব সমস্ত সমস্যারই যে সম্পূর্ণ যুক্তি সমাধান সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে, তাও নয়। কিন্তু এই সোস্যালিস্ট দুনিয়া আজকের মানচিত্রে জাজ্বল্যমান বলেই সব দেশের মুক্তি সংগ্রাম সাফল্যের দিকে জোরে এগিয়ে যাবার সঙ্গতি আর উদ্দীপনা সংগ্রহ করতে পারছে।

সোভিয়েট ভূমির মতো ভারতবর্ষেও বহু জাতি উপজাতির নিবাস; দুই দেশের পরিস্থিতিতে অবিকল না হলেও সাদৃশ্য আছে, মোটামুটি কিছু মিল আছে। তামিলনাড়ুতে 'দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাষগম্' আন্দোলনের কথা আমরা জানি—উত্তর ভারতীয় প্রাধান্যের বিপক্ষে তার অভিযান। কিছুটা এখন স্তিমিত হলেও তার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। এ ছাড়া আছে নাগা বা মিজোদের নিয়ে প্রশ্ন, কাশ্মীরের ভূমিকা বিষয়ে দ্বিধা, অন্যান্য উপজাতির জীবনসমস্যা সম্বন্ধে সমস্যা। অনেকেই আমরা জানি না যে তামিলনাড়ুতে দ্রাবিড় আন্দোলনের মূল প্রবক্তা, 'পেরিয়ার' রামস্বামী নায়েকর ১৯৩২ সালে দুজন সহচর নিয়ে যাঁহাজে আত্মগোপন করে সোভিয়েট দেশে গিয়েছিলেন এবং ফিরে বলেন উৎফুল্ল হয়ে যে জাতি-বিষয়ক প্রশ্নের সমাধান সেখানে এমনভাবে হয়েছে যে বিতণ্ডা আর সংঘর্ষ দূর হয়েছে। এ জন্যই বহুজাতিক সোভিয়েট ভূমিতে জাতিবের বলে কারুর অস্তিত্ব নেই: অতীতের অবশিষ্ট যদি অল্প কিছু থাকে তো তা যে

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

Nava Bharat Enterprises Private Limited

"Nilhat House Annexe"

11 R. N. Mukherjee Road
Calcutta-700001

Regd. Office :

"Nava Bharat House"
6-3-654 Somajiguda
Hyderabad-500004

Other Branches :

BOMBAY
MADRAS
DELHI
BANGALORE

অকিঞ্চিৎকর এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এজন্যই এশিয়া ও মধ্যে অবস্থিত সোভিয়েট অঞ্চলগুলির মধ্যভাগ থেকে সমাজবাদে সংক্রমণকে মনে হয় যেন ইতিহাসের এক বিস্ময়কর মহাকাব্য। এজন্যই জগৎবাসী দেখেছে যে স্টালিনগ্রাদের (১৯৪২-৪৩) লড়াইয়ে সাইবীরিয়া আর তাজিকিস্তানের সৈনিকরা দুনিয়ার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে, তাদেরই নিজস্ব সোভিয়েট মস্কো শহরকে বাঁচাবার কাজে অগ্রণী ভূমিকায় নামে তাজাকবাহিনী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিজয়ের সাংকেতরূপে বার্লিনের 'রাইখস্টাগ'-ভবনের ওপর লিখবার রক্ত পতাকা উড্ডীন করে তুলে এবং কাজাকযোদ্ধা হাত মিলিয়ে

সর্বদেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী

তন্ত্রের জোহাই দিতে থেকে যখন প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিজমকে পুষ্ট করা দিয়ে পুষ্ট করছিল যাতে হিটলার-মুসোলিনির দুর্বল শক্তিদের হেনে সোভিয়েটকে ধ্বংস করা সম্ভব হয়, তখনই আমাদের দেশের চক্ষুষ্মান নায়করা বুঝেছিলেন সোভিয়েটের ভূমিকাই তখন এদেশের শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম মনস্বীরা যেন প্রস্তুত ছিলেন মহামতি রমাঁ রলাঁ-র সেই আর্ষ উক্তির প্রতিধ্বনি করতে: "আমি জানি যে সামাজিক প্রগতির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিশ্রুতি হল সোভিয়েট দেশ; আমি জানি যে মানুষের ভবিষ্যৎ সুখ শান্তি রয়েছে তার প্রহরায়; জানি যে সোভিয়েট হল আমাদের জীবন্ত দুর্গ। আর তাই আমি বলি: —সোভিয়েট ইউনিয়নকে রক্ষা, নচেৎ আমাদের মৃত্যু!" এরই পাশে জানা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সব চেয়ে তমসাচ্ছন্ন মুহূর্তে বার্নার্ড শ'-র কথা —যে শ' সাম্যবাদের তত্ত্বকে কখনও পূর্ণ সমর্থন করতে পারেন নি: "যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন হিটলারকে পরাস্ত করবে, তখন সেখানেই আমরা দেখব পৃথিবীর অন্তরাত্মার কেন্দ্রস্থল।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সোভিয়েট ছিল একমাত্র সমাজবাদী রাষ্ট্র আর তাকে পিষে মারার অবিরাম চক্রান্ত ও দৌরাত্ম্যের সীমাপরিসীমা ছিল না। এবং ঠিক সেজন্যই সর্বতোভাবে সোভিয়েটের পক্ষ সমর্থন করতে কম্যুনিস্টরা কখনও কুণ্ঠিত হয় নি। পরিপূর্ণভাবে সমস্ত সংবাদ না জেনেও অনেক সময় আমরা শত্রুর আক্রমণ থেকে তাকে সহায়তা দিতে চেয়েছি— এতে তথ্যগত কিছু ভ্রান্তি হয়ে থাকতে পারে কিন্তু তাতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। দুনিয়ার একক সোস্যালিস্ট দেশ আমাদের চোখে তখন 'সবে ধন নীলমণি' আর তার কোনো ক্ষতি বরদাস্ত করা সম্ভব ছিল না। ১৯২৩ সালের সময়ে মোঙ্গোলিয়াতে সোভিয়েটেরই অকুণ্ঠ সাহায্যে সমাজবাদী রাষ্ট্র স্থাপিত হয়, ধনবাদী স্তরে প্রবেশ না করেই সেখানকার সমাজ সোস্যালিজমে উত্তরণে সার্থকতা দেখিয়ে দুনিয়ার দৃষ্টান্তস্থল হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইয়োরোপে এবং এশিয়াতে চীন এবং উত্তর কোরিয়াতে সমাজবাদী শাসন প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েটের কর্মকাণ্ড সুবিদিত। যুদ্ধকালে তার যে অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতি—বিশ লক্ষের মৃত্যু, অসংখ্য মানুষের নিদারুণ দুর্গতি, অপরিসীম সম্পত্তিনাশ, নতুন করে ভেঙে-পড়া দেশকে গড়ে তোলার দায়িত্বের দুরূহতা, আণবিকশক্তির অধিকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে জগৎজয়ের একার প্রচেষ্টা, সব কিছু সত্ত্বেও সোভিয়েট সাহায্য সর্বত্র যেতে থাকে। ইতিহাসের নতুন অধ্যায় রচনা হয়। এ সব কথা নভেম্বর বিপ্লবের ষষ্টিতম বার্ষিকীতে বিশেষ করে স্মরণীয়। এখানে গোটা ইতিহাস তো লিখতে হচ্ছে না, লেখা সম্ভবও নয়। তবে বলা দরকার যে নিশ্চয়ই আমরা স্মরণ করব কিছু ভুলভ্রান্তির কথা, যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে বিসম্বাদ, সোস্যালিস্ট ব্যবস্থার নিরাপত্তা বিষয়ে আগ্রহের ভার আতিশয্যে অবিশ্বাস ও অবিচার, সোভিয়েট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে স্টালিনযুগের একাংশে পরস্পর সন্দেহের অতি-প্রাবল্যে বিপ্লবী কঠোরতার অংশতঃ অনাচার ও অপরাধের কাহিনী এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বেদনাকর পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি নিবারণের আয়োজন, স্মরণ করব ১৯৪১-এর বিপ্লব দৌরব্যবাহী মহাচীনের নেতৃত্বের সঙ্গে সোভিয়েটের ১৯৪৯ থেকে জারমান বিতণ্ডা যা আজও শুরু হয় নি বলে জগতের ক্ষতি। স্মরণ করব আরও বহু বিষয় যার বর্ণনা এখানে অবান্তর— কিন্তু সবচেয়ে বেশি পরিমাণে এবং সবচেয়ে বেশি কম্যুনিস্ট গর্ব নিয়ে স্মরণ করব যুদ্ধোত্তর যুগে জগৎ জুড়ে সমাজবাদের অগ্রগতি সাধনে সর্বদেশের মুক্তি ও মেহনতি মানুষের অভিযানের কথা। যে-অভিযানে সোভিয়েট থেকেছে নিয়ত অগ্রণী, যে-অভিযানে ভিয়েৎনাম আজনের অক্ষরে আকাশে তার নাম লিখেছে। যাতে তারুণ্যের দীপ্তি নিয়ে কিউবা ফিদেল কাস্ত্রো-র কিউবা সমাজবাদী সংসারে নব নব উন্মেষের সংকেত এনেছে। যাতে আঙ্গোলার মুক্তিসিদ্ধি সূচনা করছে সাম্রাজ্যবাদের ঘনায়মান অবলুপ্তি। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য স্মরণ

শারদীয় সংখ্যা, ১৯৮৪

রুশ দেশে জার-শাসনের আমলে ১৯০৬ সালের একটা সরকারী হিসাব থেকে জানা যায় যে মধ্য এশিয়াতে যে-হারে শিক্ষার বিস্তার তখন ঘটছিল সেই হারে চলতে থাকলে নিরক্ষরতা দূর করতে সেখানে চার হাজার বৎসরেরও বেশি সময় লাগত! একই বিবরণে বলা হয়েছিল যে তাজিকিস্তানের মানুষ যদি "জাতি হিসাবে ইতিমধ্যে নিঃশেষ না হয়ে যায়" তো ৫৫০০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ সেখানে সবাই অক্ষরজ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে। সোভিয়েট শাসন গোড়া থেকে বহুদিনই অশিক্ষা, অজ্ঞতা, বেকারী প্রভৃতির মতো অভিশাপকে দূর করে দিয়েছে—জাতি বা গুরুত্ব নির্বিশেষে এই অপূর্ব ঘটনা সেখানে ঘটেছে, যা আমাদের মতো আজও প্রকার দেশে ভাবাই কঠিন। বিপ্লবের পূর্বে মধ্য এশিয়া এবং আজারবাইজানে উচ্চস্তরের শিক্ষায়তন ছিল না—আর জির্ঘিজিয়া, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তানে মাধ্যমিক নিম্ন শিক্ষালয় একটিও ছিল না। আজ সেই সব পিছিয়ে-পড়া দেশের চেহারা একেবারে আলাদা, যা আমাদের মধ্যে অনেকে দেখবারও সুযোগ পেয়েছি। তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশাম্বে-তে (পূর্বে স্তালিনাবাদ নামে খ্যাত) দেখেছি স্থানীয় মনস্বীদের, গিয়েছি মহাকবি ফিরদৌসির নামাঙ্কিত তাজিক জাতীয় গ্রন্থাগারে—যেমন দেখেছি উজবেকিস্তানের রাজধানী তাশখন্দে সাহিত্যাচার্য আলিশের নাভয়-এর নামাঙ্কিত জাতীয় গ্রন্থাগার আর অন্য অনেক উদাহরণ যা থেকে জানা যায় ঐসব একদা-একান্ত-পশ্চাৎপদ অঞ্চলের আজকে উদ্দীপ্ত স্বাধীনতাবোধ ও অগ্রগতি। এ-বিষয়ে একটু গুছিয়ে লিখতে গেলে অন্য কোথাও আসতে হয়, তাই এখানে শুধু কয়েকটা তথ্যের উল্লেখ করছি। যেমন, ১৯৭১-৭২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার প্রতি দশ হাজারে উচ্চ-শিক্ষায় ব্যাপৃত ছাত্র তাদের অনুপাত ছিল ২৭৩, উজবেকিস্তানে ১৮৭, কিরঘিজিস্তানে ১১১, তাজিকিস্তানে ১৪৮, তুর্কমেনিস্তানে ১২৮—তুলনীয় সংখ্যা হল ভারতবর্ষে এবং ইরাকে ২১, তুরস্কে ৪০, পশ্চিম জার্মানীতে ৩৬, ইতালীতে ২১, ব্রিটেনে ৮৭, ফ্রান্সে ১১৭, জাপানে ১২১, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৩৪। সামগ্রিকভাবে এই তালিকায় সোভিয়েট সর্বাগ্রে, তারপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু যা অবাক করে তা হল যে মধ্যযুগ থেকে ঝাঁপ দিয়ে বেরিয়ে তাজিক, উজবেক, তুর্কমান প্রভৃতি সমাজবাদী ব্যবস্থার কল্যাণে পশ্চিম ইয়োরোপ আর জাপানের চেয়ে রীতিমতো এগিয়ে রয়েছে এবং এগিয়ে চলছে। মনে রাখতে হবে যে প্রায় 'শূন্য' থেকে এই অগ্রগতি সোভিয়েট এশিয়ার দেশগুলি আয়ত্ত করেছে। আর এই সকলের সমান অধিকারের ভিত্তিপুষ্ট সমাজবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছে উত্তর মেরুর 'টুকচি' থেকে দাগেস্তানের পর্বতবাসী যারা সগর্বে সতেজে সানন্দে মানুষের পূর্ণ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত।

চল্লিশ বছরেরও বেশি আগে আইরিশ লেখক শোন্ ও'-কেসি বলেন যে তিনি সোভিয়েটের অটল বন্ধু, কারণ শিশু এবং মেয়েরা সেখানে যে মর্যাদা পায় তার তুলনা অন্যত্র নেই। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে অধিকারগত কোনো তারতম্য সেখানে যে নেই তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। শুধু চিকিৎসার ক্ষেত্রে নয়, বিজ্ঞানের সর্ববিষয়ে গবেষক-দের অর্ধাংশেরও বেশি আজ সেখানে হল মেয়েরা: ১৯৭৯ সালে সুপ্রীম সোভিয়েটে (সংসদ) ১৩১৭ সদস্যের মধ্যে ৪৭৪ জন মহিলা নির্বাচিত হয়েছিলেন; মহাকাশ ধাত্রায় অবি-স্মরণীয়া ভালেন্তিনা তেরেশকোভা সে দেশের নারী সমাজের প্রতিভূ। আমাদের মতো দেশে আরও বেশি মনে করব আবার ঐ মধ্য এশিয়ার কথা, যেখানে কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত মেয়েদের দুর্দশার অন্ত ছিল না—কিন্তু বিপ্লব সেই দুর্দশাকেই দুর্দম, দুর্বার এক শক্তিতে পরিণত করেছে। কোনো অধিকারই ছিল না স্ত্রীজাতির—শুধু গৃহের একান্তে জীবনযাপন ছাড়া। পরপুরুষের মুখ দর্শন ছিল পাপ; পরতে হত ঘোড়ার লোম দিয়ে বানানো মোটা বোরখা যার নাম হল 'পরঞ্জা'। এই পর্দা প্রথা ভাঙতে গিয়ে খাস মধ্য এশিয়ার মেয়েরা—এবং তাদের রুশ কমরেডরা—প্রাণ দিয়েছে, মোল্লার হুকুমে পাথর ছুঁড়ে প্রকাশ্যে তাদের হত্যা করা হয়েছে। এভাবেই মধ্য এশিয়াতে রুশ এবং অ-রুশ বিপ্লবী একত্র কাজ করেছিলেন বলেই জাতি আর ভাষা নিয়ে বৈরিতা সোভিয়েট সমাজকে কলুষিত করে নি। যাই হোক, অবাক বিস্ময়ে আমরা দেখব এবং ভাবব—কেমন করে মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির শিকলে বাঁধা, বর্বাক্ত প্রথানুগত্যের দাস, একটা গোটা সমাজের জীবনে এত বিরাট পরিবর্তন এসেছে।

ডেনমার্কের খ্যাতনামা সাহিত্যিক মার্টিন আন্দেরসেন নেক্সো অনেকদিন আগে বলেছিলেন: "মানুষ মহাকালে

এই নক্ষত্রের অবস্থিতি কাঁটায় কাঁটায় মাপতে জানে কিন্তু আজও জানে না ক্ষুধানিবৃত্তির কতোক টুকরো রুটি কেউ সবাইকে বেওয়ার ব্যবস্থা করতে মুনমুনাভের এই বেদনা দূর করে সমাজবাদ, শুধু দেহের নয় মনেরও সর্ববিধ দুঃখ ক্ষুধানিবৃত্তির সচেতন সংঘবদ্ধ আয়োজন করে সোভিয়েট ও অন্যান্য সমাজবাদী দেশ। সবাই সেখানে কর্মক্ষম জাতি হয়ে বসে আছেন তারা উদ্ভট এবং ভাবেও না কেউ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন মনে পড়ে সোভিয়েট বিপ্লবের ষষ্ঠী তম বার্ষিকীতে—লেনিন নামে যে মন্ত্রটুকু আছে মানুষের পক্ষরে, তাকেই তারা উৎপাটিত করছে। এ কাজ সহজে সমাধা হবার নয়, কিন্তু এই মহৎ ব্রত চলেছে আজ শুধু সমাজ বাদী দেশে নয়, চলেছে সর্বত্র, সেখানেই দেখি শুভবুদ্ধি মানুষের প্রয়াস।

মহাপুরু থেকে তাতারদেরকে যেমন দেখায়—রুশহাইকমিশনের এই গ্রন্থের ভূমিকায় প্রথম মহাপুরু বিজয়ী পার্থিব বলেন, "তাতারদেরকে যেমন দেখায়, কতকটা রোরেরিখ-এর আঁকা ছবির মতো।" ওটা নিশ্চয়ই হেতোদা হিমালয়েরই কল্যাণে "হিমবৎ সেতু-পর্বতং" আমাদের এই দেশ হিমাচলের অপর পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী সোভিয়েট ভূমিকে আজ বিপ্লবের স্মারক উৎসবে হার্দিক অভিনন্দন জানাবে।

ক্ষুদ্রশিল্পে নতুন সাহায্যসূচী

নতুন শিল্প স্থাপনে অথবা সম্প্রসারণে

কেবলমাত্র রাজ্যের অনুন্নত এলাকার জন্য—

১। আবদ্ধ মূলধনের উপর ১৫ শতাংশ ভর্তুকী।

[বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলায় প্রযোজ্য হবেনা। প্রযোজ্য হবেনা পুরুলিয়া মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলায়—কারণ এই তিনটি জেলায় ১০ ১১ শতাংশ কেন্দ্রীয় অনুদান ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে]।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন পরিচালিত শেডের ভাড়ার উপর ভর্তুকী।

কার্যকরী মূলধনের সুদের উপর ভর্তুকী।

বিদ্যুৎ ভর্তুকী : কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন সরবরাহ এলাকায় প্রযোজ্য হবেনা।

এবং

সারা পশ্চিমবাংলার শিল্পস্থাপনেচ্ছুদের কম খরচে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দেবার ব্যবস্থা।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন—

আপনার নিকটস্থ জেলা শিল্পাধিকারিক অথবা প্রকল্পাধিকারিক,

গ্রামীণ শিল্প-প্রকল্প।

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন,

৬এ, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলি-১৩ কর্তৃক প্রচারিত।

রাজনীতিতে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

গোপাল হালদার

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (২৩শে নভেম্বর, ১৮৯০—২৯শে মে, ১৯৭৭) 'ভাষাচার্য' পরিচয়েই সুবিখ্যাত ছিলেন। পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের দেওয়া, এবং সর্বস্বীকৃত। কেউ কেউ মনে করেন আরও যথার্থ বোধহয় পরবর্তীকালে (১৯৬৫ সালে) ভারত সরকারের তাঁকে দেওয়া পদ ও পদবী—'মানবিক বিদ্যার জাতীয় অধ্যাপক' (ন্যাশনাল প্রোফেসর অন হিউম্যানিটিজ)। বিজ্ঞানের বাইরে সাহিত্য, শিল্পকলা, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি যেসব বিষয় মানবিক বিদ্যা বলে গণ্য (অবশ্য ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানরূপে সেই গোত্রীয়) তার প্রায় বিশেষের প্রাচীন ও নবীন সকল শাখাতেই সুনীতিকুমারের জিজ্ঞাসার শেষ ছিল না, সেসব বিষয়ে নানাদিকে ছোট বড় লেখার নিদর্শনও অজস্র। আসলে, মানুষকে সর্বাঙ্গীণভাবে দেখা ও সমগ্র করে দেখা—মানুষকে জানা, বোঝা,—এই ছিল সুনীতিকুমারের প্রতিভার প্রবণতা—আর তারও মূলে ছিল মানুষের প্রতি সুনীতিকুমারের সহজাতগত ভালবাসা—নানা ভুলত্রুটি-সুদ্ধ, তাঁর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাও ক্রমশই ভুলত্রুটি ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে স্পষ্টতর ও সবলতর রূপ গ্রহণ করেছে; বয়সের সঙ্গে জীবন দৃষ্টি ও মন সীমাবদ্ধ হয়ে না পড়ে বরং ক্রমশই উদার ও প্রসারতর হয়েছে। —এটিও লক্ষণীয়।

১

একটা সুপরিচিত ব্যাপার নিয়েও কথাটা আমরা সহজে বুঝতে পারি। সে হচ্ছে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চেতনা ও বিচারের দিক। কথাটা এভাবে তুলতে অনেকেই সংকুচিত হন, কিম্বা বিরক্ত বোধ করেন আমার পক্ষে তা করার কারণ নেই। কারণ আমি তো জানি—এমন বন্ধুর বন্ধুরূপে ইংরেজ আমলে আমি অন্তত আর কাউকে পাই নি। আর পরবর্তী স্বরাজ আমলেও সেই বন্ধুরূপেই তাঁকে পেয়েছেন আমাদের বন্ধু মহাদেব সাহা (সুনীতিকুমারের চিঠিপত্র-সুদ্ধ আমার সকৃতজ্ঞ প্রণাম 'পরিচয়ে', সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭-এ দেখলেই হবে)।

সম্প্রতিকার আরেকটি কথাও বলতে পারি। আমার সঙ্গে হাসপাতালে পাঁচ মিনিটের দেখায় যে শেষ কথা হয় তা সে বোধহয় শনিবার ২১ মে, মৃত্যুর ৮ দিন পূর্বে। সেদিনও তাঁর প্রথম একটি প্রশ্ন ছিল 'পলিটিকসের খবর কি?' (তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য আইনসভার নির্বাচনের ব্যস্ততা চলছে)। তাঁর সঙ্গেও একটু বেশি কথা বলা নিষিদ্ধ—তাঁর পক্ষে কথা বলাই তখন নিষিদ্ধ: আমিও তা না বলতে প্রতিজ্ঞও ছিলাম। যে উত্তর তখন দিয়েছিলাম তা সংক্ষিপ্ততম। সে উত্তরের মুখবন্ধ-স্বরূপ বলি 'তা নিয়ে আপনি এখন ভাবছেন কেন? আমরাও তো এ পলিটিকস ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।' যা বুঝতাম তা তবু বলতে চেষ্টা করেছি—আর তা শুনতে শুনতে তিনি হয়তো বুঝলেন কোনো পার্টিরই প্রচারিত মূলনীতি ও নির্বাচনের কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। 'ডিরেলড্'।—কী তিনি বুঝেছিলেন ঠিক আমিও বুঝি নি—কারণ, ও'র কথা বলা নিষিদ্ধ,—আমিও কথা বাড়াতে চাই না। এখানে এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য শুধু এই—রাজনীতি সম্বন্ধে তিনিও দশজনের মতোই শেষ অবস্থাতেও ভাবছিলেন—কী হবে?—কী হবে?—দশজনের মতোই তাঁর তখনও এই রাজনীতিক আগ্রহ ছিল।

এই কথাটা মনে রেখেই আমার আলোচনার মূল কথায় আসছি—যা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রাজনীতি বিষয়ে আমার নিজের যা ধারণা তা বলতে চাই—যে মানুষ ১৯৩২ থেকে ১৩ বৎসর পশ্চিমবাঙলার আইন পরিষদে সভাধ্যক্ষের কাজ করলেন—কতকটা কংগ্রেসের দলভুক্ত-রূপে, তবে সকল দলের অকুণ্ঠিত সম্মতিতেই তিনি হয়েছিলেন সভাধ্যক্ষ। তাঁর রাজনীতির কথা জানতে চাওয়া নিশ্চয়ই আশ্চর্য নয়। আইন পরিষদ ছাড়াও আরও অনেক কাজকর্ম তাঁকে করতে হয়েছে তা থেকেও আমরা জানি সুনীতিকুমারের রাজনৈতিক দৃষ্টি নিয়ে অনেকেরই মনে প্রশ্ন ওঠে। সব প্রশ্ন গুরুতর নয়—তাতে কান দেওয়ারও প্রয়োজন নেই,—তিনি নিজেও তা বিশেষ দিতেন না। যে রাজনীতি নিছক দৈনন্দিন রাজনীতি তাতে তাঁর মতো পণ্ডিত মানুষের বিশেষ আগ্রহ না থাকবারই কথা। শ্রদ্ধাও থাকবার কথা নয়। যে মন্ত্রী

মেক্সিকোর শিল্পী অঙ্কিত সুনীতিকুমারের প্রতিকৃতি

হবে না-হবে, কে কাকে হারাবে না-হারাবে—এই দলাদলি তিনি বা কেউ না বুঝলে, না বুঝতে না চাইলে, বিস্ময়ের কিছু নেই —সমাজের বা জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে কতটুকু তা গুরুতর? এ রাজনীতির ব্যাপারে সংস্কৃতি সভ্যতার প্রশ্ন না তুললেও চলে।

২

জীবনধারণপ্রসঙ্গে অনেক জিনিস সকলকেই মেনে নিতে হয়। সমস্ত সময় তাতে এক-আধটুকু ভাগও নিতে হয়। কেউ তো এই সমস্যাসঙ্কুল জীবনযাত্রার উর্ধ্বে—দূরে বিচরণ করেন না। এরূপ মনোভাবের ফলে যতটুকু ভালমন্দ বুঝি তদনুযায়ী রাজনীতিতে চলার রাজনীতি করতেও হয়। তার বেশি রাজনীতিতে অনেক সৎ ও শিক্ষিত সজ্জনও জড়িয়ে পড়তে চান না তাঁদের রাজনীতিতে নিরাসক্ত বলা হয়তো ঠিক নয়। তবে তাঁদের 'সচেতন রাজনীতিক' বা রাজনীতিতে পুরোপুরি আগ্রহবানও বলা চলে না। তাই বলে কেউ তাঁকে দেশকে ভালবাসেন না, দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে উদাসীন, একথা মনে করা নিশ্চয়ই মারাত্মক ভুল; ভুল নয় অন্যায়—বিশেষ করে পরাধীন দেশে। কারণ পরাধীন দেশে কোন মানুষই জাতীয় গঞ্জনা ভুলে থাকতে পারে না। বিদেশে গেলে তো সে গঞ্জনা—অনেক সময়ে ব্যক্তিগত অবমাননার কতই না তীব্রতর অনুভব করতে হয়। তাই ব্রিটিশ আমলে সক্রিয়ভাবে কেউ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল না হলে তাকে বলতে হবে দেশের প্রতি প্রীতিহীন কিম্বা ব্রিটিশভক্ত—এ দুর্নীতির বা ইতরতার পরিচয় মাত্র।

স্বীকার করতে হবে আচারে-ব্যবহারে, অনেকেই সংভাবে সংসার-ধর্ম পালন করে এবং ঐতিহ্যগত সামাজিক দায়িত্ব পালন করেই তুষ্ট হতেন, তাঁরা সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করার তাগিদ দেখাতেন না, এমন কি, ভোটাভুটির দিন আসতে কেউ কেউ আমাদের ভোটারদের কাছে বিরক্তও হতেন। স্ব স্ব স্বধর্মে, সমাজধর্মে, ছিল তাঁদের জীবন যাত্রার শিকড়, মনেরও আশ্রয়। যে Sense of belonging সমাজবোধের মূল সত্য তাতে এঁরা কোনো অংশে সামান্য ছিলেন না। ভুল হোক শুদ্ধ হোক—রাজনীতিক কর্মেরও পিছনে যদি এই Sense of belonging না থাকে, তাহলে সে রাজনীতি তো দাঁধাবাজি ও দলবাজিরই শামিল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও স্বীকার করতে হবে—রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ না নিলেও সৎ মানুষকে, মানুষ হিসাবে মনুষ্য ধর্মের খাতিরে কখনো সক্রিয় হতে হয়—যেমন হয়েছিলেন ফ্যাসিজিম-এর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ, এবং বিশেষ করে পরাধীন দেশে রাজশক্তির বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হয়—যেমন হিজলীর হত্যাকাণ্ডের পরে রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়িয়েছিলেন মনুমেন্টের তলাকার প্রতিবাদ সভায়।

বলা বাহুল্য—সক্রিয় রাজনীতিরও নানা রূপ আছে, আবার নিষ্ক্রিয় রাজনীতিরও নানা স্তর আছে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত দেওয়া বোধ হয় অন্যায় হল। কারণ রবীন্দ্রনাথ সর্বসময়েই গভীর অর্থে 'সক্রিয় রাজনীতিক' মানুষ—সর্ব সময়েই তিনি যে রাজনীতির সাধনা করেছেন, তা হচ্ছে 'সৃষ্টিমূলক রাজনীতি'—আমি তাকে বলি 'ক্রিয়েটিভ পলিটিক্স', যা হচ্ছে রাজনীতিরও প্রেরণার উৎস।

রাজনীতির এই সাধারণ নির্দেশগুলি মনে রেখে আমরা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রাজনীতিও একটু হিসাব নিতে পারি।

৩

যে সময়ে সুনীতিকুমারের জন্ম—১৮৯০, আর কলকাতার যে মহল্লায় (সিমলার নিকটে) এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে তাঁর কথা প্রথম মনে রাখে কলকাতার সেই ভদ্রশ্রেণী মূলত ব্রিটিশ শাসনের কিছু না কিছু ফলভোগী হয়েছিলেন। শাসকদের চাকরি-বাকরি করে তাঁরা নিজেদের স্ব স্ব স্বধর্মে নির্বিবাদে দিনযাপন করেন। ব্রিটিশ শাসন এত প্রবল ও সুদৃঢ় যে তা কোনো দিন শেষ হবে, একথা তাঁরা ভাবতেও পারতেন না। আর, এই শাসনের সঙ্গে ভদ্রশ্রেণীর ভাগ্যও জড়িত যে স্বধর্ম, সমাজধর্ম ঐতিহ্যানুযায়ী এটুকু পালন করাই তাঁরা জানতেন তাঁদের একমাত্র বিধিলিপি—অর্থাৎ সাধারণত তাঁরা রক্ষণশীল, সামাজিক পরিবর্তনও চাইতেন না, রাজনীতিও না। এই শ্রেণীর মধ্যেও আর একটা মনোভাব ও গোষ্ঠী তত্ত্ব ক্রমে গড়ে উঠছিল—তাঁদের অগ্রণী বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্ম-সমাজ। আর ঐ সিমলাতেই জন্মেন বিবেকানন্দ। তাঁর সঙ্গে (১৮৯০-এর পরেই) হিন্দু পুনর্জাগরণের সঙ্গে হিন্দু জাতীয়তার প্রাদুর্ভাব। আর ১৯০৩-৩-এর সময়ে ঐ সিমলাতেই অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর পত্রিকার

প্রথম কেন্দ্র গড়ে ওঠে। সুনীতিকুমারের জন্ম, শৈশব ও [illegible] এই পরিবেশ আবহমণ্ডলীয় [illegible] ও সমাজমনের আদর্শ ও লক্ষ্যগুলিতা একদিকে—তাতে হিন্দু পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে জড়িত হিন্দু স্বাজাত্যাভিমান, অন্যদিকে তাঁর নিজ শিক্ষায়, বিবেকানন্দের প্রেরণায়, বিশেষ করে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও ভারতীয় শিল্পের প্রেরণায় ব্যক্তিগত লাভ হয়—কতকটা সৃষ্টিমূলক জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার দৃষ্টি ও আদর্শ। তাই তখন বা তাঁর এতে হয় নি যে হচ্ছে অনুশীলন-যুগান্তরের বিপ্লবী কেন, স্বদেশী যুগের দেশ সক্রিয় স্বাদেশিকতা বা প্রতিবাদ-প্রধান 'সক্রিয় রাজনীতির' প্রেরণা। নিশ্চয়ই তার অর্থ এই নয় যে, তিনি ইংরেজ রাজত্বে (মহাবিত ভদ্রলোকশ্রেণীর প্রধান আদর্শের মতো) আগ্রহবান ছিলেন বা জাতীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন তবে সুনীতিকুমারের পরবর্তী কর্মজীবন ও কর্মকাণ্ড থেকে মনে হয়—প্রমাণের প্রতিভা সত্ত্বেও তিনি সমসাময়িককালের রাজনীতির রূপ বুঝতে সচেষ্ট হন নি এবং অতীত ইতিহাসের এমন চক্ষুষ্মান ছাত্র হয়েও তলিয়ে বুঝতে চান নি যে, ঐতিহাসিক শক্তি (হিস্টরিক্যাল ফোর্স) যুগে যুগের বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস অনিবার্য করে তুলছে। তাই যুগাবর্তনের সময়কার অনেক বিক্ষোভ ও বিভ্রান্তি তাঁর বিভ্রান্তি বাড়িয়েছে, নানা অপপ্রচারে তাঁকে তখন বিভ্রান্তিতেও চালিত করাও সহজ হয়েছে, এবং সাংস্কৃতিক সাধনার মধ্যে প্রতিভাত থেকেই তিনি তখন একভাবে জাতীয় চেতনাকে পুষ্ট করেছেন, তাই সত্য মনে হয়

সুনীতিকুমারের কোনো কোনো লেখা থেকে তাই জাতীয় সাংস্কৃতিক, আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে সচেতন বিভ্রান্তির অনেক লেখা এবং কাজও খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন মুসোলিনীর মধ্যে তিনি দেখেছিলেন—জাতীয় শৃঙ্খলা, সংযম ও শক্তিবাদের দ্বারা জাতি-গঠনের দৃষ্টান্ত। হিন্দু মিশনের কাজে দেখেছিলেন হিন্দু জাগরণের (বিবেকানন্দীয়?) হিন্দু সমাজ সংস্কারের প্রয়াসের চেষ্টা, অথচ না ছিল তাঁর আজাদা বিশেষরূপ, অস্পৃশ্যতাবর্জন, বিধবাবিবাহে বিরোধী হিন্দু গোঁড়ামিতে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি, না সুফীবাদ, না মহাযুগের মরমিয়াবাদ,

উৎসবে আছে ভিন্ন সুর, ভিন্ন ছন্দ...

...এক আর অদ্বিতীয় শুধু

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

ত্বক-সাধনার উৎসবে

বোরোলীন সত্যই অদ্বিতীয়। ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষায় এর তুলনা নেই। নিয়মিত ব্যবহারে ফুটিয়ে তোলে ত্বকের স্বাভাবিকতা। ত্বককে করে তোলে সুরক্ষিত, বীজাণুমুক্ত। কাটা-ছেঁড়া-ফাটা, রুক্ষ-শুষ্ক রোদে ঝলসানো ত্বক বোরোলীনের সস্নেহ স্পর্শে পলকে স্বাভাবিক, সুস্থ।

উৎসবের আনন্দঘন দিনগুলোতে অন্যান্য উপচারের সঙ্গেও থাকুক বোরোলীনের নিরাময়ী প্রতিশ্রুতি।

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

বোরোলীন হাউস

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

বা ঐরূপ হিন্দু মুসলিম মিলনমন্ত্রী উদার চেষ্টার আগ্রহের কোনো অভাব। তবু বলতে হবে—'ভার ধীপদর ভারতে' কোথাও নেই তরুণীর স্বাধীনতাকামীদের ছায়া, 'ইউরোপ' ১৩৩৮-এও নেই ফ্যাসিজমের বীভৎসতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধ্বনি— যা তাঁর গুরু রবীন্দ্রনাথকে তখন মুখর করে তুলেছে। এইখানেই বুঝি তাঁর রাজনীতিক স্থির দৃষ্টির অভাব।

তবু যে সুনীতিকুমার স্বাধীনতার রাজনীতি সম্বন্ধে নিরাসক্ত ছিলেন, তা বলি কি করে? অন্যান্যেই কি তিনি ছিজলীর পরে জোর গলায় ধরে রবীন্দ্রনাথের নিকটে নিয়ে যান নি—কবিকে তখনকার বিপ্লবীদের মনোভাব বোঝাবার উদ্দেশ্যে? আরও অনেক এরূপ দৃষ্টান্তও আমি জানি। তারও পরে জেলখানায় যখন আমার সঙ্গে সেন্সার দেখা করার অনুমতি সুনীতিকুমার শাসকদের বক্রোক্তি শুনেও আমায় করলেন—সে কথার তাৎপর্য আমার নিকটে তো অনুসরণীয় ও গভীর, সাধারণভাবেও তা কারও পক্ষে দুর্বোধ্য নয়।

যা তবু দুর্বোধ্য তা এই—ইতিহাসের শক্তি সম্বন্ধে তিনি তখনো (১৯৩৩-৪৩) সচেতন নন—আর, তাই এ যুগের পলিটিক্স সম্বন্ধে তিনি দৃষ্টিলাভ করতে পারেন নি। আমি জেল থেকে ফিরে এলে (১৯৩৭-৩৮) দেখেছি তিনি কমিউনিজম-এর প্রবল বিরোধী, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি তাঁর গভীর অশ্রদ্ধা। নেপে কংগ্রেসের পলিটিক্সেও শ্রদ্ধা নেই। গান্ধীবাদেও নয়। শুধু তাই নয়—মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন প্রভৃতি কারো লেখা তিনি পড়েন নি, পড়তে আগ্রহও নেই। বলা যেতে পারে ১৯২৩-এর লিফের টাইমস-এর 'রিপার সংবাদদাতার' মতো যে কোনো চতুর লোকের আজগুবি প্রচারে তাঁর বিশ্বাস জন্মায়। পলিটিক্সের সাধারণ সম্ভাব্য অসম্ভব, সত্যাসত্য বিচার-বিশ্লেষণে তিনি অপটু, যেন অপারগ বিধিদত্ত প্রতিভাও যদি ঐতিহাসিক শক্তির স্বরূপ না জানে তবে সে দিগ্‌নির্ণয় করতে পারে না।

এই গবেষণা সূত্রে সুনীতিকুমার আমাকে বলেছিলেন (১৯২৯-এ)—শব্দের গুরুত্ব বিচারে সবচেয়ে প্রথম দেখতে হবে কোন্ শব্দ মানুষের জীবনযাত্রার বস্তুর শব্দ, খাদ্যবস্ত্র ইত্যাদির নাম। কারণ জীবিকোপার্জনই মানুষের সভ্যতার প্রথম স্তর। 'ইতিহাসের এই আদিক ব্যাখ্যা' তত্ত্ব হিসাবে তাঁর নিকট অগ্রাহ্য—অথচ বৈজ্ঞানিক তথ্যরূপে তাঁর গবেষণায়ও গ্রাহ্য। এই দৃষ্টিতেই তিনি বাঙালি সংস্কৃতির যে বস্তুমূলক বিবরণ সেই দিনে প্রস্তুত করেন, আমি তা আমার বইতে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেছিলাম (১৯৪২), আর বাঙলার সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনো (objective) বিবরণ কেউ আজও পাঠককে এখনো দিতে পারেন নি। দেখেছি—ইতিহাস চিন্তায় ইতিহাসের বস্তুকে তিনি (objective) বস্তুবাদী ধর্মের দৃষ্টিতে দেখতে পারেন, কিন্তু শ্রেণী-দ্বান্দ্বিক বিকাশের তত্ত্ব তিনি গ্রহণ করার কথা চিন্তাও করেন না। অথচ তিনি বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতেই ইতিহাসকে বিচার করেন—('রামায়ণ' সম্বন্ধে উদ্যানীকার উক্তি তাঁর এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রমাণ।)

অর্থাৎ সঠিক ঐতিহাসিক শক্তি না জানাতে তিনি সাধারণভাবে রাজনীতিতে দ্বিধাবিভক্ত।

৪

এই দ্বিধাবিভক্ত রাজনৈতিক দৃষ্টি নিয়েই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আইন পরিষদে নির্বাচিত হয়ে তার অধ্যক্ষ হন। ডঃ রায়ের মতো লোকের কথাকে সেখানে অবজ্ঞা করবার সাধ্য তাঁর হত না নিঃসন্দেহ। তথাপি আইন পরিষদে তিনি আপনার নিজস্ব সৌজন্যে ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে সকলের শ্রদ্ধাই লাভ করেছেন। তখনো যে তিনি সেখানকার রাজনৈতিক তর্কে, বিতর্কে উৎসাহবোধ করতেন, তা মনে হত না। এরই ওপর তার মধ্যে তিনি সরকারি ভাষা-বিষয়ক যে প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্য খসড়া করে দেন, তাতে শোর্থদের আরও ভাষাগত অধিকার স্বীকৃত হয়—ডঃ রায়ের দ্বারা অস্বীকৃত হওয়াতে শীওড়াফলের এই অধিকার লাভ হয় নি। সুনীতিকুমার কিন্তু তা চেয়েছিলেন—আমি সভায় এই সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনও করেছিলাম, সুনীতিবাবুর তাতে সম্পূর্ণ মত ছিল। কিন্তু ডঃ রায় তা কিছুতেই গ্রহণ করলেন না। সুনীতিবাবু প্রণীত পশ্চিমবঙ্গের ভাষা প্রস্তাবের মত উদার ভাষা প্রস্তাব ভারতে আর কোনো রাজ্যে প্রণীতও হয় নি, গৃহীতও হয় নি। রাষ্ট্র ভাষা সম্পর্কে ভাষা কমিটির সম্মুখে তাঁর বক্তব্যের থেকে উৎকৃষ্ট বক্তব্য আর কিছু হতে পারে না। এসব কি রাজনীতির প্রত্যক্ষ বস্তু নয়? পরোক্ষ বস্তু? এসব সৃষ্টিমূলক দৃষ্টিরই একটা ক্ষুদ্র ফল।

With best compliments of .—

BIRLA JUTE MANUFACTURING COMPANY LIMITED

9 1, R. N. Mukherjee Road,
Calcutta 700001.

Gram "JUTWEAVER"

7099 A B JUTWEAV

Manufacturers of quality products, Viz .—

HESSIAN
GUNNY BAGS
CARPET BACKING CLOTH
ELEPHANT BRAND JUTE CARPETS
SWASTIK BRAND STAPLE FIBRE YARN
CAMEL BRAND CALCIUM CARBIDE
KHAJURAHO & CHETAK BRAND CEMENT

এইখানেই বলি—তাঁর ভ্রান্ত ধারণা ছিল কত সত্য ও অনড়। ভাষা-বিষয়ক গবেষণায় তিনি দৃঢ়মত ছিলেন—ছোটবড় সকল জাতি-উপজাতি, বা সংখ্যায় গোষ্ঠীর আপন ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের পূর্ণাধিকার না থাকলেই নয়, যথাসম্ভব রাজা মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণেরও অধিকার প্রত্যেক জাতির চাই। এই ছিল সুনীতিবাবুর বরাবর দৃঢ়মত। তিনের দশকে আমি তাঁকে বলেছিলাম—'একমাত্র সোভিয়েত দেশেই আপনার কথিত এই নীতি গৃহীত ও প্রযুক্ত হচ্ছে।'

কিন্তু তিনি বিশ্বাস করলেন না, হেসে উড়িয়ে দিলেন। তাঁর বক্তব্য—রুশ কমিউনিস্টরা সব গ্রাস করছে, আর পুরাতন সংস্কৃতিকে বুর্জোয়া বলে ইঁদুরে দিয়েছে প্রমাণপত্র দেখা নিষ্প্রয়োজন। তিনি তা পড়তেও নারাজ। অথচ অন্তত ১৯২১-২২ থেকে দেখেছি—কোল, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও দরদ অফুরন্ত। তাবের কেন, পৃথিবীর সকল জাতির, সকল ভাষার তিনি চান স্বাধীন বিকাশের অধিকার। কোথায় তা আছে, কী করে তা সম্ভব, তা কিন্তু কেবে দেখেন না। তবে এই অভিমত তাঁর পূর্বে এ দেশে কেউ এতপক্ষভাবে বলেন নি।

৫.

কিন্তু পূর্ব মনোভাব তাঁর ক্রমশ পরিবর্তিত হয়—রাজনৈতিক বোধ উন্নত হয় কিনা, জানি না। কিন্তু একদিকে সোভিয়েত দেশ ও চীন প্রভৃতি দেশের কমিউনিস্ট কার্যকলাপ দেখে তাঁর অভিজ্ঞতা বিস্তৃত হয়, অন্যদিকে মানস ক্ষেত্রে নিজেরই জীবন-দর্শন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে,—বিশেষ করে রবীন্দ্র সাহিত্যের গভীরতর গবেষণায় অনেক বেশি উদার হয়—হিন্দু জাতীয়তা তো চলেই গেছল, ভারতীয় ঐতিহ্যও সত্যই মানবিক চেতনায় পরিণত হতে থাকে। দু-একটা সহজ কথায় তা বুঝিয়ে বলছি—(ক) সোভিয়েত দেশে তিনি দেখলেন—সকল জাতির ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের অধিকার। দ্বিধা একেবারে চলে গেছল তা নয়,—হয়তো সর্বত্র ছোট গোষ্ঠীরা এই অধিকার ততটা ভোগ করে না, এ সন্দেহও ছিল। কিন্তু এই নীতিই যে লেনিনিস্ট নীতি, আর নীতিতেই যে ভারতবর্ষের সংহতি সম্ভব তা স্পষ্ট করেই লেখাদিতে তিনি লিখে গেছেন। (খ) সোভিয়েত দেশে আফ্রিকার ও সকল কৃষ্ণাঙ্গদের সমাদর দেখে তিনি বিশেষ আশ্বস্ত বোধ করেন। (গ) সেখানে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমাদর থেকে তিনি এত শ্রদ্ধান্বিত হন যে, আমাকে রুশ সাহিত্যের ইতিহাস লেখার প্রায় বাধ্য করেন। (ঘ) এসব কারণেই তিনি 'ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির' সভাপতি পদ স্বীকার করেন, আর দীর্ঘ ৮ বৎসরকাল তাঁর সে কার্যনির্বাহ করেন—ও বিষয়ে বিশদ বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টি সুপরিণত যদি না হয়ে থাকে, তাঁর জীবন দর্শনে যে পরিবর্তন আসে তাতে তাঁর জীবন-দৃষ্টি, সমাজবোধ, আর তাঁরই অজ্ঞাতে তারই অঙ্গ হিসাবে রাজনীতিবোধও পরিণত হয়ে চলে। দু'একটা ব্যক্তিগত (?) কারণও বোধহয় ছিল—আইনসভায় তিনি আবদুল হালিম, আবদুল্লা রসুল ও সাহেবুল্লাহ প্রভৃতি কমিউনিস্টের সম্পর্কে আসেন; অন্যদিকে মহাদেব সাহা, চিন্মোহন সেহানবিশ প্রভৃতি কিছু কিছু কমিউনিস্টদের সম্পর্কে আসেন। তাতে দু'রকমের ফল ফলে—(ক) যে কারণেই হোক, তিনি এই মানুষগুলিকে অন্য দলীয় মানুষের থেকে বেশি সৎ, শিক্ষিত ও সংস্কৃতি-দরদী বলে অনুভব করেন, আর (খ) সেই সূত্রেই বোধহয় অনুভব করেন—এঁদের রাজনীতিও শুধু মানুষ-খ্যাপানো বা স্বার্থসিদ্ধির চক্রান্ত নয়—অবশ্য এঁদের রাজনীতি তাঁর নয়, কিন্তু এ রাজনীতি মানুষের মুক্তি চায়, তবে কার্যত কি তা দিতে পারবে কিনা সন্দেহ।

তাই বলে তিনি ঐতিহাসিক শক্তিসমূহ তখনো ঠিক মত ধরতে পেরেছিলেন, কিম্বা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের রূপ বুঝতে পেরেছিলেন, তাও নয়। বুঝেছিলেন—শোষণবাদ নিঃসন্দেহে অচল, কিন্তু সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিমানুষের বিকাশের সুযোগ চাই। অপটু রাজনীতিবোধ থেকে শুরু করে যেখানে এসে তিনি শেষ অবধি পৌঁছান—তা হচ্ছে রাজনীতিরও চেয়ে বড় সত্য—বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠা (যা রামায়ণের ব্যাপারে দেখা গেল) আর মানবিকতা। এই ছিল তাঁর শেষ জীবন নীতি।

This factory would lose out big on materials handling time and space...

but for the tailor-made traction batteries from world renowned CHLORIDE

Chloride India are the unrivalled leaders in battery making. They have the finest trained experts, advanced research and development, the longest experience – all backed by the latest know-how of the world-wide, world renowned Chloride Group. This gives Chloride all it takes to bring you not only traction batteries tailor-made to meet specific requirements – but with built-in quality none can beat.
And this same unrivalled battery technology is playing a major role in India, providing battery power for industry, agriculture, defence, transport and communication.

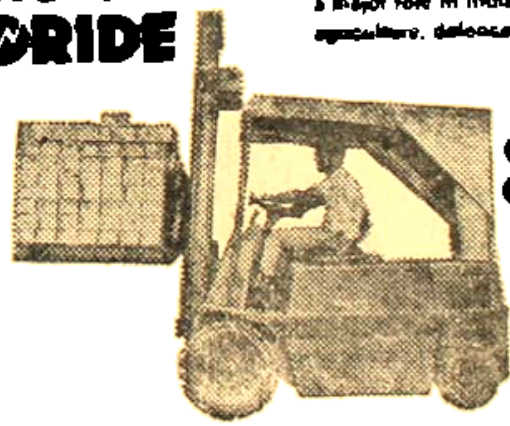

Over land, air or sea-
CHLORIDE know batteries best

The CHLORIDE brands : Exide, Dagenite, Index, Chloride.

Chloride India Limited
C[illegible]mbay, New Delhi
Khadki Nagpur Jullundur

বিবাহবার্ষিকী

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাইরেন বেজে উঠতেই মণিমোহন কর্বাজির দিকে তাকাল, তারপর মুখটিপে হেসে ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

স্টেপের প্রত্যেকে একই অভ্যেসে কর্বাজির দিকে তাকাল। মণিমোহনের ঠিক পাশেই যে মুবাটি অত্যন্ত শিথিল ভঙ্গিতে, যেন ঘুম-চোখে, দাঁড়িয়েছিল—সাইরেনের শব্দে সে হঠাৎ সেনানীর তৎপরতায় অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল, একটা ক্যাকুনি দিয়ে কর্বাজিটা চোখের সামনে ধরল, আঙুলগুলো মুঠো-করা। তারপরমুহূর্তে পাঁচটি চাঁপার কলি লীলায়িত ভঙ্গিতে প্রসারিত করে হাতের মুদ্রার দিকে চকিতে তাকালেন—যেন আড়চোখে অঙ্কের চিঠি পড়ছেন।

সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে

যে কিশোরীটি ওঠাং দাঁড়িয়ে পড়ে

পেছনদার এক তরুণের হাঁটুতে হাত রেখে কিছুক্ষণ গল্প করছিল.

"চলি রে, তোর বাস আর বলে পাড়েল চলিয়ে দিল.

দলের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে চিৎকার করে বলল—"আমার জীনসটা নিতে ভুলিস না" যেন তরুণ কিছুটা মজা-মাখা ঢঙে বলল—"তাহলে রোববার আমার সঙ্গে ডেট" কর মেয়েটি সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ছেড়ে বা হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জিব ভেংচে চলে গেল।

মণিমোহন লক্ষ্য করল, সাইকেল চালক মেয়েটি তার কথাগুলির দিকে তাকায় নি। ছেলেটি একা হয়ে, এবার, যেন আর কিছু করার নেই বলেই, হাতঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে সময় দিতে লাগল।

মণিমোহন শুনতে লাগল—এই দুই চার মাস এমনি দেখে যাচ্ছে শুধু তার আর হিন্দুস্থানী মজুরটির হাতে ঘড়ি নেই। অর্থাৎ—পকেটেও ভরতে দিয়ে মণিমোহন মনে মনে তার স্বীকার করে ভাবল—আচ্ছা, দশে দুইই ধরা যাক। অর্থাৎ—টোয়েন্টি পার্সেন্ট। ভালোই যাচ্ছে।

তাহলে, মণিমোহন—এই একাদশে ফল্গুনে ঐ একটিই তোমার সাথী, হিন্দুস্থানী মজুরটি। ঠিক, চোখ আছে, শিরু-ওঠা চাউনিতে হাত, তেলকালি-মাখা মলিন পোশাক। বেশ শান্তশিষ্ট বন্ধু মানতেই হবে।

আর, যাদের দেখে পাতাল ঠিক যাচ্ছে না, ঘাড় মুখটুকুই মাত্র, হাতে ভোরের পলকে বেরিয়ে যেতে পারে সৃষ্টি মেকেতে হিসেব করে অপেক্ষমাণ যাত্রীরা দুভাগ হয়ে দুটি দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দরজাদুটো যেন তত কড়াই, চৌদ্দ হাত না—ওতলানো দুদ কিছু বাইরে পড়েছে, কিছু পড়বে।

আজকাল প্রথম বাস পর্যন্ত পা ওঠে না, তাতেলের বউটি শক্ত মুঠোয় ধরে শরীরের ভার হাতে নিয়ে কিছুটা জিমন্যাস্টিকের কায়দায় মণিমোহনকে বাসে উঠতে হয়। প্রতিবারই বুকে একটা ধাক্কা লাগে, আর শ্বাসকষ্ট শুরু হয় সে অনেকদিন ভেবেছে ঠিক বাসে ওঠার সময় যদি স্টোক—যখন

With Best Compliments

from a

Well Wisher

একটা পা সিঁড়িতে, একটা পা শূন্যে··· ত্রিশঙ্কু···একটা প্রচণ্ড চাপ মণিমোহনকে ছিটকে ফেলে দিতে চাইছে···দাঁতে দাঁত চেপে মণিমোহন রডটা ধরে আছে, তার হাতই তখন পাখির চোখ। পা-টাকে মাড়িয়ে ধরেছে—সেই ভ্রমিকটি, নিশ্চয়ই উত্তর প্রদেশ থেকে এসেছে, জনসংখ্যা! শালা ঘোটা। ছি ছি মণিমোহন··· ই'-শি-ডার···সে অস্ফুটে উচ্চারণ করল—মা, মাগো।

বাসটা ছেড়ে দিল। একটা পা ফুটবোর্ডে, তার ওপর আবার একজনের পা সমস্ত অস্তিত্ব কেন্দ্রীভূত হত-ধরা হাতের মুঠিতে। পেছন থেকে এসে একটা প্রাইভেট বাস পা রেখে গরম হাওয়ার কাপট মেরে ওভারটেক করে চলে গেল। কণ্ডাক্টর ঘন ঘন বেল বাজাচ্ছে—অই, দাঁড়াও না। বাসের ভেতর দুজন ভদ্রমহিলা চিৎকার করে ঝগড়া করছেন। একজন বোম্বের বুড়ি। খোতলার ফুল বারান্দায় দাঁড়ানো দুষ্টু ছেলেটা তাকেই কি বক দেখাল? রেডিওর আশাবরী। ত্রিশঙ্কু মণিমোহন দাঁতে দাঁত চেপে কষ্টে শ্বাস নিচ্ছে। একটা বড় গাড্ডায় পড়ে বাসটা লাফিয়ে উঠতেই মণিমোহন ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল—একটি সমর্থ হাত তাকে বেড় দিয়ে ধরে রাখল। সেই মহুয়াটি।

অর্থোপেডিক ডিপার্টমেন্টের সামনে একটা হাসানো ঘটতলা, তার এপাশে অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে। কোনো একটায় চাপা স্বরে বিবিধ-ভারতী বাজছে।

প্রশস্ত বেদির কয়েক জায়গায় ক্ষয় ধরেছে। সারবাঁধা ভেঁতো পিঁপড়ে। এই ফাটল আর পিঁপড়ে প্রহরাধীন পরিষ্কার মতো মণিমোহন ও জনকে পাশের লোকগুলি থেকে সুদূর করেছে।

—'আর ভাল লাগছে না।'

—'একদিনের তো ব্যাপার!'

—'হাসপাতালে এলে আমি আরও অসুস্থ হয়ে পড়ি।'

—'সকলেই।'

—'তবু তো এটা স্বর্গ।'

—'যা বলেছ। সেদিন বীরুদিকে মেডিকেলে দেখতে গেছিলাম—ইমার্জেন্সির করিডোরে পা ফেলতেই আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো।'

—'বীরুদি কে?'

—'আমাদের জিওগ্রাফির।'

—'কি হয়েছে?'

—'সে অনেক কিছু।' কথা ঘুরিয়ে জনক বলল—'এখানেও মেটামিটিতে থেকেছি, বাঘুয়ার সময় মেডিকেলেও থাকলাম। কোনো তুলনাই হয় না।'

—'তিরিশ বছর আগে আরও ভালো ব্যবস্থা ছিল। সাহেবদের হাসপাতাল তো, ব্যাপারই আলাদা।'

—'তিরিশ বছরে মেডিকেল সায়েন্সের এত উন্নতি হয়েছে, কিন্তু আমাদের হাসপাতালগুলো স্থাবো।'

—'সবটাই তো গোড়া কেটে জল ঢালা। রোনাল্ড রসের নামে বিল্ডিং, ঘরে ঘরে ডিপার্টমেন্ট, এমনকি পারমাণবিক ব্যাধির জন্যও একটা বিভাগ। উঁচু দরের মাথা আর হাত এখনও সব বিদেশে বিক্রি হয়ে যায় নি, হয়তো কয়েকজন এই হাসপাতালেরই এখানে-ওখানে কাজ করছেন। কিন্তু ডাক্তারের পাশাপাশি আর্টিফিসিয়াল চিকিৎসার জন্য তোমাকে ভোররাত্তিরে এসে লাইন লাগাতে হয়েছে। ডাক্তারের কাছে পৌঁছাতে বেলা একটা বেজে যাবে।'

—'অ্যাডো পেশেন্ট। চিকিৎসার ব্যবস্থা—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হেসে মণিমোহন বলল—'নামমাত্র। কি করেই বা হবে! জনসংখ্যার যা চাপ! এই জন্যই তো—'

কথা ঘুরিয়ে জনক বলল—'সত্যি। কত রকমের হাড়ের ব্যামো, বাতের রুগীই কতো! কি দূর দূর জায়গা থেকে লোক এসেছে। ঐ শরীরে লাইন দিয়ে বসে আছে।'

—'কেন? ওদের বৌ নেই?'

—'সকলের নেই, থাকা মুশকিলও।'

—'কেন গা?'

—'তোমার ঠিক সামনের পেশেন্ট একজন বিধবা বৃদ্ধা। পরের জন···' জনক হেসে মুখে হাতচাপা দিল।

—'পরের জন?'

—'একটি কচি বউ।'

—'ফার্স্ট ক্লাস। টু ইন টু ওয়ান। কত পার্সেন্ট হল?'

জনক বিজ্ঞ মুখে বলল—'আবার? তোমার তো ফিকসেশন হয়ে যাচ্ছে।'

মণিমোহন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'তা বটে।' তারপর হাসল—'তাছাড়া বৃদ্ধা বিধবা, কচি বৌ—এদের তো নমিনেশন পেপারই ক্যানসেলড হয়ে যাবে।'

—'তাহলে তো তুমি আনকনটেসটেড।'

—'তোমার ব্যাপারে সে তো আমি চিরকালই।'

আবার মাইকে নাম ঘোষণা শুরু হল। চাপা আর ছোটো ওয়েটিংরুমে অপেক্ষমাণ পেশেন্টদের মধ্যে

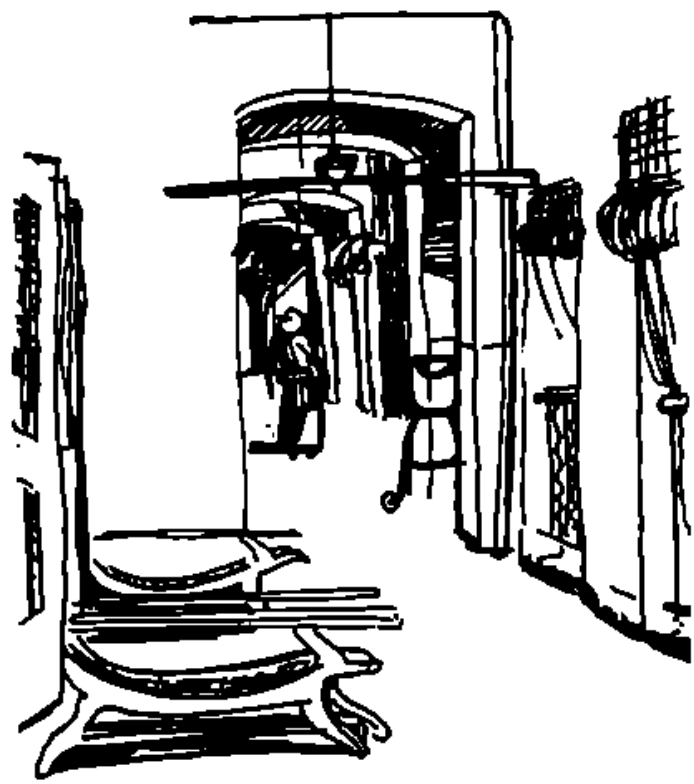

স্কেচ

শিল্পী : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

চাকলা। ভেতর থেকে দু তিনটি পাঞ্জাবী যুবক দ্রুত পদক্ষেপে বেরিয়ে এসে সামনের একটি গাড়ির দরজা খুলে ধরল। সসম্ভ্রমে চেহারার এক বৃদ্ধ কষ্টে নেমে দাঁড়ালেন। এক হাতে গাড়ির চালে ভর রেখে বৃদ্ধ ক্যামেরের ভংটা ছাড়িয়ে নিচ্ছেন। মণিমোহন ভাবল অনেকক্ষণ বসে থাকার পর দাঁড়াতে বৃদ্ধের কষ্ট হচ্ছে, আবার দাঁড়ানো থেকে বসতেও কষ্ট হবে। তারপর শিশুর মতো উলমলে পদক্ষেপে বৃদ্ধ ভেতরে ঢুকলেন।

—'এই চেহারা, এই স্বাস্থ্য নিয়ে কি দুঃখী ভদ্রলোকের।'

—'সত্যি।'

—'গাড়ি, পোশাক আশাক দেখে তো মনে হয় পকেটেও মোটাগুটি আছে।'

—'না বোধহয়। তাহলে কি আর আউটডোরে দেখাত?'

—'খোঁজ নিয়ে ছাখো—ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কোনো নামী ফিজিসিয়ানের প্রাইভেট পেশেন্ট নিশ্চয়ই তিনি এখানকার ডাক্তার। নিশ্চয়ই কিছু ক্লিনিক্যাল টেস্ট বা এক্স-রে টেক্স-রে করাতে হবে। আউটডোরে একটা স্লিপ কাটিয়ে একগাদা টাকা বাচালেন।'

—'সত্যি?'

—'বা, অপারেশন করাতে হবে—ডাক্তারই হাসপাতালে ভর্তি করে নিলেন। সীট নেই? তুমি মাসের পর মাস ঘুরছ? প্রাইভেট পেশেন্ট হিসেবে অমুক ডাক্তারকে বার দু-তিন ভিজিট দিয়ে দেখাও—তিনিই ভর্তি করে নেবেন। চূড়ান্ত ব্যাকেট।'

—'মানে ঘুস?'

—'বলতে পারো। এই পবিত্র ভারতভূমিতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এমন কোনো ব্যাপার নেই—যাতে ঘুস চলে না।'

—'কতো লাগল?'

মণিমোহন বলল—'সাড়ে তিনশো বোধহয়। আমি এসেছি ঘণ্টাখানেক হবে না?'

—'এবার মাইনে পেয়েই ঘড়িটা ছাড়িয়ে এনো।'

—'সত্যি। ভাববারও আর সময় পেল না। ছাখো এবার মাইনে করে পাই, ক-বারে পাই।'

কনক কিছুক্ষণ আর আর বিষণ্ণ চোখে মণিমোহনের দিকে তাকাল, তারপর মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে কিঞ্চিৎ জোর করে হেসে বলল—'অত ভাবছ কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে।'

দুহাতে কনকের একটা হাত ধরে আন্তরিক আবেগে মণিমোহন বলল—'আমি যে দেখতে পাচ্ছি সবকিছুই মিটবে না। আর বেশি হয়ে গেল, শরীর ভেঙে গেল। ভদ্রলোকের একটিমাত্র যে আশা—তাতে ধা পড়েছে। কনক—'

—'বলে দেবো মিতু, বাবুকা.

সবাইকে বলে দেবো। আমরা বুড়ো, বটতলায় বসে সুন্দরী মহিলার হাতদেখা

কনক বলল—'তবু তো পাউডার মাখি নি।'

হা হা করে হেসে উঠে অমিয় বলল—'সাবাস। কিন্তু ডায়ালগটা যে বটতলার নায়িকার মতো হল না!'

—'কি করে হবে? এ তো ভারত-চন্দ্রের সমসাময়িক অমিয় ভট্টাচার্যের পুঁথিসাহিত্য।'

অমিয় আবার হা হা করে হেসে উঠল। বটতলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আর যারা বসেছিল তাদের কেউ বিরক্ত কেউবা বিস্মিত কেউবা হাসিমুখে তিনজনের দিকে তাকাল। মণি-মোহন ধমক দিয়ে বলল—'আস্তে হাঁদার। এটা কি তোর গবেষণা-কেন্দ্র না ইউনিভার্সিটির করিডোর?'

অমিয় অন্যদের উপস্থিতি কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে জোড়হাতে কনককে বলল—'আমরা চিরকাল মনুর কাছে হেরে আছি, আর মনু হেরে আছে আপনার কাছে। অতএব, মহীয়সী, আমার মতো অজ্ঞাজনকে...'

কনক হেসে ফেলে বলল—'কি ব্যাপার বলুন তো? মিঠুর কাছে খুব বকা খেয়েছেন বুঝি?'

—'মিঠু?' অমিয় রাগ করে বলল—'কে মিঠু?'

—'এতদূর?' কনক বলল—'আমি আজই যাচ্ছি।'

—'হ্যাঁ। বাড়িতে তালা ঝুলছে। বাবুইকে সাউথ পয়েন্টে পৌঁছে দিয়ে এই আসছি। তাই তো এত দেরি হল।'

—'এই রে! আমরা যে আজ বাড়িতে নো-মিল করে বেরিয়েছি। ভেবেছিলুম আপনাকে নিয়ে সন্ট লেক যাব।'

—'সত্যি?' অমিয় রীতিমতো খুশি হয়ে বলল—'খুব ভালো হবে।'

—'কিন্তু গৃহিণীহীন বাড়িতে—'

—'আপনি গেলে মিঠু থাকবে।'

—'চোর!'

মণিমোহন হেসে ফেলে বলল—'ধরা পড়ে গেলি তো? ইডিয়েট!'

—'চলুন চলুন। ভেতরে

—'ক্ষতি বেজেছে?'

—'সাড়ে দশ'

—'আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট...'

—'বড় সাহেবকে মিনিট দশেক পরেই ডাকবে।'

—'কে বললে?'

—'আমি বলছি।'

—'আপনি কি করে জানলেন?'

—'বা রে। আমি তো সারা অর্কোপেডিক ওয়ার্ডে আপনাদের পেলুম না। শুনলুম ডাক্তার আজ সাড়ে দশটায় ক্লাস নেবা শুরু করবে। অর্থাৎ, কাজ সেরে চলে যাওয়াও সম্ভব না। মনু একলা ছেলে ঘরে নিশ্চয় আসেই নি। অগত্যা কাউন্টারে ভাব জমিয়ে ওয়েটিং রিপোর্টগুলো খুঁজে বাবুর নাম পেলুম। তখন বুঝলুম আশেপাশেই কোথাও আছেন। বেরোতেই বটতলা—দেখলুম কপোত কপোতী তখন বসি বেমিলনে।'

—'খুব সাহস বেড়েছে, না?'

—'বাড়বেই তো। রাস্তায় বেরিয়ে মিঠু তো আমায় চিনতেই পারে না, যেন পেছু পেছু বাড়ির চাকর চলেছি। অ্যাতো বিদ্যে বুদ্ধি জ্ঞান—এটুকু শেখাতে পারেন নি এমনকি হাসপাতালেও বরের পাশে কিভাবে বসতে হয়,

হয়?'

—'চড় খাবেন।'

মণিমোহন অমিয়কে দেখছিল। গায়ে একটা টকটকে লাল গেঞ্জি, পরনে বেল, এলোমেলো চুল কপালে এসে পড়েছে। অমিয়কে ঠিক কলেজের ছাত্রের মতো দেখাচ্ছে—তারুণ্যে চাপল্যে চনমন করছে।

কনক মুখে আঁচল চেপে বলল—'এই বিশ্রী জিনিসটা পরে বেরিয়েছেন কেন? আর কতকাল খোকাটি হয়ে থাকতে চান?'

—'চিরকাল। মনুকে আমরা অনেক সময় মুনি বলে ডাকি। ফিফথ ইয়ারে যখন আলাপ হল তখনই ও বুড়ো। মনুর কাছে সেদিনও আমি বাবালক ছিলুম, আজও আছি। কেউ কেউ বুড়ো হয়েই জন্মায়, কেউ কেউ—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মণিমোহন বলল—'যুবক। তা না হয় থাকলি, কিন্তু তার সঙ্গে ঐ জঘন্য গেঞ্জিটার সম্পর্ক কি?'

—'ওরে বুড়ো, এ হল মিচিংকা কাপড়া। সাউথ পয়েন্টের রেকটরের সঙ্গে র‍্যাপ্রোচমেন্ট ছিল। তাছাড়া—জামাকাপড়ের ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কোনো আলোচনা করতে আমি রাজি নই। বল তো এই ট্রাউজারের কাটকে কি বলে? বরং মিতুকে জিজ্ঞেস করিস। মিতু বাবুই পিউমণি—মিউ জেনারেশন—ওরা র‍্যাপ্রিসিয়েট করবে।'

—'বাঁদর।'

—'ঐতো। রুটস-এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবি না, নতুন প্রজন্মের মন জানবি না। পাঁচটি লোক এক ঘরে বসে সাজা তামায়

With best compliments :

Samar Singh Jayaswal Private Limited

Largest Manufacturers & Exporters
Of
Machinemade Shellac & Importers

Regd. Office :

27B Camac Street.
Calcutta-700016
Phone : 44 7234
44-7235
Telex : 7283 GUMLACS CA
Cable address : "Gumlacs"

P. O. Rangadih
Dist. Purulia (W. B.)
Phone 26 and 49
P. O. Jhalda
Dist. Purulia (W. B.)
Phone : 47

P 29396

কথা বলেই জীবন কাটিয়ে দিলি। দেশের লোক তোদের ভাগ করবে না তো কাদের করবে?'

কনক খিলখিল করে হেসে বলল —'এটা আপনি ঠিক বলেছেন। রিয়ালিটি থেকে এত বিচ্ছিন্ন এরা···'

—'ঠিকই বলে থাকি। যেমন আমার কপাল. সীরিয়াস কথাকেও লোকে হালকাভাবে নেয়; আর মনু হালকা কিছু বললেও মনে করে বাঁচি। তা কি আর করা হবে—এখন উঠুন।'

—'বলছি দেরি আছে। ঐখানে বসলে ওর শরীর খারাপ হয়ে যাবে। মাইকে তো নাম ডাকবেই।'

—'এইবারই ডাকবে।'

—'কিভাবে?'

অমিয় আড়চোখে একবার মণি মোহনের দিকে তাকিয়ে ভ্রাম্ করে উদাসীন গলায় বলল—'ডাকবে!'

—'মনু!'

—'বল।'

—'তুই ম্যানেজ করেছিস?'

—'করেছি।'

—'কিভাবে?'

—'সে খবরে তোর কি দরকার?' অমিয় হঠাৎ রুক্ষ স্বরে বলল—'এই সমাজের কাছে তোর কিছু প্রাপ্য ছিল, সমাজ তা দেয় না, ছলে বলে কৌশলে যদি খানিকটাও আদায় করে দি তাহলে আমাকে কোনো দোষই স্পর্শ করবে না। তোর এতখানি সময় এইভাবে রাস্তায় বসে বসে ওয়েট করা থেকে যদি বাঁচাতে পারি—তাহলে সমাজের যে উপকার করব···'

—'আমার দেশবাসীর ভালো থেকে আমি নিজেকে আলাদা করতে পারি না।'

অমিয় হাতজোড় করে বলল—'অন্তত আমার মুখচেয়ে গণ্ডগোল করিস না। আজ চারটেয় পেপার পড়ার কথা, সেইটুকু এখনও লেখা হয় নি।'

অকৃত্রিম বিস্ময়ে মণিমোহন বলল—'আজ? আমি তো কোনো চিঠি পাই নি।'

—'আমিই বারণ করেছি। বাঙলা গদ্যের প্রথম পর্বে যতিচিহ্ন—তোর সামনে এ বিষয়ে প্রবন্ধ পড়তে হলে আমি হেসে ফেলব।'

—'তো আজই হসপিটালে ব্লাডপ্রেশারমেন্ট করতে গেলি কেন?' মণিমোহনের মুখ স্নেহে উদ্বেগে কোমল হয়ে এলো—'চ চ। ডাক্তার দেখে আয়।'

অমিয়র হাতে ভর রেখে মণিমোহন উঠে দাঁড়াল। আহাজ রওনা দিলে নোঙরের শেকলে যেমন টান পড়ে, তার স্নায়ুতে মাংসপেশীতে অস্থিসন্ধিতে তেমনই টান। আড়মোড়া ভেঙে মণিমোহন বলল—'গোরা-বাবুকে বললেই পারতি—তিনি তো জানেন আজ তোর পেপার পড়ার কথা।'

—'গোরাদা বলেছেন ও চোখা পড়ার চেয়ে এ কাজটা সামাজিকভাবে অনেক বেশি ইমপরটেন্ট। আসলে ডাক্তার সেন যে সপ্তাহে একদিন বসেন। আজ না হলে সাতদিন দেরি হয়ে যেত।'

কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে অর্থো-পেডিক-এর আউটডোর। শেষ ধাপটা হঠাৎ একটু বেশি উঁচু। কথা বলতে বলতে উঠে অমিয় থমকে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল—মণিমোহন ওর হাত ধরে ভেতরে ঢুকল। মনে মনে হাসল। এর আগের বার কনকের সঙ্গে ঢুকেছিল। কনক কিন্তু বোঝে নি হাতটা বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। বাকি লজ্জা পেয়েছে? একেই বলি অমিয় ডিটেইলসের দিকে নজর।

আর, মাইকে নাম ঘোষণা শুরু হল। মণিমোহনেরও ডাক পড়েছে। তালিকা দশজনের, কিন্তু গোটা ওয়েটিংরুমে যেন বান ডেকেছে। কাউন্টারের পাশের দরজাটা দিয়ে সকলেই সরু করিডোরটায় ঢুকতে চায়। তার দুপাশে ছোটো ছোটো খুপরিতে এক-একজন ডাক্তার বসেন।

জলের ভেতর মাছের মতন অমিয় এক হাতে মোহনকে বেড় দিয়ে, কিন্তু না ছুঁয়ে, অনায়াস নৈপুণ্যে ভাঁড়ের ভেতরে চলে এলো, তার পেছনে কনক। মণিমোহন লক্ষ্য করল কীভাবে অমিয় হিপ্পিতে বাঙলার কাউকে ধমকে কাউকে অনুনয় করে কাউকেবা কনুইয়ের গুঁতোয় ঠেলে সরিয়ে নিজের রাস্তা করে নিল।

নির্দিষ্ট ঘরের সামনে কয়েকজনের লাইন—যাদের নাম ডাকা হয়েছে। বদ্ধ চাপা করিডোর, ফ্যান নেই—মণিমোহন দরদর করে ঘামতে লাগল।

—'কনক, একটু লাইনে দাঁড়ান। মনু আয়—।' মণিমোহনকে নিয়ে অমিয় সোজা হেঁটে গেল। করিডোরের ঐ মুড়োয় একটা বেঞ্চি, এবং কি আশ্চর্য, তার মাথার নতুন সিলিং ফ্যান। বেঞ্চিটা একেবারে ফাঁকা।

—'এখানে বোস। ডেকে নিয়ে যাব।'

অমিয় দ্রুত ফিরে যাচ্ছিল,

মণিমোহন আইকাল—'এখানে কি তুই আগে এসেছিস? কার জন্য?'

—'আমি নি তো।'

—'তবে কি করে জানলি এখিকে বেক্কি আছে?'

হেসে ফেলে অমিয় বলল—'ওখন ডোপ্পে দু'জনুম না? বোস, আসছি।'

মিনিট কয়েক পরেই অমিয় যেন উড়ে এল—'আয় আয়। তাড়াতাড়ি।'

লাইনে কনকের সামনে পাঁচজন। সে একটু আগে ব্যস্ত হয়ে অমিয়কে ঘরের ভেতর ঢুকতে আর বেরোতে দেখেছে। মণিমোহন এখন নিজেই লাইনে দাঁড়াবে কিনা বোঝার জন্য দুজনের দিকে নীরবে তাকাল। অমিয় ইশারায় তাকে অপেক্ষা করতে বলে মণিমোহনকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। লাইনের প্রথমেই একজন দশাসই জোয়ান দাঁড়িয়েছিল, সে রীতিমতো আপত্তি করে উঠল। ভুবনমোহন হেসে অমিয় বলল—'আ হা হা, অযথা উত্তেজিত হন কেন? ঐ যে, ও'র স্ত্রী—লাইনেই আছেন। ডাক্তারবাবু তো স্লিপ অনুযায়ী রুগী দেখবেন—আপনার-আমার ইচ্ছের কি কিছু হবে?'

ভেতর থেকে একজন বেয়ারা বেরিয়ে এসে বলল—'কি হয়েছে? এত গোল কিসের?' সুইং ডোরের একটা পাল্লা খুলে ঘরে অমিয়কে বলল—'আপনি আসুন।'

চোখের ইশারায় কনককে অনুসরণ করতে বলে অমিয় সেই দশাসই জোয়ানের দিকে এক পলক তাকিয়ে মণিমোহনকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

তাহলে ইনিই ডাক্তার সেন। চেম্বারে অবশ্য প্রবীণ ডাক্তারেরই মতো টেবিলে দু'কে একতাড়া কাগজে সই করছেন। সামনে আরেকজন ছোটো ডাক্তার। তাঁর হাতে কয়েকটা স্লিপ। বগলে ফাইল একটি নার্স মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। ডাক্তারের পেছনে দেয়াল ঘেঁষে একটা লোহার খাট পাতা, অবশ্য ময়লা বিছানার চাদর। তবে মণিমোহন বুঝে আশ্বস্ত হল, তাকে ওখানে শুতে হবে না। কারণ তাহলে উঠে ডাক্তারকে পেছন ফিরে দাঁড়াতে হবে, জায়গা দেওয়ার জন্য তাঁর সহকারী-কেও উঠে বেরিয়ে আসতে হবে বোকাই যাচ্ছে—সামনের টেবিল আর পেছনের খাটের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ পরিসরে কোনোরকমে ফেলা চেয়ার দুটোয় এই যে একবার তাঁরা বসেছেন, উঠবেন একেবারে রোগী দেখা শেষ করে।

টেবিলের এপাশে একটা স্টীলের চেয়ার আর দুটো টুল। একজন বৃদ্ধা একটি টুলে বসে আছেন। অপর টুলে মণিমোহন বসল। কনক অমিয়কে হাতের ইঙ্গিতে চেয়ারটা দেখাল। অমিয় চোখ পাকিয়ে অস্ফুটে ধমকে কনককে বসতে বলল। তারপর দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল এবং দাঁড়িয়ে রইল।

টেবিলের দামী ল্যাম্প আর স্টীলের ঝকঝকে চেয়ারটা অপ্রশস্ত খাঁচার মতো বিবর্ণ সেই ঘরকে আরও অবাস্তব করে তুলল।

ডাক্তার সেন বাঁ হাতে কাগজের তাড়াটা নার্সের দিকে এগিয়ে ধরে বৃদ্ধাকে কিছুটা কৌতুক কিছুটা গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন—'বুড়িমার আবার কি হল?'

বৃদ্ধা শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন। নার্স যেখানে দাঁড়িয়েছিল

ইংরাজী-বাংলা-হিন্দী

টাইপের

জন্য

★

লিট্‌ল
টাইপ
ফাউন্ড্রী

৭ এজরা স্ট্রীট, ৭০০০০১

ফোন : ২২-৪০৩৭

ডাক্তারের প্রসারিত হাতটা তার থেকে খানিক দূরে, কারণ তার মুখ বৃদ্ধার দিকে ফেরানো ছিল। নার্স একটু ঝুঁকে কাগজের তাড়াটা নিয়ে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাল। ডাক্তার ঘাড় ফেরালেন না, তবে 'ঠিক আছে' ভঙ্গিতে বাঁ হাতের ছুটো আঙুল একটু নাড়লেন। নার্স চলে গেল।

ছোটো ডাক্তার একটা স্লিপ ডাক্তার সেনের হাতে দিলেন। এক পলক সেদিকে তাকিয়ে স্লিপটা ফেরত দিয়ে ডাক্তার সেন বললেন—'কত বয়েস হল বুড়িমার?'

—'তা বাবা আটষট্টি হল

—'কষ্টটা কি?'

—'মাথা ঘোরে বাবা, তখন চোখে দেখা দেখি।

—'আর চিকিৎসে এখানে হয় হাড়ের কোনো কষ্ট আছে?'

—'আছে বাবা হেনা হেবার প্রথম পোয়াতি হল, পড়ে গিয়ে পাছার হাড়ে চোট পাই। কতা চিকিচ্ছেও করায়। এত বছর বাদে আবার সে ব্যাপারটা বলা দিচ্ছে।'

—'হুঁ।'

ডাক্তার সেন এই প্রথম বৃদ্ধার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন—'ফটো আছে?'

—'আছে বাবা। এই যে।'

হাত পেতে একটা রোল-করা বড় খাম নিয়ে ডাক্তার সেন হেসে বললেন—'কে যেন পোয়াতি হয়েছিল?'

—'হেনা।'

—'সেই তখনকার ফটো?'

—'হাঁ বাবা।'

—'বাচ্চা হয়েছিল?'

—'হাঁ বাবা, আমাদের দুগ্গি।'

—'তা এতদিনে তো দুগ্গিরও পোয়াতি হওয়ার বয়েস হল।'

—'তা আর হয় নি বাবা? তা-র···'

বাধা দিয়ে হেসে ডাক্তার সেন বললেন—'বস্ত করে রেখে দিন, বরুন, একস্রিবিশন পীস—কি বলো চন্দ্র? নতুন ফটো করতে হবে বুড়িমার। তাছাড়া একটু ভালো খাওয়া দাওয়া করুন, ছানা খান। আপনার হাড়ের ক্যালসিয়াম কমে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছেন, হয়তো দেখবেন মট্ করে পায়ের হাড় মচকে গেল।'

—'মাথার বাবা···'

বাধা দিয়ে ডাক্তার বললেন—'বলছুম যে এখানে শুধু হাড়ের চিকিৎসা। পাছার যন্ত্রণার জন্ম বড় লিখে দিচ্ছি—হাসপাতালেই পাবেন। ফটোও হাসপাতালেই করিয়ে নিন—সস্তা হবে সামনের হপ্তায় আবার টিকিট জমা দিয়ে ফটো দেখিয়ে যাবেন।'

বৃদ্ধা মুহূর্তেক অভিভূত দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অভিজ্ঞ প্রবীণ ডাক্তার সেনের চোখেমুখে গলার স্বরে একই সঙ্গে একটু বধাম-ঘেঁষা কৌতুক—অল্পশিক্ষিতা গরিব বৃদ্ধা যাতে হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে দূরের মানুষ ভেবে ভয় না পায়, আবার নির্দেশের গুরুত্ব—যাতে অবহেলা সময় নষ্ট না করে। রুগী আর চিকিৎসকের একটা বাহ্যিত সূক্ষ্ম ব্যবধান যে-মুহূর্তে ঘুচে যায়—ডাক্তার সম্পর্কে পেশেন্টের অনড় আস্থাও নাকি সে-মুহূর্ত থেকে হ্রাস পেতে থাকে।

মণিমোহন ডাক্তার সেনের পেশাদারি দক্ষতা—শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই যা এখন তাঁর অস্তিত্বের স্বাভাবিক প্রকাশ—দেখতে দেখতে ভাবছিল বৃদ্ধার মাথা ঘুরে ওঠার চিকিৎসাটা কোথায় হবে, কে করবে?

ছোটো ডাক্তার আরেকটা স্লিপ এগিয়ে দিলেন, এক পলক সেটা দেখে মণিমোহনের দিকে তাকিয়ে একই অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে ডাক্তার সেন হাসলেন—'বলুন।'

—'কোনো মানেই হয় না।'

—'সত্যি।'

ক্ষুব্ধ স্বরে অমিয় বলল—'ঠিক তিন মিনিট সময় দিয়েছেন, আমি ঘড়ি দেখেছি তারপর ডাক্তার সেনের গলায় বলতে লাগল—'যা পা-টা তুলুন তো, এবার ডান পা। যা পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ান, পারলেন না? আচ্ছা, ডান পায়ে। একবার ওঠবোস করুন—ব্যস্? আর নিচু হতে পারলেন না? পায়খানা যান কি করে? কি জ্বালাময় লোক মাইরি। রিডিকিউলাস।'

মণিমোহন হেসে বলল—'কিন্তু এতগুলো কথা বলতেই তো তিন মিনিট লেগে যাওয়ার কথা। তারপর প্রেসক্রিপশন লিখেছেন:···'

অমিয় বলল—'ছাখ মনু, হাসপাতালে ঢোকার পর থেকে মাথায় আগুন জ্বলছে। কয়েকটা ঘুসি মারার জন্ম দুই হাত নিশপিশ করছে। তুই কি এদের হয়েও ওকালতি করবি?'

দুজনেই কিছুটা বিস্মিত হয়ে অমিয়র দিকে তাকাল। যেন ফেটে পড়ে অমিয় বলতে লাগল—'বলুন, আপনিই বলুন। এ কী একটা দেশ? এখানে মানুষ বাঁচতে পারে? ভোর-

(১২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শারদীয়া পূজাতে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার...

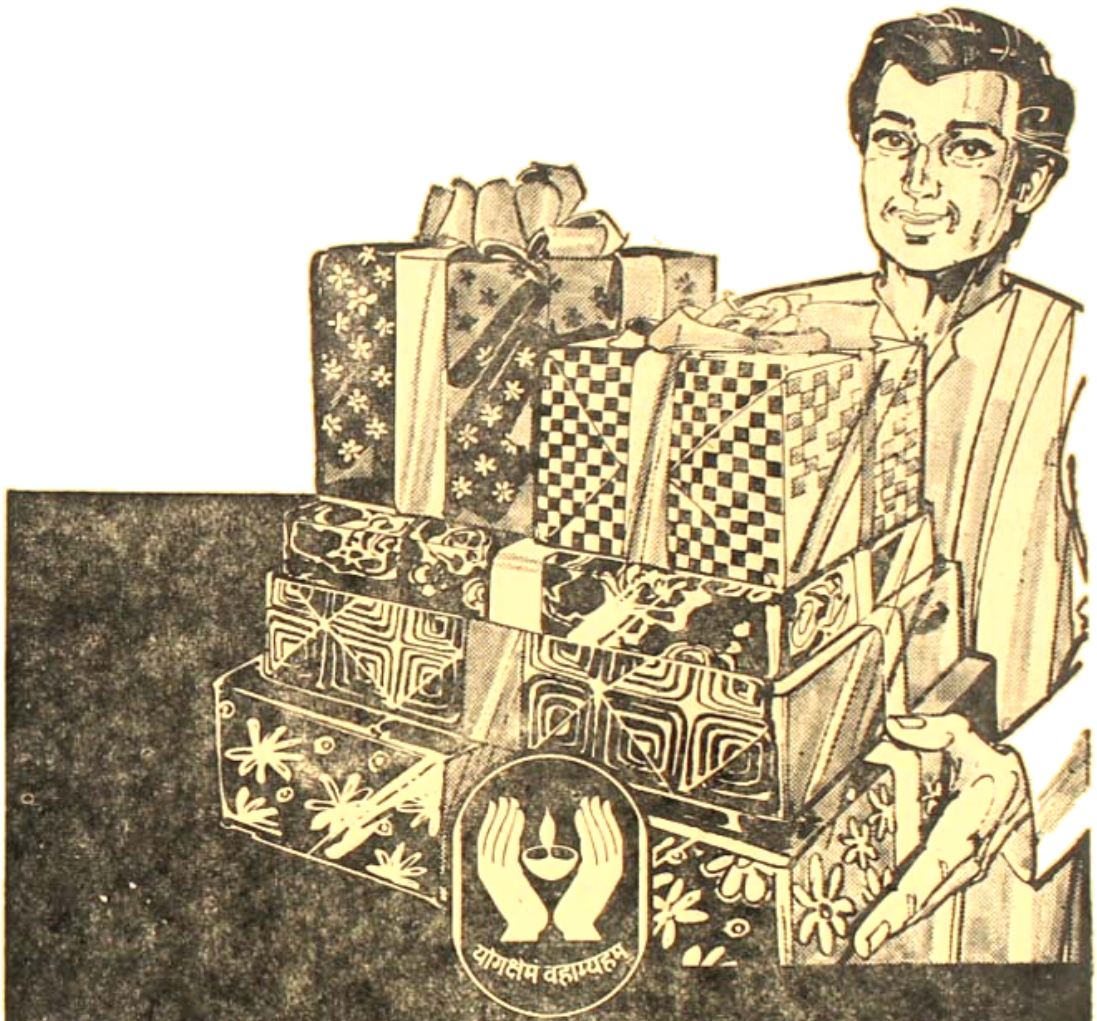

একটি জীবন বীমা পলিসি

হাসিখুশিভরা আনন্দ উৎসবের দিন-গুলি এসে গেল। এই উৎসবের দিনে প্রিয়জনকে উপহারে ভরিয়ে দিতে মন চায়। মনে রাখবেন, প্রিয়জনকে সবার সেরা উপহার দিতে হলে তাঁকে দিন—একটি জীবন বীমা পলিসি। যে উপহার তাঁর সারা জীবনের জন্য এক নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের গ্যারাণ্টী দেয়।

জীবন বীমার কোনও বিকল্প নেই

daCunha/LIC/44

বর্তমান চীন ও মাও সে তুং-এর অগ্রচলিত দলিল

জগদীশ দাশগুপ্ত

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও উত্তর ভোরিয়া সফর শেষ করে যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো আগস্ট মাসের শেষে, দশদিনের জন্য চীনে গিয়েছিলেন। চীনের পার্টির নেতৃবর্গ ও চীনের জনগণের কাছ থেকে বিপুল সংবর্ধনা পেয়েছেন। সংবাদ সূত্রের মতে এই অভ্যর্থনা ছিল অভূতপূর্ব সম্প্রতিকালে, কোনো বিদেশী অতিথিকে এই ধরনের সম্মান প্রদর্শন করা হয় নি। চেয়ারম্যান হুয়া যুগোস্লাভিয়া পরিদর্শনের জন্য মার্শাল টিটোর আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করেছেন। দেশে ফিরে গিয়ে মার্শাল টিটো আশা প্রকাশ করেছেন যে তাঁর এই সফরের ফলে সোভিয়েত, চীন ও যুগোস্লাভের পারস্পরিক সম্পর্কের অনেক উন্নতি হবে।

যুগোস্লাভ প্রতি চীন নেতৃবর্গের হৃদয় পরিবর্তন যেমন বিস্ময়কর তেমনি মানানের। এতদিন এই মার্শাল টিটো ও যুগোস্লাভ কমিউনিস্ট নেতৃবর্গের 'শোধনবাদ'-এর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ দিয়েই চীনের কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভেদের সূচনা করেছিলেন। অবশ্য সেদিনও তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবর্গ। এর পর থেকে গত দু'দশকে ভোল্গা ও ইয়াংসিকিয়াং দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। চীন-সোভিয়েতের এই বিরোধের ওপর নির্ভর করেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র চালিয়েছে। এই শক্তিরা আজ শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। চীন ও সোভিয়েতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হলে যে সাম্রাজ্যবাদের দুর্দিনের শুরু হবে সে কথা তারা ভালভাবেই জানে।

মার্শাল টিটোর এই সফরের অনেক আগেই লণ্ডনের ফিনান্সিয়াল টাইমস লিখেছিল :

-Hua is in effect attempting to put the clock back to mid fifties, before the turmoil of the Great Leap Forward and the Cultural Revolution. Then the country was contemplating a successful five-year plan, and the sense of purpose and unity among the people of China was strong. Hua can do this without losing the authority of Maoism, by appealing to earlier writings and speeches of the Great Chairman Mao."

কার্যত হুয়া যেটা করছেন সেই হল পঞ্চাশ দশকের চীনকে ফিরিয়ে আনতে যখনও সেখানে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও বৃহৎ উল্লম্ফনের টানাপোড়েন শুরু হয় নি। তখন যেন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের কথা ভাবছে ও চীনের জনগণের ভেতর চিন্তা ও প্রত্যয় ছিল তুঙ্গে। চেয়ারম্যান মাও-এর পূর্বেকার রচনা ও বক্তৃতার সাহায্য নিয়েই এই কাজ হুয়া করতে পারেন—মাওবাদের কণ্ঠস্বরকে অস্বীকার না করেই। (সহজ অনুবাদ)।

পশ্চিমী সংবাদপত্রগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তাদের এই ধরনের জল্পনা কল্পনা খুব বেশি করে শুরু হয়েছে এই বছরের গোড়া থেকে। গত বছর ২৩ ডিসেম্বর হুয়া 'বর্তমান পরিস্থিতি' সম্পর্কে যে বক্তৃতা দেন সেটাকে সূত্র করে, চীন নিয়ে সংবাদপত্রের বাজার আবার গরম হয়ে উঠলো। অনেক দিক থেকেই এই বক্তৃতা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। হুয়া এই বক্তৃতায়, চিয়াংচিং ও তাঁর তিন সাকরেদদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে মাওয়ের নির্দেশ গোপন করা বা বিকৃত করা; প্রয়াত নেতা চু এন লাই ও অন্যান্য প্রবীণ বিপ্লবীদের পদচ্যুত করার চেষ্টা করা; কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সেনাবাহিনীকে ছত্রাখান করা; তাদের বিরোধী তরুণ পার্টি সভ্যদের মার দেওয়া; যে সকল পার্টি সভ্য ভুল করেছিলেন, কিন্তু সংশোধন করতে আগ্রহী এমন সকলকে শেষ করে দেওয়া; পার্টিতে উপদল গঠন ও ভাঙ্গ- ধরানো; বিভিন্ন উপজাতিদের ভিতর বিরোধ সৃষ্টি ইত্যাদি। হুয়া বলেছেন : "এরা (চারমূর্তি) কেন চেয়ারম্যান মাও-এর বিপ্লবী লাইন ও পররাষ্ট্রনীতির অবমূল্যায়ন করতে, বিদেশী জিনিসকে পূজা করতে, বিদেশীদের প্রতি দাসত্বমূলক মনোভাব প্রদর্শন করতে, বিদেশীদের সঙ্গে বে-আইনী গুপ্ত সম্পর্ক রাখতে ও সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চান?

কেনই বা এরা আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ও গঠনকার্যের বিপুল অগ্রগতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে এবং আমাদের পার্টি ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বকে নস্যাৎ করে দিতে, সমাজতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনগুলিতে বিপর্যয় ঘটাতে এবং বিপ্লব ও উৎপাদনে সাবোতাজ করতে চান? এর একমাত্র উত্তর হল যে এরা দক্ষিণপন্থী, নিকৃষ্ট পুঁজিবাদপন্থী এবং অত্যন্ত সাংঘাতিক প্রতিবিপ্লবী।" হুয়া এদের 'চিয়াং কাইশেখের প্রতিক্রিয়াশীল কুমিনটাং-এর সঙ্গে দলগতভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকার অভিযোগ ভুল বলেছেন যে 'মাও সে-তুং, মৃত্যুর পূর্বে, এদের শুধু বারে-বারে তীব্র সমালোচনাই করেন নি, এই চারমূর্তির প্রতি কি আচরণ করতে হবে তার জন্য স্ট্রাটেজি তৈরি করে রেখে যান।' হুয়া দাবি করেছেন যে বর্তমানে চারমূর্তিকে চীন সরকার এই স্ট্রাটেজি অনুযায়ী আচরণ করছে।

এই অভিযোগগুলির ভেতর, কতকগুলি নতুন ধারা লক্ষ্য করা যায়। যেমন বিদেশীদের সঙ্গে বে-আইনী গুপ্ত সম্পর্ক রাখা; সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা; কুমিনটাং-এর চর হিসাবে কাজ করা; সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনগুলি নস্যাৎ করা ইত্যাদি।

হুয়ার এই বক্তৃতার ভেতর দিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নরম ও চরমপন্থীদের ভেতর যে লড়াই দীর্ঘদিন ধরে চলছিল এবং মাও সে তুং-এর মৃত্যুর পর যেটা তীব্র আকার ধারণ করেছিল তার সমাপ্তি ঘটলো। ১৯৭৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে চীনের রাষ্ট্রক্ষমতা প্রায় চারমূর্তির হস্তগত হয়। তেং সিয়াও পিং-এর অপসারণের পর থেকে এরা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখন চীনের শক্তি সমাবেশে চারটি ধারা লক্ষ্য করা যায়:

১। চরমপন্থীদের (চারমূর্তি) হাতে ছিল পিকিং পিপলস্ ডেইলি, রেড ফ্ল্যাগ ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা, রেডিও, সিনেমা ও থিয়েটারগুলি। এসব-গুলিতে চিয়াং চিং-এর আধিপত্য ছিল একচেটিয়া। কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা ছিল এদের সমর্থক।

এদের প্রভাব বিস্তৃত ছিল শ্রমিক মিলিশিয়ার তরুণ কর্মীদের ভেতর। সাংহাই শহর ছিল এদের প্রধান ঘাঁটি। সেখানকার শহর পরিচালনা ও পার্টি সংগঠনে এদের প্রাধান্য ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত।

২। নরমপন্থী: চু এন লাই-এর মৃত্যু এবং তেং সিয়াও পিং-এর অপসারণের পরে এদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন লিসিয়েন ছিয়েন, উপ-প্রধান-মন্ত্রী ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ। এদের প্রভাব ছিল জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রশাসক ও পার্টির পদাধিকারীদের উপর।

৩ সেনাবাহিনী: অধিকাংশ কমান্ডারেরা মার্শাল ইয়ে চিয়েন ইং-এর নেতৃত্বে নরমপন্থীদের সমর্থন করতো। কিন্তু তরুণ অফিসারদের এক বড় অংশ চরমপন্থীদের সমর্থক ছিল

৪ মধ্য-বামপন্থী: এরা একটি ছোট দল। হুয়া ছিলেন এদের অন্য-

চু এন লাই-এর মৃত্যুর পর তেং সিয়াও পিং-এর অপসারণকে লক্ষ্য করে চরমপন্থীরা যে আক্রমণ শুরু করেছিল তার ভেতর দিয়ে এদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কিছু নতুন

"সত্যি কথা বলতে কি—বিশ্বাস আমি ব্রিটিশদেরও করি না, জাপানীদেরও না, দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে বিশ্বাস কাউকেই করা যায় না, আমরা যতদিন দুর্বল থাকব শক্তিশালী যে কোন জাতিই সুযোগ পেলে আমাদের শোষণ করতে ছাড়বে না"—নেতাজী

নেতাজী ও তাঁর আজাদহিন্দ ফৌজ সংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর, তথ্যসমৃদ্ধ একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান

আজাদহিন্দ ফৌজ ও নেতাজী

। বারো টাকা ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত

ছোটদের সেরা গল্প

। চার টাকা ।

চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এ্যাণ্ড কোঃ লিঃ

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলি-৭০০০৭৩

প্রতিষ্ঠিত: ১৯১০ সাল ফোন: ৩৪-১৯০৪

পাওয়া যায়। তেং-এর প্রচারিত পুস্তিকা এদের বিষদৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১। সাধারণ কর্মসূচী (On the general programme) ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা (Some problems concerning Science & technology) ৩। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার দ্রুত করার কয়েকটি সমস্যা (Some problems in accelerating industrial development) চারমূর্তি ঘোষণা করলেন একটি "বিষাক্ত আবর্জনা"। "প্রয়াত লিন পিয়াও-এর প্রভেই ৩৭১-এর সঙ্গে এগুলি একই পর্যায়ভুক্ত। কি ছিল এই রিপোর্টগুলিতে? চীন দেশের কৃষি, শিল্প, জাতীয় প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যা—এই সমস্ত ক্ষেত্রের আধুনিকীকরণের দাবি করেছিলেন তেং। এবং বিদেশী প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানির জন্য দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির সুপারিশ করা হয়েছিল। বিজ্ঞান গবেষণা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পার্টি কমিটির হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করা হয়েছিল।" তেং বিশেষ করে চরমপন্থীদের সমালোচনায় বলেছিলেন, এরা একদিকে রাজনীতির ওপর জোর দিয়ে অর্থনীতিকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয় না, অন্যদিকে বিপ্লব বিপ্লব করে চিৎকার করে উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে। এই সমস্ত বক্তব্য ছিল 'বিষাক্ত আবর্জনা'-স্বরূপ। চারমূর্তি লিখলো: "আমাদের পার্টির চূড়ান্ত লক্ষ্য হল সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা। সমস্ত আধুনিকীকরণের প্রকল্প এই লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই লক্ষ্য সামনে না রেখে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা পুঁজিবাদী পথকেই উন্মুক্ত করবে।" সম্প্রতি তেং সিয়াও পিং পুনর্বহাল ও সসম্মানে প্রত্যাবর্তন হয়েছেন। এর থেকে চীনের নতুন হুয়া সরকারের আভ্যন্তরীণ নীতির সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হবে। কিন্তু বর্তমান সরকার চীনকে কোন পথে পরিচালিত করতে চান সে সম্পর্কে জানতে হলে মাও সে তুং-এর একটি পুরানো বক্তব্য অনুধাবন করতে হবে। এই বক্তৃতা মাও দিয়েছিলেন পার্টির পলিটবুরো মিটিং-এ ২৫ এপ্রিল, ১৯৫৬ সালে। গত ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৬ এই বক্তৃতা পিকিং রিপোর্ট ডেইলিতে প্রকাশিত হয়েছে। এতদিনকার পুরানো এই বক্তৃতাটি এত ঘটা করে প্রচার করা হল দেখে মনে হয় যে হুয়া চেষ্টা করছেন সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও ৫৫ উদ্ঘাটনের আগের যুগের চীনে ফিরে যেতে। অর্থাৎ সেখান থেকে মাওয়ের নতুন পথে যাত্রা শুরু করতে। মাও সে তুং-এর এই বক্তৃতা আগে আমাদের দেশে প্রচারিত হয়েছে কিনা জানি না। সম্ভবত হয় নি। এই বক্তৃতার কিছুদিন পর থেকেই শুরু হয়েছিল সোভিয়েতের বিরুদ্ধে প্রচার। তখন থেকে কমিউনিস্ট শিবিরে মতভেদই হয়ে দাঁড়াল সারা বিশ্বের আলোচনার বিষয়বস্তু। এই বক্তৃতায় মাও ১০টি প্রধান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ১। ভারী শিল্প ও কৃষি ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্পর্ক; ২। উপকূল অঞ্চলে শিল্প ও দেশের ভেতরের শিল্পের সম্পর্ক; ৩। অর্থনৈতিক উৎপাদন ও প্রতিরক্ষা উৎপাদন; ৪। রাষ্ট্র, উৎপাদন ইউনিট ও উৎপাদকের সম্পর্ক; ৫। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রশাসকদের সম্পর্ক; ৬। হান জাতি ও সংখ্যালঘু উপজাতিদের সম্পর্ক; ৭। কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্য পার্টিগুলির সম্পর্ক. ৮। বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের সম্পর্ক: ৯। পার্টি এবং যারা ভুল করে তাদের সম্পর্ক এবং ১০। চীন ও অন্য দেশের সম্পর্ক এই বক্তৃতার একটা লক্ষণীয় দিক ছিল স্তালিনের কিছু কিছু নীতির সমালোচনা। বিশেষ করে, কৃষকদের ও সংখ্যালঘু জাতিদের প্রতি তাঁর নীতি, মূল্যায়ন, এবং চীন সম্পর্কে স্তালিনের নীতির সমালোচনা করেছেন মাও তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিমাতে। এই বক্তৃতার কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল:

"সাম্প্রতিক মাসগুলিতে পলিটবুরো সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর. (transformation) সম্পর্কে কতকগুলি সমস্যা চিহ্নিত করেছে। সব মিলিয়ে ১০টি সমস্যা বা ১০টি প্রধান সম্পর্কতে দাঁড়ায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গঠনে যে কিছু ত্রুটি ও ভ্রান্তি ঘটেছিল সে কথা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে (ক্রুশ্চেভের বিংশ পার্টি কংগ্রেসের বক্তৃতার দু'মাস পরে এই বক্তৃতা দেন মাও সে তুং)। তোমরা কি সেই বাঁকা পথে চলতে চাও? ওদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই আমরা অতীতে বাঁকা পথে চলা এড়িয়ে যেতে পেরেছি; আজ সেই চেষ্টার আরো প্রয়োজন..." ১০টি সমস্যা সম্পর্কে মাও বলেছেন (অংশ বিশেষ):

ভারী শিল্প এবং হালকা শিল্প ও কৃষি সম্পর্কে: "আমাদের দেশের গঠনকার্যে ভারী শিল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। উৎপাদনের যন্ত্র, উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে,

See a permanent exhibition of Soviet Machinery, Catalogues and Leaflets at :

THE USSR SHOWROOM

of the Trade Representation of the USSR

45-3214
45-1829—30

গণপ্রতীত সংখ্যা, ১০৮৪

এটা দুঃখের। কিন্তু এর মানে এই নয় যে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, বিশেষ করে খাদ্যশস্য, উৎপাদনকে অবহেলা করা চলে। একদিকে ভারী শিল্প ও অন্য দিকে হালকা শিল্প ও কৃষি এই দুটিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। এই দুইয়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা কোন নীতিগত ভুল করি নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কয়েকটি পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশ থেকে আমরা ভালই উৎরেছি। প্রতি অক্টোবর বিপ্লবের শস্য উৎপাদনের পরিমাণ পৌঁছাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের দীর্ঘদিনের বাধ্যতা, ভারী শিল্প ও হালকা শিল্পের বিকাশের সম্পর্কে অস্থিতিস্থাপকতার ফলে কয়েকটি পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশে যে গভীর সমস্যা দেখা দিয়েছিল—আমাদের দেশে এই ধরনের সমস্যা নেই। ওই সব দেশে ভারী শিল্পের ওপর একপেশেভাবে বেশি জোর দেওয়া ও কৃষি ও হাল্কা শিল্পকে অবহেলা করার ফলে বাজারে পণ্যের যোগান দেখা দেয় ও মুদ্রা অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। আমরা কিন্তু কৃষি ও হাল্কা শিল্পের ওপর বেশি জোর দিয়েছি।"

উপকূল অঞ্চলে ও দেশের ভিতরে শিল্পের সম্পর্কে: "অতীতে যখন কোরিয়াতে যুদ্ধ চলছিল এবং যখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ ছিল, উপকূল অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আমাদের নীতি এর দ্বারা প্রভাবিত ছিল স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু মনে হয় এখন চীনের বিরুদ্ধে কোনো আগ্রাসী যুদ্ধের কিম্বা অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে না, এবং সম্ভবত এক দশক কিম্বা বেশি দিন ধরেই শান্তি বজায় থাকবে। কাজেই আমরা যদি এখনও উপকূলের শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতাকে পূর্ণ ব্যবহার না করি তাহলে ভুল করব। একথা মনে করা অবাস্তব যে পারমাণবিক বোমা আমাদের মাথার ওপরে ঝুলছে এবং যে কোনো সময়ে পড়তে পারে, কাজেই উপকূলের শিল্পগুলি সম্পর্কে আমাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া ভুল হবে।"

অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার উৎপাদন: "মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিরোধ ও কোরিয়াকে সাহায্যদান ও কয়েক বছরের প্রশিক্ষণ ও সংহতির ফলে আমাদের সামরিক বাহিনী এত শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠেছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেকার সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর চেয়েও তারা শক্তিশালী। আমাদের যে শুধু বেশি সংখ্যায় বিমান বা আণবিক অস্ত্র আছে তা-ই নয়, আমরা শীঘ্রই পারমাণবিক বোমা পেয়ে যাব। আজকের জগতে অস্ত্রের চাপ এড়াতে হলে পারমাণবিক বোমা ছাড়া আমাদের চলবে না। তাহলে এ ব্যাপারে কি করা যাবে? একটা নির্ভরযোগ্য পন্থা হল সামরিক ও প্রশাসনিক খাতে খরচের ভার তুলনামূলকভাবে কমিয়ে এনে এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনে খরচের হার বাড়িয়ে একমাত্র অর্থনৈতিক গঠনের হার দ্রুততর করেই প্রতিরক্ষা শিল্পের অগ্রগতি সম্ভব। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫৩-১৯৫৭) সামরিক ও প্রশাসনিক খাতে ব্যয় হয়েছিল রাষ্ট্রীয় বাজেটের সমস্ত ব্যয়ের শতকরা ৩০ ভাগ। এই হার অত্যন্ত বেশি। দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালে (১৯৫৮-১৯৬২) এই হারকে কমিয়ে শতকরা ২০ ভাগে নামাতে হবে। তাহলেই কারখানা স্থাপন করা ও আরো বেশি করে ধনসম্পত্তি তৈরির জন্য অর্থের সংস্থান হবে।"

রাষ্ট্র, উৎপাদনের ইউনিট ও উৎপাদক: এইসব দিকগুলির ওপর নজর দিয়েই এদের সম্পর্ককে সুষ্ঠু রাখা যায়—এই কথা বলে মাও বলছেন: "উদাহরণস্বরূপ, শ্রমিকদের কথাই ধরা যাক। তাদের শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি যেমন বাড়বে, সেইভাবেই তাদের কাজের ব্যবস্থার ও তাদের জীবন সুযোগ সুবিধার উন্নতি হওয়া উচিত। আমরা সব সময়েই 'বাহুল্যবিহীন জীবন ও কঠোর শ্রম' নীতির সমর্থন করি এবং ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকেই সর্বস্ব করে তোলার বিরোধী, কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা জনসাধারণের জীবনধারণের ব্যাপারে সর্বদাই উদ্বেগ প্রকাশ করেছি এবং জনগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদাসীন আমলা-তন্ত্রের বিরোধিতা করি। মজুরি বাড়তে থাকবে কিন্তু খুব বেশি হবে না। কেন্দ্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদনের ইউনিটগুলির নিজস্ব অধিকার বাঁচিয়ে রাখতে হবে নইলে তারা জোর কদমে বাড়বে না।

কৃষকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভাল কিন্তু আমরা শস্যের প্রশ্নে ভুল করেছি। ১৯৫৪ সালে বন্যার ফলে আমাদের দেশের অনেক অঞ্চলে উৎপাদন কমে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা ৭০০০ মি ক্যাটি (প্রায় ৪০ লক্ষ টন) বেশি শস্য ক্রয় করেছিলাম। উৎপাদন কম কিন্তু ক্রয় বেশি—ফলে কৃষকরা ক্ষুব্ধ হল এবং পার্টির ভেতর ও বাইরে থেকে অনেক অভিযোগ আমাদের কাছে এল। ১৯৫৫ সালে আমরা ৭০০০ মি ক্যাটি কম খরিদ

করলাম এবং শস্য উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয়ের একটা নির্দিষ্ট কোটা ঠিক করে দিলাম—এর ওপর যে বছর শস্যের উৎপাদন খুব ভাল হল। বেশি উৎপাদন ও কম ক্রয়ের ফলে কৃষকদের হাতে প্রায় ২৩,০০০ মি. টন শস্য উদ্বৃত্ত থেকে গেল।

কৃষকদের সম্পর্কে আমাদের নীতি সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতির থেকে ভিন্ন। আমরা রাষ্ট্র ও কৃষক উভয়ের স্বার্থই দেখি। আমাদের কৃষি কর সব সময়েই তুলনামূলকভাবে কম ছিল। শিল্পজাত ও কৃষিজাত পণ্যের বিনিময়ে আমরা দামের পার্থক্য কমিয়ে আনি—মোটামুটি একই মূল্যমানের পণ্যের বিনিময়ের নীতি গ্রহণ করি। রাষ্ট্র কৃষিজাত পণ্য যেন একটা নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করে যাতে কৃষকের কোনো ক্ষতি না হয়। তাছাড়া এই ক্রয় মূল্য আমরা বাড়িয়ে দিতে থাকি। কৃষকদের শিল্পজাত পণ্য বিক্রয় করার ক্ষেত্রে আমরা খুব অল্প লাভ রেখে অনেক বেশি বিক্রি করার নীতি অনুসরণ করি এবং মূল্যমান স্থির রাখা সম্ভব হলে কমিয়ে দিয়ে থাকি। যেসব অঞ্চলে শস্যের ঘাটতি থাকে সেখানকার কৃষকদের কাছে শস্য বিক্রয়ে আমরা কিছু পরিমাণ ভর্তুকী দিয়ে থাকি। এসব সত্ত্বেও আমরা সতর্ক না থাকলে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে ভুল হবার আশঙ্কা থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে প্রচণ্ড ভুল করেছে সে কথা স্মরণ রেখেই রাষ্ট্র, কৃষক ও কৃষি ক্ষেত্রে অপারেটিভগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক খুব সতর্কতার সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে যাতে কোনো পক্ষই যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

পার্টি ও পার্টি বহির্ভূত: "অনেক গণতান্ত্রিক পার্টি, প্রধানত জাতীয় বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীদের, যারা গড়ে উঠেছিল জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও চিয়াং-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়, আজও টিকে রয়েছে। এই ব্যাপারে চীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পৃথক। আমরা ইচ্ছা করেই এইসব গণতান্ত্রিক পার্টিকে থাকতে দিয়েছি এবং এদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দিয়েছি। এদের প্রতি আমাদের নীতি হল সংগ্রাম ও ঐক্য। কমিউনিস্ট পার্টি ও

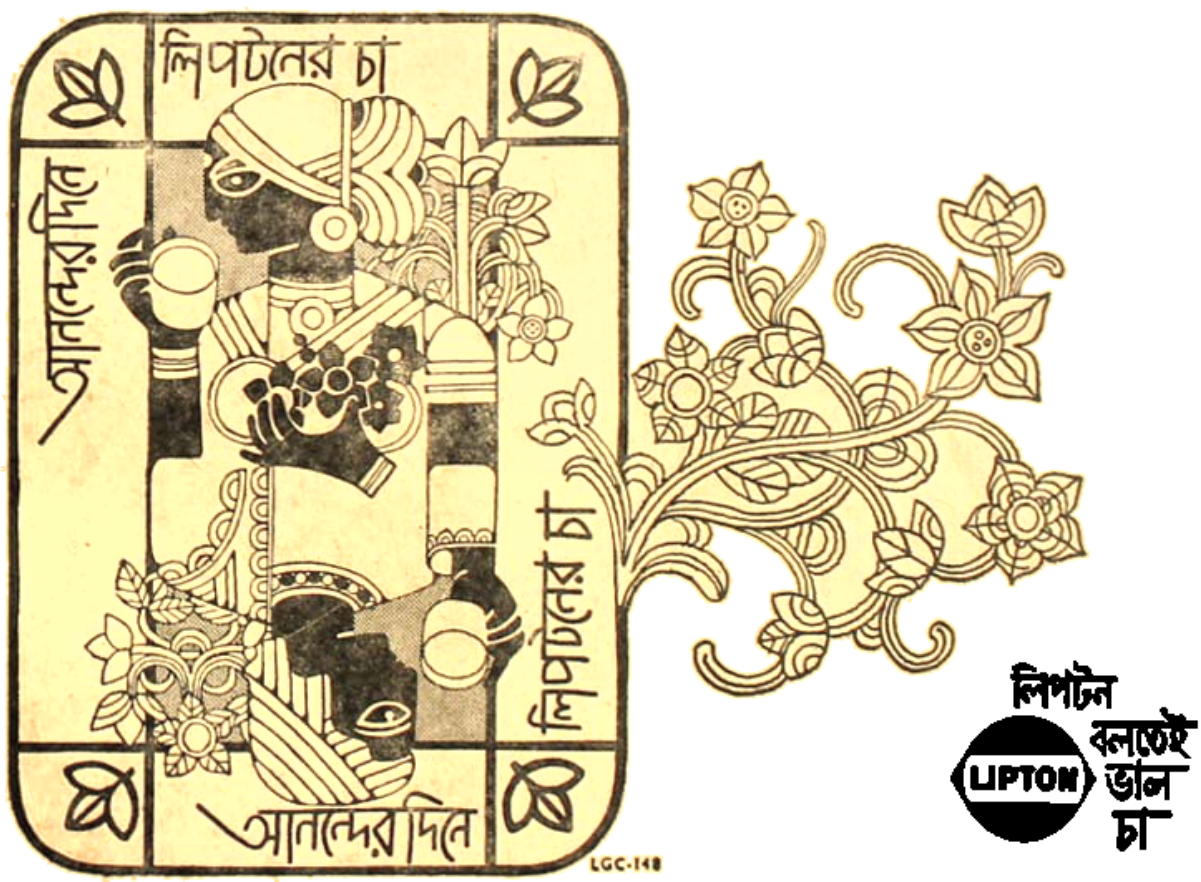

গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি উভয়েই ইতিহাসের সৃষ্টি। তাদেরই কমিউনিস্ট পার্টির একদিন অবসান হবে—গণতান্ত্রিক পার্টিদেরও তাই হবে। কিন্তু বর্তমানে আমরা প্রলেতারীয় পার্টি এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্ব ছাড়া চলতে পারি না। শুধু তাই নয়, এদের আরো শক্তিশালী করাও প্রয়োজন। তা না হলে আমরা প্রতিবিপ্লবীদের ধ্বংস করতে, সাম্রাজ্যবাদকে রোধ করতে কিংবা সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারব না। এসব সত্ত্বেও আমাদের আমলাতন্ত্র ও জটিল শাসনযন্ত্র পক্ষে তোলার বিরোধিতা করতে হবে আমি প্রস্তাব করছি যে পার্টি ও সরকারি সংগঠনকে স্ট্রীমলাইন করতে হবে এবং ছাঁটাই করতে হবে। কিন্তু পার্টি ও সরকারি সংগঠন স্ট্রীমলাইন করার অর্থ এই নয় যে গণতান্ত্রিক পার্টিগুলিকে বাতিল করে দিতে হবে। আমার অভিমত হল যে যুক্তফ্রন্টের দিকে আমাদের আরও নজর দিতে হবে যাতে গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের উন্নতি হয় এবং সমাজতন্ত্রের জন্য এদের উৎসাহকে আরও ভালভাবে কাজে লাগানো যায়।"

বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব: "প্রতিবিপ্লবীদের কি পরিবর্তন হয়? যারা কট্টর তারা পাল্টাবে না। কিন্তু আমাদের দেশের যে অবস্থা তাতে অধিকাংশ প্রতিবিপ্লবী শেষ পর্যন্ত কম-বেশি পাল্টে যাবে। সঠিক নীতি অনুসরণ করার ফলে আমাদের এখানকার অনেকেই পাল্টে গিয়ে আর বিপ্লবের বিরোধিতা করছে না, এদের কিছু ভাল কাজও করছে। ১৯৫১-৫২ সালে প্রতিবিপ্লবীদের বন্দী করা সঠিক হয়েছিল। এই সময় আমরা কিছু মৃত্যুদণ্ডও দিয়েছি। কিন্তু তারা কি ধরনের লোক ছিল? এই প্রতিবিপ্লবীদের জনসাধারণ ঘৃণা করতো। জনগণের কাছে তাদের অনেক রক্তের দেনা ছিল তখন এদের উচ্ছেদের যে অভিযান করা হয়েছিল তারই ফলে প্রতিবিপ্লবীদের প্রতি আমাদের বর্তমান সহনশীল নীতি জনসাধারণ মেনে নিয়েছে। কিছু লোক যখনই শুনলো যে স্তালিন ভুল করে কিছু লোককে হত্যা করেছেন তখনই তারা সিদ্ধান্ত করে নিল যে আমরাও ওই প্রতিবিপ্লবীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ভুল করেছি। এটা ঠিক না।"

সঠিক ও ভ্রান্ত: "যে সমস্ত লোক ভুল করেছে তাদের নিয়ে কি করা হবে, এদের সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এ সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হবে, অতীতের ভুলত্রুটি থেকে এমন শিক্ষা নাও যাতে ভবিষ্যতে সেই ভুল এড়াতে পার। রুগীকে বাঁচানোর জন্য রোগের চিকিৎসা কর এবং বিস্ময়ে এদের অংশ নিতে দাও। অতীতে যখন ওয়াং মিং-এর নেতৃত্বে কট্টরপন্থীরা ক্ষমতাসীন ছিল তখন স্তালিনের কাজের পদ্ধতির খারাপ দিকগুলির অনুকরণে আমাদের পার্টি এই প্রশ্নে ভুল করেছিল।"

চীন ও অন্যান্য দেশ: "আমাদের নীতি হল, সমস্ত দেশ ও সমস্ত জাতির কাছ থেকে তাদের অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এবং সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে যা কিছু সত্যিকার ভাল তার থেকেই শিক্ষা নেওয়া। কিন্তু অন্ধের মতো নয়—চোখ কান খোলা রেখে বিচার বিবেচনা করে শিক্ষা নেব। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার সময়েও এই একই মাপকাঠি আমাদের কিছু লোকের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। ফলে তারা এদের দুর্বলতাগুলিও অনুকরণ করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে যারা এক সময় স্তালিনকে দেবতা বানিয়েছিল তারাই আবার এক ধাক্কায় তাঁকে আবর্জনা স্তূপে ফেলেছে। আমাদের চীনেও কিছু লোক এই পথেই চলেছে। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির মতে স্তালিনের ভুলের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ, বাকি ৭০ ভাগ তাঁর সাফল্য এবং সব বিচার করে বলা যায় যে স্তালিন ছিলেন একজন মহান মার্কসবাদী। স্তালিন চীনের ব্যাপারে কিছু ভুল করেছিলেন। দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময় ওয়াং মিং-এর বাম হঠকারিতা ও জাপানের প্রতিরোধের প্রথম দিনগুলিতে তাঁর দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির সূচনা করেছিলেন স্তালিন। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্তালিন প্রথমে আমাদের বিপ্লবের পথে অগ্রসরে এই যুক্তিতে বাধা দেন, গৃহযুদ্ধ বেধে পড়লে সমগ্র চীনা জাতি ধ্বংস হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। যখন সত্যি সত্যি সেই যুদ্ধ শুরু হল তখন তিনি আমাদের কিছুটা অবিশ্বাস ও কিছুটা অবজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেন। যখন আমরা যুদ্ধে জিতলাম, স্তালিন তখন সন্দেহ করলেন যে আমাদের বিজয় হয়েছে টিটোর ধরনের এবং ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে আমাদের ওপর কঠিন চাপ দেওয়া হল। সমাজ বিজ্ঞান ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিক্ষায় আমরা আজো স্তালিনের নির্ভুল অংশগুলি গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করে যাব। যা কিছু সাধারণভাবে সত্য সেগুলি আমরা

পড়বে, তবে আমাদের নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে আমরা যা পড়ছি সেগুলি চীনের বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মার্কসের প্রতিটি লাইন অনুসরণ করার চেষ্টা করলে গভীর খাদের ধারে পড়তে হবে। মার্কসবাদ লেনিনবাদের মাধ্যমে সত্য ও চীন বিপ্লবের বাস্তব অভিজ্ঞতা এই দুইয়ের একীকরণের ভেতর দিয়ে আমাদের তত্ত্ব রচিত হয়েছে। একসময় পার্টির কিছু লোক মতাদর্শের পথে চলে ছিলেন, এদের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও মতাদর্শ আজও রয়েছে। বিদ্যমান মতাদর্শও টিকে রয়েছে। আমরা প্রধানত সমস্ত ধরনের রক্ষণশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থাগুলি, মতাদর্শ ও জীবনধারা বাতিল করে দেব ও সমালোচনা করব। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী দেশগুলির উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা এবং তাদের পরিচালন ব্যবস্থার যা কিছু বিজ্ঞানসম্মত সেগুলির শিক্ষা গ্রহণে কোন বাধাই থাকতে পারে না। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে অনেক কম লোকে অনেক সুষ্ঠুভাবে শিল্প পরিচালিত হয় এবং তারা জানে কিভাবে ব্যবসা করতে হয়। এইসব আমাদের ভাল করে শিখতে হবে—আমাদের নীতি অনুসারে আমাদের কাজকর্মে উন্নতি হতে পারে। আমরা শুধু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ই শিখব না। আমরা গুলি পরিকল্পনার থেকেও শিখব আজ থেকে দশ হাজার বছর পরেও শিখতে প্রস্তুত থাকব।"

মাও সে তুং এর এই বক্তব্য অনেক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ: ১ এই বক্তৃতায় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে যা কিছু সমালোচনা আছে তার প্রায় সবগুলিই স্তালিনকে কেন্দ্র করে; ২ চীনের পার্টির অতীতের বাম ও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি উভয়ের জন্যই স্তালিনকে দায়ী করা হয়েছে ও 'লোহনবাদ' বা 'মাও লেনিন বাদ' এইসব নামকরণ তখনও হয় নি ৪। সুদূর পাওয়ার কিম্বা সাম্রাজ্যবাদের তোপের উল্লেখ নেই ও বিপ্লবের সম্পর্কে মাও বলেছেন 'অন্তর্দৃষ্টিবাদে বিপ্লব শুরু হবে না এবং সমাজে এক দলও বিপ্লবে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে। ইহাদের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা ৬। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার শক্তিশালী করবে। আমাদের অন্তর্ভুক্ত ও এর সমস্ত শ্রেণীর সঙ্গে সমালোচনাকারে, পার্থক্য যে সুযোগ সুবিধা এবং তাকে প্রকাশের প্রয়োজন মেটানোর ভিত্তিতে সহযোগিতার আহ্বান করা হয়েছে।

চীনের বর্তমান নেতৃত্বের যখন এই সমস্ত বক্তব্যকে ভিত্তি করে পরে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় তাঁরা এই নীতিগুলি সমর্থন করেন। সম্প্রতিক কয়েকটি ঘোষণাতেও এই দাবী সমর্থিত হয়।

এরা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য সম্পর্কে আগ্রহী তাঁরা চীনের এই নতুন পরিবর্তনে আশান্বিত হবেন। 'চারদুষ্টির' সমালোচনা করে তাঁরা বলেছেন যে এই সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং এরা 'চিরাচরিত আইনের কুশলিনীতি এর সঙ্গে সমস্তভাবে যুক্ত ছিল'। এর থেকে মনে হয় যে এরা প্রায় দুইদশক—অর্থাৎ ১৯৫৭-৫৮ সালের পর থেকে—চীনে চারদুষ্টির প্রভাবে যা ঘটেছে তাতে সাম্রাজ্যবাদ ও কুশলিনীতির হাত রয়েছে বলে বর্তমান নেতৃত্ব সন্দেহ করছেন। আমরা সকলেই আশা করছি যে চীনের বর্তমান নেতৃত্ব তাদের দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও কুশলিনীতির সমস্ত শত্রুর নস্যাৎ করে দিয়ে মহাচীনকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কে আবদ্ধ করবেন এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে বিভেদ শুরু হয়েছিল তার অবসান ঘটাবেন।

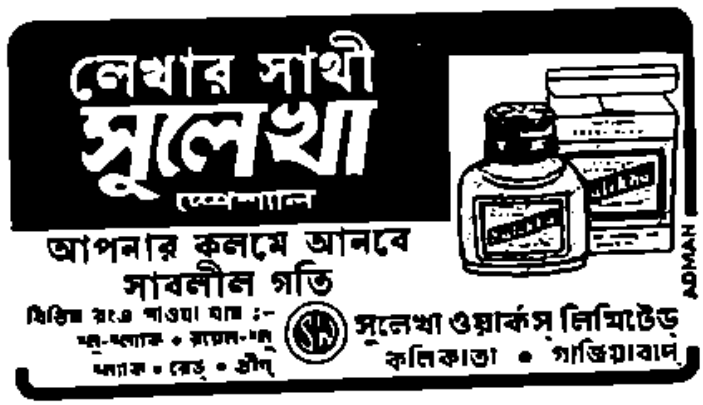

দেশের মানুষ কখন আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয়? ভোটের সময়! নির্বাচনী মরসুমে পাশের বস্তিতে না ঢুকলে চিরকাল ন্যানি আমার অজান্তে থেকে যেত।

কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সে আমাকে জানাল, 'ছাখো, ভোটের আগেই বাড়িওলা হয়তো আমাকে উইয়ে দেবে। তুমি কিছু করতে পারো? তা হলে ভোট তোমাদেরই দেব।'

দন্তহীন মুখে অস্পষ্ট উচ্চারণ, কিন্তু ভাষাটা ইংরেজী! আমার বিস্ময়ের ভাবটা লক্ষ্য করার মতো দৃষ্টিশক্তি ছিল না ন্যানির চোখে! তার আধ-সেদ্ধ আঁধার মতো মুখের উপর আধ-বোজা চোখ দুটো প্রায় ঢাকা পড়েছে কুঞ্চিত ভ্রূযুগলে।

'তুমি ইংরেজী শিখলে কোথায়?'

সে তার অদ্ভুত প্রত্যুত্তর দিল, 'বাড়িওলা তোমাদের কথা শুনতে পারে।'

বুঝলাম এই প্রৌঢ়া নেপালী কানেও ভালো শুনতে পায় না। তখন বেশ চেঁচিয়েই প্রশ্ন করলাম, 'তোমার আর কে আছে?'

'আমার? আমার আর কেউ নেই! তুমি বাড়িওয়ালাকে বলবে তো?'

'বলব' বলে এগুতেই ন্যানি ডাকল, 'একটু দাঁড়াও। আমার একটা চিঠি পড়ে দেবে?'

'এমন ইংরেজী বলতে পারো, আর চিঠি পড়তে পারো না? ও, চোখে তেমন দেখতে পাওনা, তাই?'

'যখন সেতাম, তখনো পড়তে পারতাম না।'

'আশ্চর্য!'

'আমার কাহিনী শুনলে তোমার আর আশ্চর্য ঠেকবে না।'

অতঃপর সংক্ষেপে এবং বিশ্লিষ্ট-ভাবে সে যা বলল তাতে বোঝা গেল, অল্প বয়সেই তার সৈনিক স্বামী মারা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, তারপর থেকেই সে আয়ার কাজ করেছে দেশে-বিদেশে। বিদেশেই কেটেছে বেশিদিন। ইংরেজ, ফরাসী, পর্তু-গীজ, স্প্যানিস, আমেরিকান নানা মুনিবকেই সেবা করেছে সে। এক জায়গায় কাজ ফুরুলেই চলান হয়ে গেছে মুনিবের চেনাশোনা অন্য কারো কাছে। হাত বদল হতে হতে এই নিরক্ষর গোর্খা রমণীর ভাষান্তরও বেশ আয়ত্ত হয়ে গেছে। ন্যানি তার কাহিনী শেষ করল এইভাবে, 'এখন পরের ভাষাই আমার নিজের ভাষা।'

তার শেষের কথাটায় কেমন চমকে উঠে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে লাগলাম, শুধু কি পরের ভাষাটাই এদের নিজের ভাষা? এদের স্বামীরা সৈন্য হয়ে পরের মুলুকে নিজের মুলুক ভেবে প্রাণ দেয়, এদের ভাবেরা দারোয়ান হয়ে পরের ধনকে নিজের ধনের মতো পাহারা দেয়, আর এরা নিজেরা আয়া হয়ে পরের সন্তানকে নিজের সন্তান জ্ঞানে পালন করে। যাদের জন্য এমন হয়, সেই শক্তির বিরুদ্ধে আমার মনে তখন উত্তাপ সঞ্চয়ের কিকিং কারণও ঘটেছিল। প্রায়ই দেখতাম আমাদের পূর্বতন শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা ভাড়াটে গোর্খা সৈন্য লাগিয়ে আফ্রিকার তথাকথিত 'মাউ-মাউ'দের নির্বিচারে হত্যা করছে, আর আমাদের দেশেই কোথায় যেন তারা রিক্রুটিং সেন্টার বানিয়ে গোর্খা সংগ্রহ করে মালয়ে পাঠাচ্ছে বিদ্রোহ দমনের জন্য। কসাকদেরও বুঝি উপনিবেশবাদীদের হাতে এমন ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করতে হয় নি। গোর্খাদের মাথার খুলি এবং হাড়ের উপরই বোধ হয় একদা গড়ে উঠেছিল এক শ্বেতাঙ্গ আভিজাত

বিক্ষুব্ধ সান্ত্বনা। আর তাদের নারীদের শুধু কি আহা হিসাবেই সেবা করতে হয়েছিল, আর কিছু বিসর্জন দিতে হয় নি?

যাক, শানি ঘর থেকে তার চিঠি-খানা এনে আমার হাতে দিল। উল্টোপাল্টে দেখলাম, পুরনো চিঠি, বছর খানেক আগে হংকং থেকে প্রেরিত। শুনে শানি চিঠিখানা ফেরত নিয়ে বলল, 'কিন্তু আমার যে চিঠি তো মাত্র তিনদিন আগে এসেছে। তুমি একটু দাঁড়াবে, আমি খুঁজে দেখব?'

আমি সম্মত হলাম অনেক খোঁজাখুঁজি করে যা সে এনে আমার হাতে দিল, তারও বয়স ছ'মাসের কম নয় এবং কানাডেরা থেকে প্রেরিত।

ক্ষুব্ধ শানি বলল, 'কিন্তু আমার এ-চিঠি তো এসেছে বাল্টিমোর থেকে।'

সঠিক পত্রের সন্ধানে আমি বিনা ভণিতায় তার ঘরে ঢুকলাম তার পিছু পিছু এবং ঢুকেই উপলব্ধি করলাম শানি এতক্ষণ নিতান্ত হাতের আন্দাজেই খুঁজছিল তার চিঠি। এ-ঘরে আলো প্রবেশের পথ নেই। মনে হল চতুর্দিকে ঘরের বেড়ায় কালো কালো চামচিকে ঝুলছে। এদের উপযুক্ত বাসস্থান বটে। কিন্তু একটাও উড়ছে না, নড়ছে না কেন! আমার প্রতি এই ইতর প্রাণীদের এতখানি তাচ্ছিল্য আমার ভালো লাগল না। আমাকেও কি ওরা ওদের শানির সগোত্র ঠাওরেছে? একটু আলো দেখাতে পারলেই বাছাধনদের ফুড়ুত ফুড়ুত করে উড়ে পালাতে বাধ্য করা যাবে। বৈদ্যুতিক বাতি-এখানে কেউ আশা করে না, কিন্তু একটা লণ্ঠন? নিদেনপক্ষে একটা কুপি? শানির এগিয়ে যাওয়া দেশলাইয়ের ছোলে দেখা গেল একটা কুপি আছে বটে, কিন্তু তেলশূন্য হয়ে সলতেগুলো অগ্নিসংযোগের অপেক্ষা করছে। তাতা মোমবাতির টুকরো চোখে পড়ল। তার একটা ছোলে আমি সদর্পে চামচিকে প্রভুদের দিকে অগ্রসর হলাম। কিন্তু শয়তানগুলো তখনো দেয়াল আঁকড়ে পড়ে রইল চুপচাপ। মোমবাতি আলোয় কি ওরা তোতাকা করে না? আমি একটার গা ঘেঁষে মোমবাতি উঁচিয়ে ধরলাম। এ তো চামচিকে নয়—সাহেবের বাচ্চা! ফুটফুটে শিশুর ফটো। শানি আমার কাণ্ড লক্ষ্য করছিল, সে সাহেবে বলে উঠল, 'ও আমার এক ছেলের ছবি।'

মমতা যে একটু হল না তা নয়, কিন্তু করুণামিশ্রিত একটা রাগও দানা বাঁধছিল মনে। কিন্তু তা সরাসরি প্রকাশ পেলে রূঢ় শোনাবে ভেবে আমি ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'তোমার ছেলেমেয়েদের অন্ধকারে টাঙিয়ে রেখেছ কেন?'

সে বেশ ব্যথিত সুরে জবাব দিল, 'আগে তো এই ঘর এমন অন্ধকার ছিল না, দেখনা জানালাটা পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে বাড়িওলা তার নতুন বাড়ির দেয়াল তুলছে। ভগবান এর বিচার করবে না?'

আমি কোনো জবাব দিলাম না। শানি আমার কথার ইঙ্গিত ধরতে পারে নি। যারা তার জীবনী শক্তির সবটুকু শুষে নিয়ে এই প্রৌঢ় বয়সে তাকে ঠেলে দিয়েছে বস্তির অন্ধকারে, তাদের বিরুদ্ধে এর ক্ষোভ নেই। তাদের আদরের দুলাল-দুলালীদের ফটো টাঙিয়ে রাখার প্রবৃত্তি যে কী

With
Best
Compliment
from

G. M. C.
Brothers
& Co.

2, Meredith Street,
Calcutta-700072

মর্মান্তিক নাটকীয় ট্রাজেডি তা এর মাতৃহৃদয় কিছুতেই বুঝবে না। বুঝলে ট্র্যাজেডি কখন প্রহসনে পরিণত হতো।

সেদিন আর চিঠিখানার সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু খুঁজতে গিয়ে স্তূপীকৃত কাগজপত্রের মধ্যে দেখলাম আরো কয়েকটি শিশু এবং কিশোর-কিশোরীর ফটো। সে-গুলিকে ফ্রেমে বাঁধানোর মতো সঙ্গতি হয়তো অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছিল শানি।

আমি শুধু ভাবি, অন্ত যে-কটি আমাকে দেখেছি তারা তো কেউ শানির মতো নয়। অবশ্য তারা কেউ-ই শানির মতো অবস্থার সম্মুখীন হয় নি। কিন্তু শানির মতো যাদের আত্মীয়-পরিজনহীন বিদেশ ভূমিতে সমস্ত চেনাশোনা মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু কয়েক শিশুর সান্নিধ্য সম্বল করে বেঁচে থাকতে হয়, তাদের ঘুমন্ত বাৎসল্যরস বুঝি এমনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উচ্ছ্বসিত হতে থাকে।

পরদিন শানি হাসিমুখে পত্র হাতে এসে হাজির হল আমার ডেরায়। আমি চিঠিখানায় চোখ বুলানোর আগেই সে প্রশ্ন করলো, 'লোকেরা বলছে এই চিঠিতে টাকা পয়সার কোনো কথা নেই, তা কি সত্যি? ভালো করে পড়ে দেখো তো।'

তার কথা শুনে আমি না পড়েই তার হাতে চিঠিখানা ফেরত দিতে যাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, এ তাহলে এই পত্র পড়িয়েছে আরো বহুলোককে দিয়ে এবং তাদের মতোই আমাকে দিয়ে পড়িয়েও এর সন্দেহ ভঞ্জন হবে না। কিন্তু আমি নিরস্ত হলাম। আহা, প্রৌঢ়া এই প্রথম আমার বাড়িতে এসেছে সামান্যতম সাহায্যের জন্য। পরে বুঝেছি এইরকম চিঠি তার কাছে বেশি আসে না, বছরে হয়তো দু'চারখানা, এবং সে কটাই তার সম্বৎসরের মূলধন। নানা লোককে ধরে ঐসব চিঠি বারেবারে পড়িয়েও তার আশ মেটে না, এই নিয়েই সে মশগুল হয়ে থাকে, ফেলে আসা সন্তানদের স্মৃতি এইভাবেই ও রোমন্থন করে, ওর জীবনের একমাত্র আনন্দ এই রত্নহার পত্রগুচ্ছ নিয়ে নিয়ত নাড়াচাড়া করা। হোক, চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়ে বুঝলাম, ওর শালিতপুত্র ওর মারফত একজন নতুন কর্মচারী আনা চাইছে তার সদ্যোজাত নাতির জন্য সে নতুন আয়ার যাতায়াতের খরচ এবং অন্যান্য সর্তাদির কথা সবিস্তারেই লিখেছে।

বয়ান শুনে শানি বলল, আমি লোক জোগাড়ের চেষ্টা করব নিশ্চয়ই, কিন্তু কী অবিচার ভালো, এদের দরকার হলে আমাকে মনে পড়ে, কিন্তু আমি কী খাই, কী পরি, কী করে থাকি তার খোঁজ নেয় একবারও? এরা সব্বাই নেমকহারাম, বুঝলে?

'তবু তো বেয়ানে ওদের ছবিই টাঙিয়ে রেখেছ।'

'এবার সব ফেলে দেবো দূর করে। তুমি দেখে নিয়ো।'

'আমি কিছু দেখতে চাইনে।'

শানি কাতর হয়ে বলল, 'তোমার তো কিছু আসে যায় না। তোমাকে তো আর আমার মতো কষ্ট করে এদেরকে মানুষ করতে হয় নি। কিন্তু দুনিয়ায় সবাই যে বেইমানী করবে তা কী করে আমি জানব বলো? আমার কিছুতেই এখন কিছু আসে যায় না। শুধু এই পোড়া পেটটা যে কথা শোনে না।'

আমি তার মনটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বললাম, 'সকালে তোমাকে দেখলাম গড্‌স অ্যাসেম্বলি চার্চের গাড়িতে। বস্তির বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে তোমরা?'

আমার অনুমানমাফিক মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল শানির মুখের ভাব। সে এক গাল হেসে বলল, "তুমি জানো না ওরা প্রত্যেক রবিবার সকালে বস্তির বাচ্চাদের গাড়িতে তুলে 'জয় রাইড' করিয়ে আনে।"

'আর তোমাকেও শিশুজ্ঞানে গাড়িতে তুলে নেয়।'

'আরে শোনো, বাচ্চারা ওদের শানিকে বাদ দিয়ে গাড়িতে উঠবেই না! এমন কি ওদের দুধ খেতে দিলেও আমাকে বাদ দিয়ে খাবে না।'

'শিশুদের সঙ্গে থেকে থেকে তুমিও শিশু হয়ে গেছ। ওরাও তোমাকে শিশুজ্ঞান করে।'

শানির হাসি আর থামতে চায় না। আমি প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, ঐ বস্তিটার উপর খ্রীস্টান মিশনারী-দের এত নেকনজর কেন?'

'ওখানে যে অনেক খ্রীস্টান থাকে গো।'

'রোজ বিকালে দেখি গাড়িওয়ালা এক সাহেব খিচুড়ির ভ্যান নিয়ে আসে। তোমাকে দেয়?'

'নইলে খাই কী? ওরা আমাকে ওষুধপত্রও দেয়, শরীর খারাপ দেখলে হাসপাতালে পর্যন্ত নিয়ে যায়। আরে, সিস্টাররাই তো আমার চিঠি-পত্রের জবাব লিখে দেয়, আর ওদের ঠিকানাতেই তো আমার চিঠি আসে।'

তা হলে দেখছি যোগাযোগটা

THE INRUPEXCO

ভালোভাবে না জানলে লেখা যায় ?'

'আচ্ছা কোলকাতাতেও তো কত নেপালী থাকে না, তাদের সঙ্গে একবার আলাপ করেই দেখুন না।'

বুঝলাম ন্যানি তাঁকে স্পর্শ করেছে। বয়সটা তাঁর অভিজ্ঞতার ভারে তখনো নুয়ে পড়েনি, হাতেও বোধ হয় তখন তেমন কাজকর্ম ছিল না, অথচ মনে ছিল সব বিষয়ে অফুরন্ত উৎসাহ. কিন্তু সেটা প্রকাশের পথ পাচ্ছিল না। অতএব তিনি আমাকে নিয়ে নেপালীমহলে ঘুরতে বদ্ধপরিকর।

প্রথমেই যাওয়া হল কোলকাতার এক ফ্যাশনদুরস্ত বাজারের নেপালী দারোয়ানদের কোয়ার্টারে। এরা এমন সসম্ভ্রমে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল যে, আমার সব আশা উবে গেল! এদের সঙ্গে স্বাভাবিক কথাবার্তা মেলামেশা সম্ভব বলে মনে হল না। আসলে আমাদের আগমন বার্তা এরা আগেই পেয়ে গিয়েছিল। দেখলাম প্রত্যেক পরিবারের জন্য সংকীর্ণ একখানি ঘরের সঙ্গে সরু একফালি করে বারান্দা, কিন্তু সব ঘরের সব কিছুই স্টেজ ডেকোরেশনের মতো নিখুঁতভাবে সাজানো। আমাদের জন্য বাজারের সেরা চায়ের কাপ যোগাড় করে রেখেছে এরা। চা পানের পরও স্বাভাবিক আলাপ-আলোচনা শুরু হতে পারল না। এরা সারাক্ষণ সন্ত্রস্ত এবং আড়ষ্ট হয়ে রইল। পুষ্পলালের সঙ্গে এদের কথাবার্তার ধরন দেখে মনে হল, যে-সামন্তশাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তিনিও তার কোনো একটা বংশের কুলতিলক। তাই তাঁকে যথাযোগ্য দূরত্ব থেকে সম্মান নিবেদন করা হচ্ছে। এদের কী দোষ। পুষ্পলালও এ-ক্ষেত্রে নিরুপায়।

এই অভিজ্ঞতার পর পুষ্পলাল আর আমাকে টানাটানি করেন নি। তবে সেদিন তাঁর মুখে ঘন ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল এবং তা কাটানোর জন্য আমি বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, 'দেখুন, নেপালী লেখকের পক্ষেও হয়ত ন্যানিকে নিয়ে লেখা দুঃসাধ্য হতো। কেননা ন্যানি পৃথিবীর বহু দেশে পাড়ি জমিয়েছে, তার সঙ্গে ক'জন লেখক তাল রাখতে পারত। ক'জনের এত দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আছে? না থাকলে কী দিয়ে তিনি এ-কাহিনীতে বাস্তবের রং লাগাবেন? যাকে বলে 'লোকাল কালার' তার পোঁচ না দিলে প্রতিমার মুখ খুলবে কেন।'

পুষ্পলাল খুশি হয়ে বললেন, 'আধুনিক জীবনের গতিবেগের জন্যই এই রকম হচ্ছে, না? আমি যে জানীতে থাকি আগে সেই পর্যন্ত গেলেই আপনাদের বাঙালী লেখকদের হয়ত চলত, কেননা এককালে আপনাদের গল্পে বিধবারা বড়জোর কাশীবাসিনী হতেন, তাই না?'

"ঠিক তাই। এই দেখুন না, সেদিন চায়ের দোকানে আমাদের বস্তির এক পরিচিত জাহাজীকে ছাগলের বাচ্চা কোলে করে ঢুকতে দেখে অবাক হয়েছিলাম এবং তা লক্ষ্য করে জাহাজী কী বলল জানেন? 'দেশী ছাগলের বাচ্চা হলে আমি কোলে করি? এ বাচ্চা এনেছি অস্ট্রেলিয়া থেকে—আমার এক জাহাজী বন্ধুর উপহার।" এই জাহাজীদের কারো গায়ে দেখবেন আমস্টার্ডামের পেঞ্জী, হাতে বস্টনের ঘড়ি, পায়ে সিঙ্গাপুরের জুতো, বুকে—'

'বুঝেছি। কিন্তু একটু কল্পনার আশ্রয় নিতে দোষ কী? অবশ্য গায়ে বাস্তবের মাটি না পেলে কল্পনাই বা উড্ডীন হবে কী করে। তাহলেই দেখুন, আমাদের মতো জনমেজয়ও আপনাদের মতো লেখকদের বেশি সাহায্য করতে পারে না।' এই বলে পুষ্পলাল প্রসন্ন হাসি হাসলেন। আমি নিশ্চিন্ত হলাম। পুষ্পলাল স্বগতোক্তির মতো বললেন, 'আমরা বোধ হয় বাস্তবতার সন্ধানে রোমান্টিকতার পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিলাম!'

তিন

এযুগে কলম যা পারে না, ক্যামেরা তা পারে?

নানা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পরিচালকদের আনাগোনার খবর পড়ে মনে হতো, একটা উপায় হয়ত আছে। কোনো একজন পরিচালককে বলতে হচ্ছে হয় আপনি যখন বিদেশে যাবেন, তখন কাউকে জোগাড় করে নিয়ে যাবেন ন্যানির ভূমিকা-অভিনয়ের জন্য, আর যে-দেশে যাবেন সেখান থেকে তো অনায়াসে জোগাড় করে নিতে পারবেন একটি শিশুকে। যেমন ধরুন, অস্ট্রেলিয়া গেলেন, যার রাজধানীর একশ কুড়ি কিলোমিটারের মধ্যেই রয়েছে সেই ইউরেনিয়াম খনি যা নিয়ে এত হৈ চৈ হচ্ছে। আপনার ক্যামেরা সেই খনি এবং তার পাশে আস্তার সঙ্গে ক্রীড়ারত একটি অস্ট্রেলীয় শিশুর উপর দিয়ে অনায়াসে ঘুরে যেতে পারে। কিম্বা ইউরোপীয় কোনো চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়ে আপনি চলে গেলেন সেই রাইন নদীর তীরে

যার জন্য শিল্প জগতে বিখ্যাত হতে আছের জন্য বিতে ভুলে গেছে। সেখানে নাৎসির সঙ্গে জার্মান বা ফরাসী শিশুর গল্পটা কীভাবে জমাবেন তা আপনিই জানেন এই সুযোগে সরনারী শিশু হত্যার নীরবসাক্ষী হিটলারের বন্দীশিবিরগুলির ভিতর দিয়ে ঘুরিয়ে আনতে পারেন আপনার ক্যামেরা। কত বলব? হাওয়ার মতো আপনার অবাধ গতি—যে হাওয়ার কোনো পাসপোর্ট লাগে না। প্রতিনিয়ত আপনি 'লোকাল কালার' দিয়ে গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিপন্ন করতে পারেন। কেউ বলতে পারবে না আপনি শিল্পের সীমানা লঙ্ঘন করছেন। অথচ কী বিরাট আইডিয়া আপনি তুলে ধরেছেন। একদিকে যুদ্ধবাজের দল, যাদের অনেকে নাৎসির হাতে লালিত-পালিত, অন্যদিকে বিশ্বজোড়া প্রগতিশক্তির নানা অভিব্যক্তি, যেখানে শতাব্দীর এক পুরুষীনা নেপালী মায়া যার ভাই সবই দুর্ঘটনা এবং যার একমাত্র প্রার্থনা তার পালিত সন্তানরা সুখে থাক, অথচ যাদের চরম পতন ছাড়া বিশ্ব মানবের মুক্তি নেই। সঙ্গত কারণেই এই চিত্রের নাম দিতে হবে 'বিশ্বমাতৃ'।

রচনাশৈলী কী হবে তা আপনিই জানেন। তবে মূল কাঠামো বজায় রেখে আপনি কল্পনা শক্তির অবাধ প্রসার ঘটাতে পারেন।

আর দেখুন, আজকাল শিল্পে সমকালীনতা, আধুনিকতা ইত্যাদির সন্ধানে খুবই প্রখর। আপনার 'বিশ্ব-মাতা'র চেয়ে সমকালীন চিত্র কী হতে পারে? যেমন ধরুন বিরক্তী-করণের মতো সমকালীন সমস্যা, সেটা তো আপনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবেই জড়িত।

আপনার ছবি সব দেখেই সমাদৃত হবে। কেননা এর ভাব এবং রূপকল্প এত বিশ্বজনীন যে, এ কোনো ভাষাগত ব্যবধানের সম্মুখীন হবে না।

চুপি চুপি একটা কথা বলি। ক্যামির মতো লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে কম নেই। তারা বুকমিত্র ডেপ করতে জানে না, তারা পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কেও একেবারে অচেতন। এ ছবি তাদের মতো লোকেরও চোখ খুলে দিতে পারে। অতএব চিত্র পরিচালক মশায়,

ভাল ছাপা

বই, ম্যাগাজিন আর জব কাজের জন্য

কালান্তর প্রেস

৩০।৬ ঝাউতলা রোড (পার্ক সার্কাস)

কলকাতা-৭০০০১৭

ফোন ঃ ৪৪-৯০১৬

বিনাদ্বিধায় এগিয়ে আসুন! আর এইভাবে আমি উদ্বেগ পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

॥ চার ॥

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে।

বিমান বন্দর আমাকে চিরকাল আকর্ষণ করে। যাত্রীদের আনাগোনার মধ্যে যেন বিশ্বের স্পর্শ পাই। কিন্তু সেদিন আমার এক বন্ধুকে বিদায় দিয়ে ফেরার সময় কেন জানি মনটা অন্তর্মুখী হয়ে ছিল। তাই যাত্রী সাধারণের দিকে আমার চোখ ছিল না।

বাবু!

ডাক শুনে আমি চমকে উঠলাম। কতদিনের পুরানো কণ্ঠস্বর! আমি ভূত দেখার মতো দেখলাম স্থানিকে। তার কোলে মোমের মতো নিষ্প্রভ এক শিশু।

প্রায় পঁচিশ বছর পর স্থানিকে দেখছি। অথচ তার চেহারার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি। বরং চোখটা যেন আগের চেয়েও উজ্জ্বল, মুখটাও আগের চেয়ে প্রসন্ন। প্রথম মহাযুদ্ধে যার স্বামী মারা গেছে তার

স্কেচ : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বয়স অন্তত আশির কাছাকাছি। কিন্তু বয়সটা কি পিছিয়ে যাচ্ছে। হয়ত এই ম্যাজিকের কারণ—স্থানির কোলে তখন শিশু ছিল না। তাই কি? যাই হোক, এই বৃদ্ধা আমাদের সকলকে না খেয়ে মরবে না দেখছি।

স্থানি আমার মনের কথা কেড়ে নিয়েই যেন একগাল হেসে বলল, ভাবছ বুড়িটা এখনো কেন মরেনি? আমাদের প্রাণ বড় শক্ত গো! আমার চোখের ছানি কাটার পর তোমাকে আরো স্পষ্ট দেখছি জানো?

'ও তাই! তুমি তোমার পুরানো সাজই ধরেছ দেখছি।'

'ধ্যেৎ না! ছবি নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে? ফটোগুলো যেন আমার প্রাণকে আরো নিঃশেষহারা করে দিত

এই বলে স্থানি শিশুটিকে বুকের কাছে আরো চেপে ধরল। আমি প্রশ্ন করলাম, 'এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?'

'আমি কি বাবু এক জায়গায় ছিলাম?'

সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে এক ভদ্রলোক বলে উঠল, 'এক জায়গায় থাকলে আমাদের একটু উপকার করতে।' তাকিয়ে দেখি একদ্বারা চেহারার এক শিখ যুবক এবং তার পাশে বোধ করি তারই সহধর্মিণী। যুবকটি কথার জের টেনে বলল, 'এই দেখুন না, আমরা স্থানিকে বলেছিলাম তুমি আমাদের ফ্ল্যাটে আরামে থাক, আমরা দীওরা থেকে ঘুরে আসি। বুঝতে পারছেন না আমার কথা? আমরা ন্যু ইয়র্কে থাকি, আমি শাটল ককের মতো ভারত-আমেরিকা করছি। এবার আবার স্ত্রী আসছিলেন বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে, অমনি স্থানি বায়না ধরল সেও যাবে, নইলে বেবীকে কে দেখবে? শুনুন একবার কথা। নেহাৎ আমার কোম্পানিটি খুবই ভালো, তাই কোনো অসুবিধে হল না।'

'সেটা নিশ্চয়ই বিরাট কোম্পানি?' আমি বাজিয়ে দেখলাম।

'বিরাট? ও বললে কিছুই বলা হয় না। ওদের কাছে টেকনিক্যাল নো হাউ জানতে অনেককেই নতজানু হতে হয়। সেই কাজেই তো আমি এ দেশে আসি আর যাই।'

'নতজানুর সঙ্গে আকাশ চোঁয়া মুনাফা এবং ব্ল্যাক মেইল শব্দ দুটো উচ্চারণ করলে পারতেন।'

'আই অ্যাম ভেরী ভেরী সরি। আমি ওটা মীন করি নি। আমি তো চাকরমাত্র। টেকনিক্যাল নিউরতার সুযোগ নিয়ে ওরা ব্ল্যাক-মেইল করে, তা আমার মতো একজন টেকনিসিয়ান নিশ্চয়ই জানে। তবে আমাদের মতো চুনো পুঁটিদের প্রতি ওরা উদার হস্ত স্বীকার করতেই হবে।'

'কেননা আপনারা ওদের নুন খেয়ে গুণের পরিচয় দেন।'

'সেও আর বেশিদিন নয়, বুঝলেন! ভারত টেকনলজিতে কি কম এগুচ্ছে? ভারত যখন অ্যাটম বোমা বানাতে পেরেছে তখন—'

'এ খবর আপনি কোথায় পেলেন?'

'তথাকথিত শান্তির জন্য বিস্ফোরণ ঘটানো, আর অ্যাটম বোমা তৈরি করা—এ দু'য়ের মধ্যে কী পার্থক্য আছে? থাকলে কতটা? আমি টেকনিক্যাল ম্যান, আমি জানি।'

'আমার তো মনে হয় যথেষ্ট পার্থক্য আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে অন্য পক্ষ প্রায় বিস্ফোরণের মতো গলা ফাটিয়ে

বলল, 'আমি বলছি, কিন্তু পার্থক্য নেই।'

আমি আড় চোখে স্যানির দিকে তাকালাম। লক্ষ্য করেছিলাম সে আমাদের কথাবার্তা কান পেতে শুনছিল। এখন যদি সে বহু বছর আগেকার পূর্বকথা স্মরণ করে—হঠাৎ বলে বসে, 'কী বাবু! আমি কি শুধু তাদের ছেলেদেরই পালন করি যারা মানুষকে বোমা মেরে ধ্বংস করতে চায়? তোমরা যদি অ্যাটম বোমা বানাও তাহলে কি তোমাদের ছেলের এই শিশুর বাচ্চাকে কোল থেকে নামিয়ে দেব?'

তরলা এই স্যানির মাথায় এত বুদ্ধি খেলে না। সে তাই এত বড় সুযোগ হেলায় হারাল।

লাউড স্পীকারে একটা ঘোষণা শুনে শিখ দম্পতি প্রায় একযোগে হাত জোড় করে নমস্কার জানাল। কিন্তু স্যানির হাত দুটো ফাঁকা নেই, সে সারা মুখে শুভ্র কাশ ফুলের হাসি ফুটিয়ে বলল, 'বাবু, আবার দেখা হবে!'

কিন্তু আর শিখ দুনিয়টি আমাকে সতর্ক করে দিল—'ওর কথায় কক্ষণো বিশ্বাস করবেন না যেন! ভালো অফার পেলে ও হয়ত অন্য কোনো বেবীর পিছন পিছন গিয়ে হাজির হবে ম্যানিলায় বা মাদাগাস্কারে।'

'এই যেমন কেউ কেউ ভালো অফার পেয়ে ন্যাশনাল ছেড়ে দিয়ে মাল্টিন্যাশনালে গিয়ে ঢোকে, তাই না?'

আমি কথাটাকে যথাসম্ভব মোলায়েম করে বলতে চেয়েছিলাম এবং সেজন্য মুখে হাসি ফুটিয়ে গলার স্বর অতি নরম করতে সচেষ্ট হয়েছিলাম। তবু ওনা পক্ষের মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল এবং দু' কাঁধে একটু উৎকোচ কাঁকুনি দিয়ে সে বলল, 'তা হতে পারে।'

এরা চলে গেল।

আমি এদের বিদায় জানাতে আসি নি। আমার এখন বিপরীতমুখী হওয়ার কথা। কিন্তু আমি এদের অপসৃয়মান মূর্তিগুলির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম নিশ্চল হয়ে। এবং শেষে কখন ধীর পদক্ষেপে গিয়ে হাজির হলাম সেই বেড়ার ধারে যেখানে খানিক আগে বন্ধুকে বিদায় দিয়েছিলাম।

মাঠের মধ্যে নেমে শিখ দম্পতি একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। কিন্তু ন্যানি? সে ঠিক জানত আমি এসে এইভাবে দাঁড়াব? না জানলে পিছন ফিরে তাকাবে কেন? সে রুমালের অভাবে বেবীর ঠোঁয়ালেখানা নাড়ছে ঘন ঘন, আর অন্যহাতে শিশুটিকে চেপে ধরে আছে কাঁধের উপর। ন্যানির হাত দেখে শিখ ও শিখিনী একবার পিছন ফিরে তাকাল। তারপর শিখিনী বোধহয় ন্যানিকে একটু মুক্ত করে দেওয়ার জন্যই হাত বাড়িয়ে সন্তানকে কোলে নিতে গেল। আমি স্পষ্ট দেখলাম, ন্যানি তাতে সম্মত না হয়ে একটু দূরে সরে গেল। এবং দ্বিগুণ উৎসাহে আমার উদ্দেশে ঠোঁয়ালেখানা নেড়ে যেতে লাগল। আমিও সমানে আমার রুমাল নেড়ে যাচ্ছি। আশপাশের লোকেরা নিশ্চয়ই ভাবছে আমার কোনো পরমাত্মীয় বিদেশে পাড়ি দিতে যাচ্ছে।

আমি শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম যতক্ষণ না অতবড় বিমানখানা দূর আকাশে নিরর্থক অক্ষবিন্দুর মতই ক্ষুদ্র হয়ে মিলিয়ে গেল।

BEST WISHES FROM

SUBIR MAZUMDER

রাজনৈতিক শক্তিসাম্যের পুনর্বিন্যাসের বর্তমান স্তরে মতাদর্শগত সংগ্রামের ভূমিকা

সুনীল মুখার্জি

"আমরা ভয় পাব না, কারণ আমরা আমাদের দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করতে ভয় পাই না। আমরা আমাদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে শিখব।" —লেনিন।

ভারতের ৬ষ্ঠ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের ২০ বছরের একচেটিয়া শাসনের অবসান ও জনতা পার্টি নামে অধিকতর দক্ষিণ ঘেঁষা বুর্জোয়া-শ্রেণীর একটি নতুন জোটের (এই মুহূর্তে এটাকে একটি পার্টি বলা ঠিক হবে কি না সেটা তর্ক সাপেক্ষ) অভ্যুদয় ও ক্ষমতালাভ ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে রঙ বদলের এক নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি করেছে। মানচিত্রের এই রঙ বদলের সন্ধিক্ষণে ভারতের বিপ্লবীশ্রেণী ও জোটগুলি কি অবস্থান গ্রহণ করবে তার উপর নির্ভর করছে ভারতের জাতীয় জীবনে এই নতুনতর শক্তিবিন্যাস সমাজতন্ত্রের সপক্ষে যাবে না বিরুদ্ধে যাবে।

১

স্বাধীনতালাভের পর ঐতিহাসিক কারণেই ভারতের শাসন ক্ষমতা বুর্জোয়াশ্রেণীর করায়ত্ত হয়। বুর্জোয়াশ্রেণীর সর্বাপেক্ষা সুসংহত এবং প্রধানত দেশপ্রেমিক অংশের দ্বারা পরিচালিত কংগ্রেস পার্টি গত ৩০ বছর ধরে ক্ষমতাসীন থেকে সাম্রাজ্যবাদের বন্ধনমুক্ত একটি স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ও আত্মনির্ভরশীল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। বুর্জোয়া-শ্রেণীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী পুঁজিবাদী পথেই তারা এই কাজ পরিচালনা করেছে। এই পথে চলতে গিয়ে তারা সকলের গ্রহণযোগ্য কতকগুলি জাতীয় নীতি বিকশিত করে তুলেছে, যেমন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জোটনিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি, আধা পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, ভারি ও মূল শিল্পগুলির উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব, ব্যাঙ্ক ও বিমানের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, মোটামুটি সাধের স্বার্থ-বিরোধী ভূমি ব্যবস্থা গঠন প্রভৃতি নীতিগুলি এর উদাহরণ।

মূলত বিকাশমান পুঁজিবাদী সম্পর্কের চৌহদ্দির মধ্যেই তারা এ কাজগুলি সম্পন্ন করেছে। কিন্তু পুঁজিবাদ একটি স্থানীয় বা জাতীয় ব্যাপার নয়। পুঁজিবাদ একটি বিশ্ব ব্যবস্থা এবং বিশ্বজোড়া বাজার-ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদের অধীনস্থ দেশগুলির আর্থিক কাঠামো পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন। এই পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা বর্তমান যুগে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদী স্বার্থের কবলিত এবং রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পদ্ধতির দ্বারাই এর গতি প্রকৃতি নির্ধারিত হয়।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়া ও নবগঠিত অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংহতির মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে পুঁজিবাদী সম্পর্ক নিশ্চিহ্ন হওয়ায় বর্তমান যুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের সুফলগুলি জনগণের সামগ্রিক কল্যাণে বিশেষ করে আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মান উন্নয়নে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা যতই শক্তিশালী হয়ে উঠছে বিশ্বের উন্নতিশীল দেশগুলির সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সম্পর্ক ততই সম্প্রসারিত হচ্ছে। এইভাবে উন্নতিশীল দেশগুলির স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার মৈত্রীবন্ধন জোরদার হচ্ছে। অপরদিকে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বেকারী, মুদ্রাস্ফীতি ও অন্যান্য দুর্গতি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের সুফলগুলি জনজীবনে প্রতিফলিত না হওয়ায় এই সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এইভাবে বিশ্ব সমাজতন্ত্রের নিরন্তর সাফল্য, উন্নত পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ক্রম-

বর্ধমান তীব্রতা ও তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির স্বাধীনতা ও আর্থিক মুক্তির আন্দোলন—বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার এই ত্রি-ধারার বিকাশ বিশ্ব পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছে।

বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়া যত দ্রুত বিকশিত হচ্ছে বিশ্ব পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট ততই গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের গভীরতর হওয়ার এই পট-ভূমিতে সমাজতন্ত্রের উপযোগিতা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী তিন দশকের মধ্যে ঠিক বর্তমান মুহূর্তেই পুঁজিবাদ সবচেয়ে সংকটজনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। মুনাফা, শোষণ ও অত্যাচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী সমাজের উপর সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ইতিপূর্বে কোনোদিন এত স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সাধারণ মানুষ অতীতে কখনও এত বেশি করে সমাজতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হয় নি।

যেহেতু পুঁজিবাদ একটি বিশ্বব্যবস্থা সেইজন্য পুঁজিবাদের বিশ্বজোড়া সংকট শুধু উন্নত পুঁজিবাদী দেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে এটা হতে পারে না। পুঁজি-বাদের আর্থিক সংকটের চরিত্রই হল সংক্রামক। স্বভাবতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানি প্রভৃতি দেশের সংকট সারা পুঁজিবাদী বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতকেও এর দায়-দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে। এ ছাড়াও অসম বিকাশ হচ্ছে পুঁজিবাদের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তার ফলে ভারতের মতো দেশে পুঁজিবাদী বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্নিহিত সংকটের উপাদানগুলি নিজস্ব গতিতেই সুপরিণত হতে থাকে। গত ৩০ বছরের পুঁজিবাদী বিকাশের ফলে একদিকে যেমন স্বাধীন ভারতের আর্থিক কাঠামোর বনিয়াদ গড়ে উঠেছে অপরদিকে মারাত্মক বেকারী, অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থিত জনসংখ্যার বৃদ্ধি, গ্রামে কায়েমীস্বার্থ এবং একচেটিয়া পুঁজি ও বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলির শোষণ ও জুলুমের মাত্রা বৃদ্ধি পুঁজিবাদী পথের সংকটের উপাদানগুলিকে সুপরিণত করে তুলে এক যন্ত্রণাদগ্ধ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। প্রধানত একচেটিয়া পুঁজি, বহুজাতিক কর্পোরেশন, নয়া ঔপ-নিবেশিক বহির্বাণিজ্যিক কাঠামো ও আপসমুখী ভূমি সংস্কার ব্যবস্থাকে ঘিরেই এই সঙ্কট সুপরিণত হয়ে উঠছে। আর এই সংকট শুধু আর্থিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। 'রাজ-নৈতিক ক্ষেত্র বিশেষত রাষ্ট্র ক্ষমতার ক্ষেত্র সমেত আমাদের দেশের সমাজ-বিকাশের গোটা প্রক্রিয়াকেই এই সংকট ঘিরে ফেলেছে।'

২

এই সংকট কি ভাবে সমাধান হবে—এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই বর্তমানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বগুলি বিকশিত হচ্ছে। পুঁজিপতি-শ্রেণী তার শ্রেণী শাসনকে বাঁচিয়ে রাখতে ও সুস্থির করতে চায়। পুঁজি-পতিশ্রেণীর মধ্যে একচেটিয়া অংশ আবার এই শাসন ব্যবস্থায় তাদের গোষ্ঠী প্রাধান্য বাড়াতে চায়। কিভাবে তাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এ নিয়ে পুঁজিপতিদের মধ্যেও চলছে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ও সংঘাত।

এ ছাড়া ভারতের মতো দেশগুলি হচ্ছে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে যারা উন্নত ও সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক শোষিত অংশ। সাম্রাজ্যবাদ এই-সব দেশে তার সংকটের বোঝা চালান দেয় এবং নয়া ঔপনিবেশিক কায়দায় ব্যবসা, বাণিজ্য ও সাহায্যের নাম করে সমানে লুটপাট চালিয়ে যায়। ভারতবর্ষে একমাত্র 'কোকা-কোলার' ব্যবসা করেই মার্কিন বহু-জাতিক কোম্পানিটি কোটি কোটি টাকা লুট করে নিয়ে গেছে। এই-সব দেশে পুঁজিপতিশ্রেণী শাসনের অবসান ঘটলে এইসব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় সাম্রাজ্যবাদ এইসব দেশকে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে বেঁধে রাখতে চায় এবং কোনো না কোনো আকারে বুর্জোয়াশ্রেণী শাসনকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, পারলে নিজেদের নিরঙ্কুশ

{ Office : 22-5188
Works : 23-9099

Naresh Kumar & Brothers

Paper Rolls Cutter & General Order Suppliers.

Office :
12, Pollock Street,
Calcutta-700001

Works :
8/1, Lall Bazar Street,
(Bikaner Building)
Calcutta-700001.

প্রভাবের আওতার বেরে দেয়। অপর দিকে ভারতে পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করার ফলে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বিস্ফোরণের মুখে এসে হাজির হয়েছে। জনগণের মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা বেড়েই চলেছে এবং এই অসন্তোষের মাত্রা বাড়তে বাড়তে এবার লোকসভা নির্বাচনে প্রায় বিস্ফোরণের আকারে ফেটে পড়েছে। তার ফলে কংগ্রেসের ৩০ বছরের একচেটিয়া শাসনের অবসান ঘটেছে। অধিকতর দক্ষিণ ঘেঁষা জনতা জোট ক্ষমতাসীন হয়েছে। এই জনতা জোটের মধ্যেকার প্রধান বা সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ স্বীকৃত জাতীয় নীতিগুলির বিরোধী। কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও এ কথা উপেক্ষা করা যায় না যে জনতা জোট বা কংগ্রেস উভয় অংশই পুঁজিবাদী পথে বিকাশ ঘটালে যাদের স্বার্থ সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত হয় তারা তাদেরই প্রতিনিধি। তবে এ কথাও ঠিক পুঁজিবাদী পথের মর্মবস্তু ও কার্যক্রম সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

গত ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা ও ঘটনাবলী বিকাশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কাছে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে পুঁজিবাদী পথ ভারতে ব্যর্থ হয়েছে এবং বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বন্ধন কেটে না বেরতে পারলে শুধু অচলাবস্থার সংকট নয়, বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকটের বোঝাও বহন করতে হবে। তাছাড়া জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আর্থিক উন্নয়ন সব কিছুই অধিকতর বিপদের জালে জড়িয়ে পড়বে। সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষ কেন কোনো সদ্য স্বাধীন দেশকেই উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হতে দেবে না। ঐতিহাসিক বিকাশের ধারায় এই ধরনের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তাই অতীতের বস্তু হয়ে গেছে। সেই জন্য ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী বাজার ব্যবস্থার বন্ধন থেকে মুক্ত করে দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে হলে সমাজতন্ত্রের পথ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। সমাজতন্ত্রের প্রতি বিপুল সংখ্যক মানুষের এই ক্রমবর্ধমান আসক্তি গড়ে ওঠার সর্বত্রই বুর্জোয়ারা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। আতঙ্কগ্রস্ত বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতারা নিজেরাই বলতে শুরু করেছেন যে তাঁরাও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান। ভারতবর্ষে মোরারজী দেশাই, চরণ সিং-এর মতো চরম দক্ষিণপন্থীরাও ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন। তবে আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা যে কার্যক্রম গ্রহণ করেন সেগুলিকেই তাঁরা সমাজতন্ত্র বলে চালাতে চান। এইভাবে বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের মস্তিষ্কপ্রসূত সমাজতন্ত্রের নানারকম মডেল ও হরেকরকম ধ্যান-ধারণা পূর্বেও চালু ছিল এবং এখনও চলছে। কিন্তু এমন একটা দেশও নেই যেখানে ঐসব ধ্যান-ধারণা পুঁজিবাদের অভিশাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে পেরেছে। নানা ধরনের বামপন্থী হটকারী তত্ত্বও ঐ একই পরিণতি লাভ করেছে।

ভারতে ভেজাল সমাজতন্ত্র ও তথাকথিত গ্রামভিত্তিক দ্রুত উন্নয়নের বক্তাপচা বুর্জোয়া তত্ত্বগুলির উৎস হচ্ছে পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া পণ্ডিতদের অসংখ্য 'উন্নয়ন তত্ত্ব' এবং নানা ধরনের সংস্কারবাদী ও শোধনবাদী চিন্তাধারা। উদাহরণস্বরূপ 'নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ', 'পরিকল্পিত পুঁজিবাদ', 'মিশ্র অর্থনীতি', 'নয়া পুঁজিবাদ' বা 'জনগণের পুঁজিবাদ', 'কল্যাণমূলক রাষ্ট্র', 'শিল্প সমাজ', 'নয়া শিল্প সমাজ', 'শিল্পোত্তর সমাজ' প্রভৃতি তত্ত্বগুলির উল্লেখ করা যায়। এই সমস্ত তত্ত্ব উপস্থাপনা এবং যুক্তি-বিন্যাসের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এগুলির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে কোনো না কোনো কায়দায় সুরক্ষিত করা। সম্প্রতি উন্নতিশীল দেশগুলির জাতীয় বুর্জোয়া-শ্রেণীর মতাদর্শের ব্যাখ্যাতা আর একদল পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটেছে। এইসব পণ্ডিতরা জাতীয় বুর্জোয়াদের সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থকেই সমগ্র জাতির স্বার্থ বলে প্রচার করে থাকেন। এঁদের মতাদর্শের মূল উদ্দেশ্য হল শ্রমজীবী জনতাকে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে আনা। একদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, অপরদিকে সমগ্র জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থের নীতি অনুসরণ করায় উন্নতিশীল দেশগুলির জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে এক ধরনের দ্বৈত প্রকৃতি গড়ে উঠেছে। এ ছাড়াও রয়েছে বামপন্থী সুবিধাবাদের তত্ত্বগুলি। এই তত্ত্বগুলি পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বই যে এ যুগের প্রধান দ্বন্দ্ব এবং সমাজতন্ত্রই যে এ যুগের নিয়ামক শক্তি এই প্রধান যুক্তিটি অস্বীকার করে সমাজতন্ত্র বিকাশের যে অদ্ভুত তত্ত্বটি সৃষ্টি করেছেন তার চূড়ান্ত ফল হল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধ শিবিরে দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা।

৩

ভারতের পুঁজিবাদী পথের সংকট অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সীমানা ছাড়িয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে যে রাজনৈতিক শক্তি সাম্যের পুনর্বিন্যাস অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। এই পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়ার মূল বিচার্য হল ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য ভারতবর্ষ কোন পথ বেছে নেবে। এই পথ বাছাই-এর প্রশ্নে লেনিনের উক্তিটি স্মরণীয়: "যা বেছে নিতে হবে তা হচ্ছে হয় বুর্জোয়া অথবা সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ। এর মাঝামাঝি কোন পথ নেই। অতএব সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে যে কোনো উপায়ে ক্ষুণ্ণ করার এবং এর থেকে সামান্যতম বিচ্যুতির অর্থ হবে বুর্জোয়া মতাদর্শকে শক্তিশালী করা।" বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রবক্তারা এটা বুঝতে পেরেছেন যে সরাসরি সমাজতন্ত্রবিরোধী মতাদর্শ দিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করা যাবে না। তাই সমাজতন্ত্রের প্রলেপ লাগিয়ে বুর্জোয়া মতাদর্শগুলিকে তারা হাজির করতে চায়।

বুর্জোয়া মতাদর্শভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম মূল আর্থিক সমস্যাগুলি সমাধানের পরিবর্তে গভীরতর সংকটেরই সৃষ্টি করে চলেছে। আর এই সংকট গত এক দশক ধরে যেভাবে রাজনৈতিক সংকটের জন্ম দিচ্ছে তাতে স্বভাবতই বুর্জোয়া রাষ্ট্র ক্ষমতার স্থিতিশীলতার প্রশ্নই সামনে এসে পড়ছে। বুর্জোয়া কায়দায় এই সমস্যার সমাধানের জন্য দুই পার্টি ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হচ্ছে। জনতা ফ্রন্ট ও কংগ্রেস পার্টির একাংশ এই পথেই ভবিষ্যৎ ভারতীয় রাজনীতিকে প্রবাহিত করতে চায়। ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের দ্বার রুদ্ধ করে দেবার জন্যই যে দুই পার্টি ব্যবস্থার প্রস্তাব এ কথা জনগণকে বোঝানো দরকার। দুই পার্টি ব্যবস্থার মতাদর্শগত ভিত্তি বসিয়ে দেওয়া সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতির পক্ষে একটি অপরিহার্য কর্তব্য।

ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণির সমাজতন্ত্রকে তারা 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' আখ্যা দিয়ে থাকে। এই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মূল মতাদর্শগত ভিত্তি হচ্ছে: শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজন নেই, বিপ্লবের প্রয়োজন নেই, দেশের প্রচলিত আইন-কানুনগুলো পার্লামেন্টে ভোটের মাধ্যমে পরিবর্তন করে দিলেই সমাজতন্ত্র তৈরি হয়ে যাবে। কংগ্রেস বা জনতা পার্টির যেসব লোক সমাজতন্ত্রের কথা বলে তারা সকলেই এই ব্যাপারে একমত। মতাদর্শগত সংগ্রামের এটাই প্রধান ক্ষেত্র। রাষ্ট্র ক্ষমতায় যতদিন বুর্জোয়াশ্রেণীর এরূপ কর্তৃত্ব থাকবে ততদিন সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা পূর্ণ গণতান্ত্রিক কাঠামোই গঠন করা যাবে না। ভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামোর পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণের জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে বুর্জোয়াশ্রেণীর একক কর্তৃত্বের অবসান ঘটাতে হবে। স্বভাবতই তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের পথেই-বুর্জোয়াশ্রেণীর এই কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো সম্ভব। আর এই শ্রেণীসংগ্রামের প্রধান সংগঠক হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী। এই শ্রেণীসংগ্রাম সম্যক বিকাশের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হচ্ছে মিত্র বাছাই করা। শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান মিত্র হচ্ছে কৃষক। শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীবদ্ধ শক্তিই শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম। শ্রেণীসংগ্রাম বিকাশের স্তরে স্তরে মিত্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে। বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং বুর্জোয়া-শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দেশপ্রেমিক অংশকে মিলিত করতে পারলে যে ঐক্যবদ্ধ মোর্চার আবির্ভাব ঘটবে সেই মোর্চাই বুর্জোয়াশ্রেণী শাসনের একক কর্তৃত্বের অবসান ঘটাতে পারে। তার ফলে যে নতুন রাষ্ট্র শক্তির আবির্ভাব ঘটবে সেই রাষ্ট্র শক্তিই ভারতবর্ষকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের পথে পরিচালনা করতে পারে। এই অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থাকে 'জাতীয় গণতন্ত্র' বা 'জনগণতন্ত্র' যাই বলা হোক না কেন, রাজনৈতিক শক্তিসাম্যের পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়াকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে নিয়ে আসতে হলে মতাদর্শের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে তীব্র লড়াই চালাতে হবে।

এছাড়া বুর্জোয়া মতাদর্শভিত্তিক 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদের' কার্যক্রমের দুই রকম ভাষ্য ভারতে প্রচার করা হয়। এর মধ্যে একদল কংগ্রেসীরা প্রচার করে থাকে এবং দ্বিতীয়টি প্রচার করে থাকে 'জনতা' ফ্রন্টের মধ্যে যারা সমাজতন্ত্রের কথাবার্তা পছন্দ করে তারা। কংগ্রেসীরা যে 'সমাজতন্ত্রের কথা প্রচার করে থাকে তার মূল কথা হল: সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক বাড়ানো, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রসার, ভারী ও মূল শিল্পের বিকাশ, কাজে না হলেও মুখে ভূমি সংস্কারের কাজ সমাপ্ত করার কথা বলা ইত্যাদি। একটি স্বাধীন জনতন্ত্রের আর্থিক কাঠামো গঠনে এর প্রত্যেকটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। এই কার্যক্রমের সঙ্গে কমিউনিস্টদের কোন বিরোধ

নেই। বরং এই কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কমিউনিস্টরা অতীতে যেমন সাহায্য করেছে ভবিষ্যতেও তেমনি সাহায্য করবে। কিন্তু 'সমাজতন্ত্রের' কংগ্রেসী প্রবক্তারা এই কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গে বিগত দিনে একচেটিয়া পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের নয়া-ঔপনিবেশিক কার্যক্রমের সঙ্গে যেভাবে আপস করে চলেছে তাতে তাঁদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার ধার অনেক সময়ই ভোঁতা হয়ে গেছে এবং একচেটিয়া পুঁজির ষড়যন্ত্রের কাছে বহু সময়ই আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। সর্বোপরি রাষ্ট্র-ক্ষমতায় শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ছাড়া যে সমাজতন্ত্র গঠন করা যায় না এ যুক্তি তারা কখনই স্বীকার করেন নি। বস্তুত এ যুক্তি স্বীকার করলে তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের মৌলিক শ্রেণীভিত্তিই নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিকে সমাজতন্ত্র গঠনের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির কথা নিরন্তর প্রচার করতে হবে। সমাজতন্ত্রের কোনো শ্রেণীনিরপেক্ষ ভাষ্য থাকতে পারে না। এ কথাটি যত জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করা যাবে ততই রাজনৈতিক শক্তির পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়াকে সমাজতন্ত্রের পক্ষে আনা সম্ভব হবে।

জনতা জোটের মধ্যে একদল লোক আছেন যাঁরা সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে মোটামুটি কংগ্রেসী ভাষ্যকেই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পথ বলে মনে করেন। এই জোটের আর একটি অংশের সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণাগুলিই হল গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দ্বিতীয় ভাষ্য। এই ভাষ্যের মূল কথা হল: রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র, ভারি ও মূল শিল্পের সীমাবদ্ধ ভূমিকা, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে আর্থিক সম্পর্ক বেশি মাত্রায় গড়ে তোলার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা, গ্রামের লোকের দুঃখ দুর্দশার কথা তুলে গ্রামভিত্তিক উন্নয়নের নামে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক রূপান্তর অসম্ভব করে ফেলা এবং শিল্প ও কৃষির উৎপাদনী শক্তির বিকাশে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার ভূমিকাকে সঙ্কুচিত করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের পশ্চাদপদ অবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করা। অর্থ-নীতির সাম্রাজ্যবাদী পণ্ডিতরা ও বিশ্বব্যাঙ্কের মোড়লরা ভারতবর্ষ ও এই ধরনের দেশগুলিকে দিয়ে ঠিক এটাই করাতে চায়। প্রকাশ্যে কমিউনিজম-বিরোধিতা পরোক্ষে সোভিয়েত-বিরোধিতা, জোটনিরপেক্ষতা, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র, মূল ও ভারি শিল্পের বিরোধিতার ভিত্তিতেই এদের 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদের' মতাদর্শ গড়ে উঠেছে। দুই-চারজন নেতা বা মন্ত্রীর ভিন্ন মনোভাবকে এই জোটের মতাদর্শ বলে ভুল করা অযৌক্তিক।

গত তিন দশক ধরে পুঁজিবাদী পথে বিকাশ প্রচেষ্টার ব্যর্থতার বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড গণ অসন্তোষ গড়ে উঠেছে এবং পরিবর্তনের জন্য জনমনের মধ্যে যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে তাতে 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদের' নামে ভুল পথে পরিচালনার ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। প্রয়োগবাদী (Pragmatic) রাজনীতির ছলাকলা দিয়ে একে প্রতিহত করা যাবে না। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষায় সুশিক্ষিত কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় তীব্রতর মতাদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক শক্তিসাম্যের পুনর্বিন্যাসের নতুনতর প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারলে ভারতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ ত্বরান্বিত হবে এবং সমাজতন্ত্র বিকাশের পথ সুগম হবে।

উপরোক্ত আলোচনার এ কথা পরিষ্কার যে নতুন পরিস্থিতিতে ভারতে রাজনৈতিক শক্তিসাম্যের পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়াকে যথাযথভাবে প্রভাবিত করতে হলে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করেই বর্তমানে মতাদর্শগত সংগ্রাম সংগঠিত করা প্রয়োজন। এই সমস্ত বিষয়গুলি হল:

প্রথম, দুই পার্টি ব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্য ফাঁস করে দেওয়া এবং বিকল্প হিসেবে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তি জোটের যৌক্তিকতা প্রচার করা।

দ্বিতীয়, ভারতে পুঁজিবাদী পথ ব্যর্থ হয়েছে, বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রই এর একমাত্র বিকল্প। রাষ্ট্র ক্ষমতায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ছাড়া সমাজতন্ত্র গঠন করা সম্ভব নয় এই বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গড়ে তোলা।

তৃতীয়, পুঁজিবাদ একটি বিশ্ব-ব্যবস্থা ঠিক তেমনি সমাজতন্ত্রও একটি পাল্টা বিশ্বব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক যত সম্প্রসারিত হবে ভারতের আর্থিক কাঠামোর উপর বিশ্ব পুঁজিবাদী কব্জা তত শিথিল হয়ে আসবে। তাই সোভিয়েত-বিরোধী বা বিশ্ব সমাজতন্ত্র বিরোধী অবস্থান নিয়ে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। এই বিজ্ঞানসম্মত ধারণাটির যথাযথ ব্যাখ্যা ও প্রচার সংগঠিত করা।

চতুর্থ, পরিকল্পনা কাঠামো

গঠন, বাজারজাত ক্ষেত্রের প্রসার, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাঙ্ক ও মূল শিল্প গঠন, ব্যাঙ্ক ও বিমাকের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজগুলি তাহাতে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ভিত্তি গঠনের কাজে লাগলেও এগুলি মূলত পুঁজিবাদ-বিরোধী আর্থিক উপাদান। এই উপাদানগুলি সম্প্রসারণ ও গণতন্ত্রীকরণ পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলির দ্রুত বিকাশ ঘটিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক অবসানের বাস্তব অবস্থা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। সেইজন্য এইসব স্বীকৃত জাতীয় নীতিগুলির বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত চলছে তার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম তীব্র করে তোলা।

পঞ্চম, ভূমি সংস্কারের আরও কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে জল, বীজ, সার, পশু ওষুধপত্র করা, পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থা সংগঠিত করা প্রভৃতি ব্যবস্থার, যাহাতে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক রূপান্তরের পক্ষে তীব্র প্রচার করে তোলা।

ষষ্ঠ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত ও রাজনীতিগত সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য বিপ্লবী শ্রেণী, শ্রেণী ও পার্টিগুলির মধ্যে মতাদর্শগত ঐক্য গড়ে তোলার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা সংগঠিত করা।

৯ম নির্বাচনোত্তর নতুন পরিস্থিতির গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করে রাষ্ট্রনৈতিক শক্তিসাম্যের পুনর্বিন্যাসের মূলে মতাদর্শগত সংগ্রামে সংশ্লিষ্ট সকলকেই ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে হবে।

■

With best compliments from

SIDDHARTHA FERRO ALLOYS LIMITED

25 Netaji Subhas Road, Calcutta-1

22-5814
22-5815
22-0946

Telegram
Telex

Manufacturers and Exporters of

HIGH QUALITY

Carbon & Low alloy steels, spring steels
Carbon Tool steel, Forging quality steels,
Low/Medium alloy constructional steels.

Specifications :

ISS, EN, AISI. SAE & DIN.

Also available rolled sections—

As rounds, flats, squares, Hexagons etc.

(Registered with RDSO, ISI, DGSD & ordnance Factories)

পৌষ মেলায়

শ্রীদেব মুখোপাধ্যায়

এবারের ঘোরাঘুরিতে যে নিজের অজান্তে পৌষ মাস বেছে নিয়েছিলাম, সেটা হু'শ হল জয়দেবের মেলা দেখতে বেরিয়ে।

মেলা বসে পৌষ সংক্রান্তিতে। তার মানে, বছরের সবচেয়ে ঠুসমযে আমি এতদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। দুঃখের যে ছবিগুলো দেখেছি এরপর কি তাতে আরও চড়া রং লাগবে?

তাহলে তো শুরুরই কথা। আবার ভরসার ব্যাপারও আছে। যেভাবে খোসার ওপর খোসকারি করে চলেছে বিজ্ঞান, তাতে পুরনো অনেক প্রবাদই বরবাদ হয়ে যাবে।

রাস্তায় বেরিয়ে ঠিক করলাম মেলার প্রথম দিনটা এড়ানো ভালো। কেননা বিস্তর চেনা লোকজন আসবে। তাদের সঙ্গে দেখা হলেই গরুগুবরে কেঁসে যাব।

কাজেই বোলপুরে নেমে রাত্তিরে থেকে গেলাম লামাজীদের বাড়ি। পুরো নাম ঠিক্সা লামা। তিব্বতীর অধ্যাপক। ও বাড়িতে আমরা প্রায় ঘরের লোক। আগে থেকে বলাকওয়ারও কোনো দরকার হয় না।

রাস্তায় আলো না থাকায় বাড়িটা ঠিক ঠাহর হচ্ছিল না। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতো করে অমর বলে ডাকতেই লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল লামাজীর ছেলে। এখন মাথায় বেশ বড় হয়েছে। ইস্কুলের পড়া শেষ করে চীনা ভাষা পড়ছে। অমরের মা থু-শি সিকিমের মেয়ে। প্যাটকে মানুষ। ছোট্ট তরাং-চি তার ভাইয়ের মেয়ে। বাড়িতে তিব্বতী, মঙ্গোলীয়, সিকিমী, বাংলা, হিন্দী সব ভাষাতেই কথা হয়। লামাজী এ ছাড়াও বলতে পারেন চীনা আর ইংরিজি। প্রত্যেকেই সুন্দর বাংলা বলে। থু-শি রবীন্দ্রসঙ্গীত খুব ভাল গায়, ছবিও আঁকে। অমর বাঙলায় ভাল অভিনয় করে।

রাত্তিরে লামাজীকে ধরে বসলাম। ছেলেবেলা কিভাবে কেটেছে, কেমন করে এদেশে এলেন তার গল্প বলুন।

লামাজী বললেন আমাদের বাংলায়।

মঙ্গোলিয়ার যে অংশটা চীনের মধ্যে, লামাজী সেখানকার মানুষ। আজকের সঙ্গে সেদিনকার মঙ্গোলিয়ার ছিল অনেক তফাত। লোকে থাকত তাঁবুতে। লামাজীর তাঁবুতেই জন্ম। তাঁবু বলতে কাপড়ের টেন্ট নয়। কাঠের মোড়ানো তাঁবু। এমনভাবে বানানো যাতে শীত আটকায়। সেদেশে তো ভীষণ ঠাণ্ডা। বরফে চারদিক এমন ঢেকে যেত যে দরজা খোলা দায় হয়ে দাঁড়ত। দরজা কোনো রকমে খুলে কোদাল দিয়ে রাস্তা করতে হত। বরফের ঘর করে তার ভেতর লোকে শীতের ক'মাসের খাবার জমিয়ে রাখত। দুধ মাখন মাংস। একটা পাত্রে দুধ নিয়ে বাইরে দশ মিনিট রাখলেই দুধ জমে যেত। এইভাবে জমিয়ে জমিয়ে রেখে তারপর খাওয়ার সময় আগুনের আঁচে গলিয়ে নেওয়া হত। শীতকালে কোথাও জল দেখতে পাওয়া যেত না। শুধু বরফ। স্নান করার কথাই উঠত না। মাঝে মাঝে শুধু গরমজলে একটু মা মুছে নেওয়া।

গরমে থাকার পাকা বাড়ি ছিল। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই থাকত তাঁবু। লোকে ভেড়া ছাগল উট নিয়ে আজ এখানে কাল সেখানে এমনিভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াত।

সেখানে ভালো খাদ পাওয়া যেত সেখানেই ডেরা ফেলত।

একমাত্র মঠগুলোই ছিল স্বাধীন আস্তানা। গ্রামে ইস্কুল বলে কিছু ছিল না। ছেলেদের পড়াবার জন্যে হয় মঠে পাঠাতে হত, নয় বাড়িতে গুরু রাখা হত। লামাজীর হাতে-খড়ি হয়েছিল গ্রামের বাড়ির এক গুরুর কাছে। তিব্বতী ভাষায়। সেইসঙ্গে ক্রমে মঙ্গোলীয় সাহিত্যের ভাষাও রপ্ত করলেন। খানিকটা এইভাবে তালিম পাওয়ার পর তাঁকে মঠে পাঠানো হল। সেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কাছে পড়তে হত।

দেড় বছরে লেখাপড়া বেশ খানিকটা এগোবার পর চীনের এক বৌদ্ধ মঠে তাঁকে দু বছরের জন্যে পড়তে পাঠানো হল। সেখানে মূল বই, ভাষা, ব্যাকরণ এসব শেখার খুব একটা ভালো ব্যবস্থা ছিল না। শুধু পাঠ আর পুজো। ব্যস, তার বেশি বিশেষ কিছু নয়।

লড়াই তখন শেষ হয়েছে। জাপানীরা চীন ছেড়ে পালাচ্ছে। লামাজীর বয়স তখন বছর উনিশ। সেই সময় তাঁদের কয়েকজনকে বাছাই করে পাঠানো হল লাসায়। তিব্বতী মঠে এসে এতদিনে পেলেন পুরোদস্তুর শিক্ষা। দু বছর পর যখন তাঁর দেশে ফেরার পালা এল, তখন চীনে বড় রকমের ওলটপালট হয়ে গেছে। যে এলাকায় ওঁদের বাড়ি, সেখানকার মঠে পুরনো লোকজনেরা আর নেই। এদিকে না আসে বৃত্তির টাকা পয়সা, না পাওয়া যায় চিঠি লিখে কোনো উত্তর। লামাজী তখন ঠিক করলেন তিব্বতে আসবেন।

চুম্বী উপত্যকা পৌঁছতে লাগল দিন পনেরো। এক নাগাড়ে হাঁটা নয়। কিছুটা পথ যাওয়ার পর কোনো মঠে কিংবা কারো বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া। দু তিন দিন থেকে যাওয়া। এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে বর্ডার। সেখানে পাওয়া গেল তিব্বতে ঢোকার পারমিট। সঙ্গে পয়সাকড়িও বেশি নেই। চেনা-জানাও কেউ নেই। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আলাপ হয়ে গেল তিব্বতী আর মঙ্গোলীয় ভাষায় দুপণ্ডিত রোয়েরিকের সঙ্গে। তারপর এ কাজ সে-কাজ করে এখন এই শান্তি-নিকেতনে।

বললেন, 'অবসর নেবার পর চলে যাব ঠাণ্ডা কোনো জায়গায়। কোনো রকমে দিন চলে গেলেই হল। ঘরবাড়ি গাড়িঘোড়া এসবের কোনো লোভ আমার নেই।

'দেশের জন্য মাঝে মাঝে মনে পড়ে। যেমন একটা বড় পাথর। তার ওপর বসে খেলতাম ছোট-বেলায়। সেইটা হঠাৎ মনে পড়ে যায়। চারিদিকে সেই পাহাড় পর্বত, সেই নদী, সেইসব গাছ। ছবির মতন ভেসে ওঠে। ইচ্ছে করে এখুনি ছুটে যাই। কষ্ট বয়সে মনে হত না। এখন ভীষণ মনে পড়ে। ভাবি, কোনো সময়ে চীনের সঙ্গে যদি আবার এদেশের সম্পর্ক ভাল হয়, যাওয়া আসার বাধা উঠে যায়—একবার গিয়ে দেখে আসব ছেলে-বেলার সেইসব জায়গা।

'বাবা অনেক আগেই মারা গেছেন। ঠাকুরমা আর মা বেঁচে ছিলেন। আমরা ছিলাম এগারো জন ভাইবোন। তার মধ্যে পাঁচজন বসন্ত রোগে মারা যায়। আমাদের দেশে টিকা দেবার অন্য ধরনের ব্যবস্থা ছিল। একটা গুঁড়ো ওষুধ নলে করে নাকের মধ্যে ফুঁ দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। তারপর সারা গায়ে বার হত বসন্ত রোগের সাংঘাতিক গুটি। অনেকের গায়ে সারা জীবনের মত দাগ থেকে যেত। টিকেটা ছিল ভারি কষ্টদায়ক একটা ব্যাপার। আট-ন বছর বয়স না হলে সেটা দেওয়া যেত না। সেই বয়সে পৌঁছবার আগেই আমার ভাইবোনেরা মারা যায়। যারা বেঁচে ছিল তাদের আর কোনো খবর পাই নি। মার কথা মনে পড়লে খুব কষ্ট হয়।

'মঙ্গোলিয়া থেকে চীন, চীন থেকে তিব্বত সবই ঘোড়ার পিঠে। এই পথে সীমান্ত পার হওয়া ছিল বেশ শক্ত কাজ। চীন থেকে তিব্বত গিয়েছিলাম জঙ্গলের রাস্তায়। সঙ্গে ছিল উট। দিনের বেলায় উট নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে ঢাকা দিয়ে ঘুমোতাম। সন্ধ্যের পর শুরু হত আমাদের চলা। সঙ্গে খাবার থাকত—ছাতু, মাখন আর শুকনো ছানা। খাবার ফুরিয়ে গেলে গেরস্থদের বাড়িতে গিয়ে হাত পাততাম। কেউ কেউ দিত, আবার কেউ কেউ টাকিয়েও দিত। কতদিন খালি পেটে থাকতে হয়েছে শরীরটা খুব হালকা লাগত। চলতে কোনো ক্লান্তি হত না। এইভাবে চীন থেকে তিব্বত পৌঁছতে তিনমাস লেগেছিল।

'আমি মঙ্গোলিয়ার লোক। তিব্বতের ঠাণ্ডা আমার ঠাণ্ডা বলেই মনে হত না। মাঝে মাঝে খুব বেশি হলে পুকুরের জলে কাগজের মতো একটা পর্দা পড়ত। মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে সেই ঠাণ্ডার কোনো তুলনাই হয় না।'

সকালে উঠে লামাজীকে বললাম, চলুন জন্তুদের দেখে

আসি। লম্বা রাস্তা পাড়ি দেওয়া লাযাজী এখন একেবারেই ঘরকুনো। কাজ না থাকলে বড় একটা বেরোতেই চান না।

খুশি এক পায়ে রাজি। সকালের বাসে রওনা হলাম তৈরি হয়ে।

এবার মেলা দেখতে যাচ্ছি বহু বছর পর। সে সময় এত বাস ছিল না। এখন লাইনের বাস ছাড়াও, লঙ্গনসার অনেক বাস।

জয়দেবে ঢোকার রাস্তাটা এখন পাকা হয়ে গেছে। ফলে, আগের মতন জাইটা দুলো ওঠে না। খানিকটা পথ আগে বাস গেল বিগড়ে। সারা রাস্তা দাঁড়িয়ে এসেছি। কাজেই একটু বসে জিরিয়ে নেবার জন্যে বাইরে এলাম এসে দেখি বাসের ভেতরে যত লোক তার সমান সংখ্যক ছাদের মাথায়। বেশিরভাগই এসেছে বাইরে থেকে ট্রেনে।

শেষ যেবার এসেছিলাম সেবার এক গাড়ির দুর্ঘটনায় শেষ অবধি আর মেলা দেখা হয় নি। তখন ছিল কাঁচা রাস্তা। গাঁয়ের এক রাখাল ছেলেকে কোলে নিয়ে দুর্গা নাম জপতে জপতে সিউড়ির হাসপাতালে ছুটতে হয়েছিল। সেদিনকার কথা ভাবলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়।

এবার মেলার চেহারা দেখে মনে হল অনেক বদলেছে। এখন আর সেই ছড়ানো ছিটানো ভাব নেই। সার সার লাইনবন্দী দোকান। ইলেকট্রিক আসায় মাইকে মাইকে হুলস্থুল।

জয়দেব মোহান্ত এস্টেটের ম্যানেজার অতুল দত্ত এই অঞ্চলেরই লোক। অতুলবাবু আছেন আজ তেরো-চোদ্দ বছর। পুরনো অনেক কথাই তাঁর মুখ থেকে শুনলাম।

এখন মেলায় চলাচল করছে আড়াই শো তিন শো বাস। সেই সঙ্গে আসছে মাল্লে ট্রাক আর অগুনতি সাইকেল। লোকের স্রোত পৌষ থেকে ঠেলছে। কেউ যে দাঁড়িয়ে দেখে কিছু কেনাকাটা করবে তার উপায় নেই। তাছাড়া এবার চাষবাসও ভাল হয় নি বলাই। ফলে সেরকম বেচাকেনা নেই। বাজার আছে শুধু কাঠকাবাড়া আর কলার। এখন আর লোকে তরটা কিনতে আসে না, আসে দেখতে। কিছুটা ভালমন্দ খাওয়া-দাওয়া। ফলে হোটেল আর মিষ্টির দোকান অনেক বেড়েছে।

আগে এসব অঞ্চলে তো দোকান বাজার ছিল না। কিছু কিনতে হলে যেতে হত সিউড়ি, নয় দুবরাজপুর পঞ্চর গাড়িতে যেতে আসতে তিন চার দিন লেগে যেত। কেউ যখন মামলা মোকদ্দমা কোর্ট কাছারি করতে শহরে যেত, মোটা গ্রামের লোক বরাত দিত। আর জয়দেবের মেলা থেকে কিনে রাখত সারা বছরকার যাবতীয় মালপত্র। কড়াই বালতি হাঁড়িকুড়ি কাপড়চিস। আর মনিহারি জিনিস। এখন হাতের কাছে দোকান বাজার হয়েছে। তাছাড়া যারা ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করে, ইস্কুল কলেজে যায়—দরকারের জিনিসগুলো তারাই কিনে আনে।

আগেকার আমলে জয়দেবের মেলায় বেশি বিক্রি হত এদেশের জুতোর আর চোমদের তৈরি বাঁশের বাঁশী আর কাঠের পুতুল। এক রকমের ঘুরনি ছিল, তার নাম ব্যাংকুড়কুড়ি। সরবতী লেবু, চোপা কুল খুব বিক্রি হত।

আগেকার বৈষ্ণব বাউলরা এখন আর আসছে না। এখন আসছে সব আধুনিক ঢঙের। আগে দেহতত্ত্বের গান হত। এখন যা হচ্ছে সব নিউকাট।

লোকের সাজপোশাক রুচি এসবও অনেক বদলেছে। সব জাতসম্প্রদায়ের ছেলেদেরই পরনে এখন প্যান্ট। মেলায় আগে চলন ছিল মুড়ি আর তেলেভাজার। আগে এ মেলায় ভাতডাল মাছমাংস রুটনরেঁধাঘর চলত না। এখন হোটেলের পর হোটেল।

মেলায় এখন বাইরের লোকই বেশি আসছে।

অতুলবাবু দুঃখ করে বললেন, এখনকার ছেলেছোকরার দল সাধুসন্ন্যাসীদের ঠিক আগের চোখে আর দেখে না। দেখে ঠাট্টাতামাসা করে। যেন তারা গেরুয়া পরে লোক ঠকাচ্ছে, কাজ না করে সমাজের ক্ষতি করছে। এই হল এখনকার ভাবধারা।

তবে বাইরের লোক আসায় এখানকার কুনো স্বভাব বদলাচ্ছে। আগে মাল নিয়ে যার যেখানে মন হত বসে যেত। এখন বসবার একটা ছিরিছাঁদ হয়েছে। কুঠো কাঙালীদের আড্ডা করে দেওয়া হয়েছে মেলার বাইরে।

জঙ্গলে এখন সোবর গ্যাসের স্ল্যান্ট বসছে। গ্যাস জ্বালিয়ে রান্না হবে, আলো জ্বলবে। আবার তার সার লাগবে চাষবাসের কাজে। মাঝে মাঝে এখানে কেরোসিন বেচার ছুর্ণলা চত্ত। আগে জঙ্গলে প্রচুর কাঠকাবাড়া ছিল। জ্বালানির জন্যে ভাবতে হত না। বন এখন সরকারের সংরক্ষিত। আগে জঙ্গলের গরুও

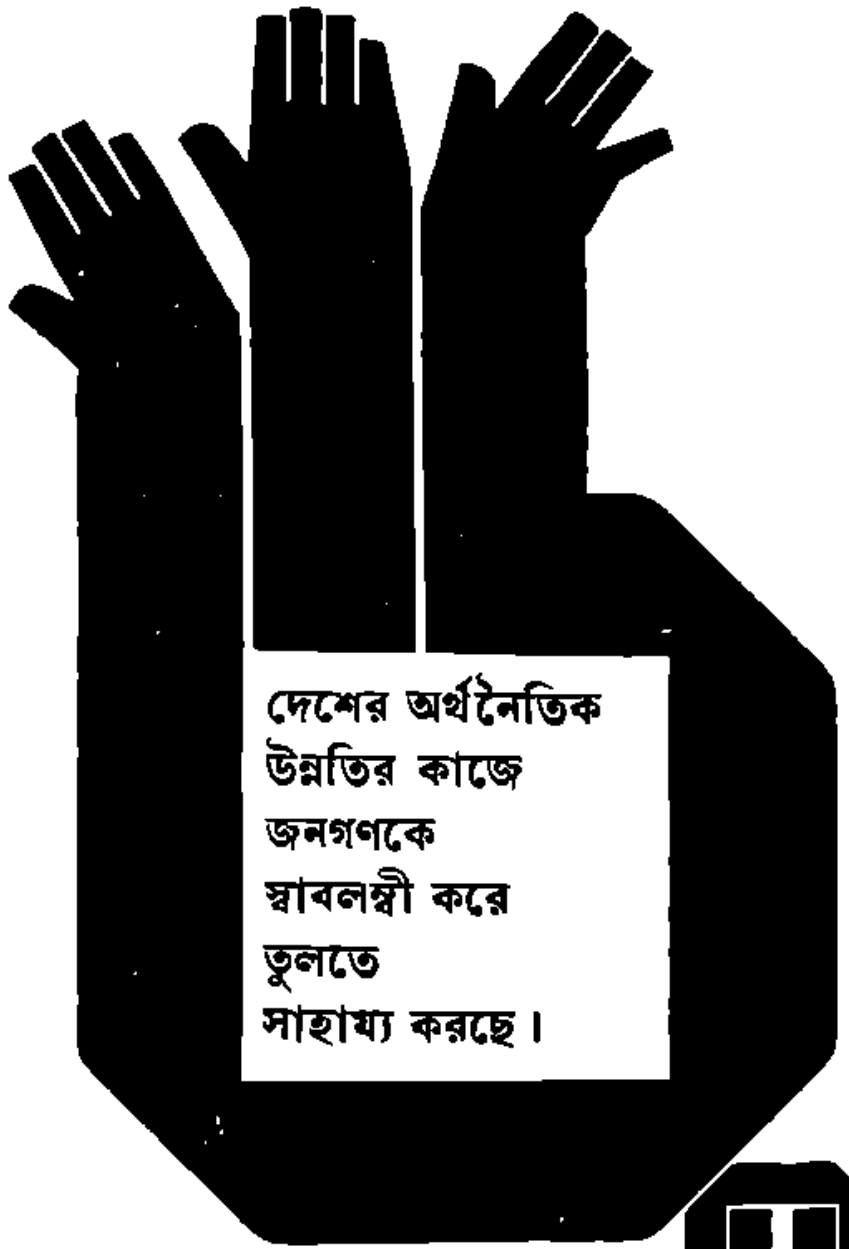

ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ছিল প্রচুর। এখন আবার আশ্রমে আস্তে আস্তে গরুসংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। আজকাল রসুই করতে ছ-সাত হাজার টাকা বেরিয়ে যায় শুধু জ্বালানি কিনতে। গোবর গ্যাস চালু হলে অনেক টাকা বাঁচবে।

এই আশ্রমের নাম জয়দেবের মোহান্ত এস্টেট। বৃন্দাবনের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মোহান্ত এই আশ্রম চালান।

অতুলবাবুর মুখে সংক্ষেপে শুনলাম জয়দেবের কাহিনী আর এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা।

জয়দেব গোস্বামী ছিলেন কবি লোকে তাঁকে বলত জয়া ক্ষ্যাপা। তিনি থাকতেন এখানে কাছে সেখানে বাউল গান করে বেড়াতেন। পেড়োয় ছিলেন শিবভক্ত তান্ত্রিক যোগী। পরে সঙ্গীতে সাধনায় আকৃষ্ট হন। শেষ জীবনে হয়ে যান বৈষ্ণব।

শোনা যায়, পদ্মাবতী ছিলেন জগন্নাথ মন্দিরের ছোট দেবদাসী। সেখানে নাচগান করে দেবতার আরাধনা করতেন। তাঁর মা-বাবার ওপর একবার জগন্নাথের স্বপ্নাদেশ হল—আমার এক আউলেবাউলে ছেলে আছে কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেব নামে। সর্বদাই থাকে অজয় নদীর ধারে শিবের মন্দিরে। সে আমার মানসপুত্র। পদ্মাবতীকে তার সেবাদাসী করে পাঠাও। তার খাওয়া-দাওয়ার ঠিকঠিকানা থাকে না। কেউ খেতেও দেয় না। ঠাট্টা করে। মা-ও নেই বাপ-ও নেই।

এইভাবে নাকি জয়দেব পদ্মাবতীকে পান। পদ্মাবতী নৃত্য দিয়ে রাধামাধবের আরতি করতেন। আর সেই নৃত্যছন্দে জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দ লিখতে থাকেন।

শেষ জীবনে পদ্মাবতীকে রাধামাধবকে নিতে সহস্ত লিখিত গীতগোবিন্দের পুঁথি হাতে জয়দেব চলে যান বৃন্দাবনে। সেখানে তিনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে যোগ দিয়ে ছেচল্লিশতম শিষ্য হন। জয়দেব দেহ রাখলে শততম চেলা রাধাবিনোদ ব্রজবাসী পায়ে হেঁটে এখানে এসে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমশ এই আশ্রম বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়। প্রত্যেক মকর সংক্রান্তিতে জয়দেবের স্মৃতিতে মেলা শুরু হল মঠ হল। মহন্ত হল।

রাধামোদর ব্রজবাসী বিষয়সম্পত্তি বাড়াতে গিয়ে শেষ অবধি খুন হন। ইংরেজ আমলে তাঁর ছিল কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে সুরেন ব্যানার্জি প্রায়ই এখানে এসে থাকতেন।

হোটেলে আমরা বর করে এসেছিলাম তিন টাকায় ঘুগনির মাংস আর ভাত। কিন্তু অতুলবাবু ছাড়লেন না। মন্দিরের নিরামিষ প্রসাদ খেতে ভালই লাগল।

ঘুরতে ঘুরতে এসে গেলাম নদীর ধারে। নদীতে হাঁটুজলও হবে না। তারই মধ্যে গা ভিজিয়ে স্নান করছে শয়ে শয়ে পুণ্যার্থী।

রাধামাধবের মন্দিরে যাওয়ার রাস্তার দুধারে কুষ্ঠরোগীরা ভিড় করে আছে। নদীর ধার বরাবর নেমে গিয়ে পাওয়া গেল কলার বাজার।

যারা কলার ব্যাপারী তারা সবাই এসেছে চন্দননগরের আশপাশ থেকে। চাঁপা কলা এই এক জায়গাতেই হয়। বড় বড় কলার ছড়া দোকানের সামনে টাঙানো। মাটি দিয়ে ঢেকে কাঁচা-কলা পাকানোর ব্যবস্থা। এত কলা যে, দেখে চোখ হতে যেতে হয়।

একজনকে জিগ্যেস করলাম, এত কলা সব বিক্রি হবে কি?

সে একগাল হেসে বলল, খরার জন্যে এবার জনা কম। নইলে আমরা আরও কলা আনতাম। মেলার তিন দিন গেলে তারপর দেখবেন কী রেটে কলা বিক্রি হয়। পুজোর পাট চুকে গেলে গ্রামের মুসলমানরা মেলায় আসবে। তখন তারা কেটিয়ে কলা কিনে নিয়ে যাবে। বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের খাওয়াতে করে তারা কলার খাওয়াবে। সে একটা উৎসবের মত ব্যাপার।

নতুন কোনো জিনিস মেলায় চোখে পড়ল না। বটতলার দিকে লাইন করে পড়েছে ছাউনি। বোষ্টমদের আখড়া। রসকলিতে একেকজন বোষ্টমবোষ্টমীকে ভারি সুন্দর দেখায়। বাইরে থেকে যারা আসে তারা বাউল গান শুনতেই ব্যস্ত। যারা গান গায় না তাদের দিকে খুব কম লোকই তাকায়। অথচ যতই নিরক্ষর হোক, এদের মুখের বাংলা যে কী অসামান্য তা যে শুনেছে সেই জানে। আমার খুব ইচ্ছে ছিল বসে শোনার। কিন্তু এই হৈ-হট্টগোলের মধ্যে তার আর সুযোগ হল না। দুর্গাপুরের কাছে এক বাবাজীর আখড়া আছে। আমাকে ঠিকানা দিলেন। মাঘী পূর্ণিমায় আমি যেন নিশ্চয় যাই।

ভিড় ঠেলতে ঠেলতে হেতমপুরের আশানন্দন চট্টরাজের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি যখন 'সন্দেশ'-এর সম্পাদক ছিলাম, আশানন্দন তখন

(৭২ পৃষ্ঠায়)

শিল্পী : সুবোধ দাশগুপ্ত

কবিতা

প্রলয়-বিধাতা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কোথায় দেখছ মহা প্রলয়ের সংকেত ?
শুধু কি বায়ুকোণের পুঞ্জিত মসী মেঘে ?
প্রলয়-প্লাবনের উচ্চল তরঙ্গ-চূড়া দেখতে
কোথায় আজ তাকিয়ে ?
মহাসিন্ধুর দিক্‌চক্রবালে কি শুধু ?
সব মিথ্যা আজ আশঙ্কা।
যা পড়িয়ে ছাই করে দেবে
সেই দাবানলের সূচনা কি খুঁজছ
ঐ অগ্নিগিরীর গভীরে ?
ধূমধূসরাম্বরের সমস্ত পুঞ্জিত পাপের পরাগভার
অকাল-ছোঁয়া অগ্ন্যুদ্গারে যা চূর্ণ বিচূর্ণ করবে
সে মহা অলোড়নের ভূমি গর্জনধ্বনির আভাস
কান পেতে আজ কি পৃথিবীর বুকে ?
ওখানে নয়। ওখানে নয়।
প্রলয়ের আগমনী জানতে,
মানুষের চোখের দিকে তাকাও,
তোমার পাশে যারা আছে তাদের
নিজা ধূসরো যাদের দেখছ, তাদেরও।

আকাশ সমুদ্র কি পৃথিবীর বুকে নয়,
কখনো গোচরে কখনো আলোচরে—
কালান্তরের ভয়ঙ্কর ভূমিকা
রচিত হচ্ছে মানুষেরই মনের গহনে,
প্রলয়-বিধাতা
তুমি আর আমি-ই।

গঙ্গোত্রী জানে

বিমলচন্দ্র ঘোষ

বঙ্গোপসাগর জন্ম পায় না: সৌরিক মৃত্তিকায়
গঙ্গার গৈরিক স্রোতে প্রাচুর্যের নেই সম্ভাবনা
পলিতীর্থে জাগরূপী স্বপ্নিলরূপ ভূম-বিস্তার
অহরহ সোরগোল করে মহাধ্বনি স্পষ্ট যায় শোনা।
ফণায় শাশ্বতমায়া শ্বাসরুদ্ধে তাইতো জোয়ার
অন্ধকারে কালবুকের চক্রান্তজাল বোনা।
সন্ত্রস্ত পলিমরুভূমি, সাধুত্রিক সম্পদসম্ভার
অবারিত হবে ধ্বংসে ? ক্লান্তিকর স্রোতে দিন গোনা।

গাঙ্গেয় হৃৎস্পন্দন, তবু সন্তার হৃৎনারায়ণ।
অগ্রসর হলদিয়ার জলনয়ে বিশাল বন্দরে
জাহাজে বর্ণালীরা, জলযুদ্ধে মৃত্তির প্রত্যয় ?
সমবেদ-জলরাশি হাত দেবে মেঘমল্লহরে ?
পলিমাটি বঙ্গভূমি গ্রামে মা বিতর্ক অবান্তর
শাশ্বতী গঙ্গোত্রী জানে মৃত্তি আর বঙ্গোপসাগর।

ও আমার ঠান্‌দি

অন্নদাশঙ্কর রায়

জেলখানা যার সে-ই
গাড়িঘোড়া চড়ে সে-ই।
সে-ই হয়ে ছোট মন্ত্রী
রাজসাট ভরাই হয়।
এই তো দেশের রীতি
সনাতন রাজনীতি।
তুমিও তো এই পথে
উঠেছিলে রাজরথে।
তবে কেন ভুলে গেলে
বিপ্লবীকে নিজে ছেলে?
ও আমার ঠান্‌দি।
ইন্দিরা গান্ধী।

এ কী ভুল। এ কী ভুল।
হারালে যে রাজকুল।
পার হয়ে ছোট নদী
কেন তবে পাবে গদী।
মনে রেখো দেশ রীতি
সনাতন রাজনীতি।
জেলখানা যার না যে
জনভোট পায় না সে।
ও আমার ঠান্‌দি।
ইন্দিরা গান্ধী।

নতুন জায়গা থেকে

মণীন্দ্র রায়

সস্তি ফ্ল্যাটের লোভ আমার
জন্ম থেকেই আছি।
মিনিটগুলো যেন
অচেনা পাড়ার বখরাগী কুকুর,
কোথাও একটু থামতে দেয় না।

কচিকাচাদের খেলাধুলো
কিম্বা আত্মবন্ধুদের আড্ডা
কতই টানুক,
সকালবেলার শিউলি
অথবা স্তব্ধ রাতের তেতার
হাতোয়াগুই ডাকুক কতুক
কাজের আড়ালে রাখা
রঙিন মায়ার মতো চিত্রার্পিত,
থামতে চাইলেই
আমার মাথার দিকে নামে ঘটের ঘুরি,
পড়িয়ে পড়লেই আমার এক পা উঠে যায়
চিতার ওপর।

প্রতিদিনের সূর্যকে তাই আমার এই
নতুন জায়গা থেকে দেখা।

ভাইরে

রাম বসু

ভাইরে, তুই পরবী, আমি পরবী, মানবগরবো পরবী
তবে দুজনাতে বড় ঘরে সবাইরে আকুল নিতে পারিস নে?

শেষ কথা তো কেউ জানে না, তুই না, আমি না, ওরাও না
লক্ষ হাজার বছরের এই সভ্যতা চলতে চলতে তবু তো এখানে এল
অথবা তারও আগে, তিন শ' মিলিয়ন বছর আগের কথা বল
ভুল করে ভুল পথের, ঠেকে শিখে এখানে তো এল তবু
কিন্তু একই ভুল বারবার করে না ভাই, চক্রাকারে একই
ভুল না করে, ভাইরে।

ভাইরে আমাদের গা সওয়া মাটি দিয়ে সাজ করা পরকার
বড় অজানা রয়েছে, মড়া কাঁটা দিয়ে একটা কাঁটাতে হবে
আর নিজেকে ভুলে গিয়ে ছেয়ে বসুধেপে আকাশ যা তো মেলি
কালো গোল সাদা হলদে সবুজ চন্দ্র সব চাঁই পাবে
সৃজনের হিসাবে আনন্দ ভেরে শিরায় শিরায়, বেমানি তখন
পারাবতের পাখা উঠে টেউ-এর শিখর মতো হাততালি দেবে
আর এই সোনার জীবনটা দিয়ে-এর গুঁতোয় মানবের
দিকে ঠেলে দেবে

বসুধেপো ভাগ করে নিলে সবখানেতে পারবো
কেবল আমাদের একটু মানুষ হতে হবে
কেবল নিজেদের একটু কম ভালবাসতে হবে
কেবল আমাদের হতে হবে জল মাটি
যাওয়ার আকাশ—

কবেরো বলবে, রাম, কবিতা লিখতে বলেছি, জ্ঞান দিতে নয়
আমি বলবো, তোমাদের মিলিয়ে যাবি না, এটাই ভবিতব্য।

শেষ খেলা—শেষ রক্তপাত

অমিতাভ দাশগুপ্ত

মনে পড়ে?

অবিরাম অশ্বক্ষুর
মধ্যিম-রাতের রাঠি
অরণ্যের রক্ত-চেনা শার্শনাইন
চিতা আর সম্বরের জলজে-জাটানো তাক
নীলার ঘুমের মত অন্ধকার
হাতে হাত ঘষে বুকে
চুমুর ছোবল···
মনে পড়ে?

আবার অরুণা চাই
ঘাইহার-অরুণা চাই আজ
কিরাত, তোমাকে আমি মুখোমুখি পেতে চাই
বন আগুনের মত জ্বলবে ওঠে যামিনী-বিলাস
আজ শেষ খেলা হোক
বৃষ্টি হোক আকাশ কাটিয়ে

ছেড়ে যাবো,
তোমার সামনে আমি কবে ছিলাম তরুণ নিষাদ
আমাদের
কারো চোখে ক্ষমা নেই প্রেম নেই
বাতাসের সাহসের অনটন নেই
কলা-গাছ ভেঙে ওঠে
অরণ্যের ধর্ষিতাদের কান্নায়
উড়ে আসে অজস্র শকুন
হাজার জোনাকি জ্বালে বনভূমি
এসো, হাতে হাত রাখি
ট্রিগারে আঙুল
রাতদুপুরে বেজে ওঠে শুধু গানবোমা
নিস্তব্ধে দাঁড়াও মুখোমুখি
ও নিষাদ নবীন নিষাদ
অর্জুন গাছের নীচে শেষ খেলা হোক আজ।
শেষ রক্তপাত।

উপকথার আর একটি

সিদ্ধেশ্বর সেন

ঠিক
যেন যেখানে যবের সেখানেই এসে,হ'ল
দিক ভুল ?

তেজী ঘোড়া

তেপান্তর
পেরোতে না পেরোতেই
রাত
নিশুত ?
—তার বন

তেজী ঘোড়া
তিন কুমার

বুড়ো
বট
যার ঝুরি
নেমে গেছে

মাটি
কুরে কুরে
বসানো থাবা. যেন
থাকানো নখ

তার ধারে
কবেকার গড়ের ভাঙা থামের মত
জমাট
আঁধার

ছটন্ত
খরগুলো এখানে থমকে
দাঁড়িয়ে, খালি
পা
ঠোকে

আর,
ঝুলন্ত ডালে
লটকে থাকে

কতশত থমকে-যাওয়া অভিযান. আর
শতশত মানা

সে সব
কথাই তো জানা, বলে ওঠে, রাতচরা
ব্যাপসী-ব্যাপসা

পাতা
সরে
রাত
বাড়ে

জেগে-জেগে
জেনে
নিতে পারে নাকি

পক্ষচক্র ঘুঁড়ে

বেরিয়ে আসার
নিশানা

তিন কুমার
তেজী ঘোড়া

যে সব দিকে ক্রমেই
আকাশ ফর্সা

আর,
যে সব দিকে ক্রমেই
হাওয়ার
মোড়-ফেরা

পা-ঠোকা, ওদ্দি
ঘামিয়ে

পা'য়ে লাগিয়ে
ছুটে-ছুটে ছোটা

কিম্বা. দম রেখে,
ওড়ার লাফ

পিঠে
তুলে নিয়ে দিগ্বিজয়ের
সওয়ার

তেজী ঘোড়া,
স্বপ্নে-পার হ'য়ে-যাওয়া
আমার পক্ষীরাজ ।।

আষাঢ়-শ্রাবণে

অরূপ সান্যাল

অন্ধকারে সমস্ত পথ আকাশভাঙা বৃষ্টিধারা
গা-ঘাঁচিয়ে চলার রাস্তা এদিক ওদিক কম বোঝা
শিহুরে কাঁপন মাতাল ঘিরে বনবেদনার ঘোর মাতোয়ারা
ছেলে চলে স্পষ্ট লাইটে হঠাৎ হঠাৎ ঝিলার খোঁজা
তেমনি পথে বাজ বিজলী চোখ-ধাঁধানো তান যা বাঁধে
নাবলা জলে বন্যা পায়ে, সাঁচ বিঁধেছে বৃষ্টি গায়ে।

নামছো নামো আকাশ ফুঁড়ে প্রবল তুফানেরা ধারা—
মজা তোমার কদমী ডাঙ, বাদু-বিবির বাহারী বাগ্
একটি ফোঁটার তলায় আদুর সবুজ ঘাসে এক পা খাড়া
আবার তুফানেরা বৃষ্টি যাও ফোঁটা যে বলাকে মোহাগ—
ফেলে আসার ঘরের কথায় বাঁধন করে বিজলী বাঁকা
নদীর পড়নেও হাত ছাড়েনা তোর আকাশের হৃদ পাতাকা।

পরপাতের সব মন্ত্রম আমার পেয়ে, তারও পেল
আমি যে এই ভূতবিহীন, তিনি ছিলেন রাজেন্দ্রানী—
দুরন্ত বিশ্বে, জানি পথ রাজপাটাই আমার ছেলো
এক বৃষ্টিই ঘরে ফিরেছে ঘড় কাঠমোর ঘুড়িখানে,
সবাই মতো নইলে আমেই ভাগ্যেতিহের ছেলাম বাড়ি
সবাই কি চলতা হাঁটে, কেউ বলে চল ফেরবে গাড়ি?।

সমস্ত পথ ওরে আমারই, সমস্ত পথ ঘর কি বাড়িল,
ওরে আমার পথের কাঁটা, ওরে আমার পথের সাকো
তুমি সবলা সকাল সন্ধে, তুমি রবের চোখ জুড়া নীল
এমনি আমরা সহবিহারী দিনগুলিকে ফিরতে থাকে
নামবে নামবে ঘন মেঘের আকাশ ভাঙা বৃষ্টি ধারা
সমস্ত পথ ঘন মেঘের পা ছুঁয়ে এই বৃষ্টি ধারা॥

স্মৃতি চিন্তা অন্ধকার থেকে

চিত্র ঘোষ

চিক চিক ঘরানুলো কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না :
ছোটের গাড়িতে যারা আসবে বলে চিঠি লিখেছিল
তাদের অবাধ্য দুশ্চিন্তা, উৎসব, ছোটাছুটি।
এরকম আর্তস্বরে ডাকার মানে মাঝে আছে।
আমাকে তো এখনও জানে না কিছু।
শুধু একটা নামের তালিকা আছে
টাঙানো রয়েছে।
তাছাড়া আর কোনো খবর নেই।

একদম ভেতর থেকে যারা বাইরে ছিটকে পড়েছিল
ভেতরে ভেতরে যারা ভীষণ অসম
মাথার মা খুঁজে চোখ মেয়ে
অচেতন, আজন্ম, রহস্য
হয়তো ক্যান্সের বাঁধা হাসপাতালে মেয়ে
আরা অবে স্মৃতি, চিন্তা অন্ধকার থেকে
উঠে আসবে, চিনতে পারবে তাদের আপনজন
হাত বাড়িয়ে দেবে নতুন গল্পের বই
ফলফলারির ঠোঙা, ছাপ্পের পরম খুব।

স্টেশন

গণেশ বসু

এসেছিলে তুমি হাতে হাত দিয়ে এইখানে
আশ্বিন-বাতাসে ছিল ঈষৎ কোমলতা,
হৃদয়ের তারুণ্যে চেতনায় বিহ্বলতা
ছাপা চারদিকে, সব অন্যমনস্ক এইখানে।

নিজেদেরকার ফেলে রেখে সেদিন একা একা
ঘুরে চলে যাও মাহেন্দ্রক্ষণের সন্ধানে,
তাও বিশ্বিত রূপে ছায়ার নির্মাণে
স্টেশন আঁধারে চলে গেলে ঘরে একা একা।

আর কে শোনাবে আমি আঁকড়ে অসহায়তা?
ঘুরছায় অন্ধ চাঁদ চাঁদ চোখে জলাবে কি?
বিশ্বিত বিবর মেঘে মেঘে শুধু ভরবে কি।
রেখে গেলে যারা রূপে রাতের অসহায়তা।

স্টেশন আঁধারে কেন চলে যাও একা একা?

অর্জুন! অর্জুন!

তুলসী মুখোপাধ্যায়

পড়ন্ত পড়ন্তের মতো
এক দীর্ঘদেহী শমীবৃক্ষ
একদা আমার করতলে তুলে দিয়েছিল
গাণ্ডীব এবং অক্ষয় তূণীর
মাথায় হাত রেখে বলেছিল—
যাও, জয়ী হবে।
তদবধি মহাভারত থেকে
অর্জুন যেন নেমে এল আমার পায়ের
কুরুক্ষেত্র স্থির লক্ষ্য
যুদ্ধ আর প্রতিজ্ঞা আমার।

অন্ধকার ঘেঁটে ঘেঁটে
তখন যে পথ কাটিয়ে
ফেলে এলাম কুরুক্ষেত্র
ছুঁড়ে দিলাম গাণ্ডীব এবং অক্ষয় তূণীর
এবং এখন—
মহাজনী গদীর নীচে
হাটু থেকে দিবারাত্রি নখর পড়ছে
বোতাম টিপলেই
সেবাদাসীর মতো আমার ধরণী
দিবারাত্রি হাতে ঘুরছে আর্থিক চুম্বক।

তবু ঘোলা ঘোলা রাত নির্বাধে
হাঁচার ঘুমের মধ্যে পাগলাঘণ্টি বেজে ওঠে
দুঃশিশ্চন্তা ঘরটা ঘরে
অন্ধকার অন্ধকের মতো
কারা যেন ডেকে ওঠে—অর্জুন। অর্জুন।

স্মৃতি কুড়িয়ে

রণজিৎকুমার সেন

কোনোদিন যদি সাপুইসৈকতে ঝিনুকে কুড়িয়ে থাকি,
অথবা কোনো গ্রীষ্মের প্রত্যূষে টুসটুসে ঝরে-পড়া ধানের
কিম্বা যদি কোনো ভালোবাসেবার সন্ধ্যায় কুড়িয়ে থাকি
ধন বনের আড়াল থেকে অজস্র বসন্তচাঁদ আর,
তবে তার মাধবীতলার মাতলামী লেগে আছে আমার হৃদয়ে
যার অনুরণন বাজে জীবন-সায়াহ্নের সেতারে।

আজ এই মুহূর্তে যখন কেবল লোকের কল্পনা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি,
যখন চোখের জ্যোতিতে দূরের সব অপসৃত,
তখন ঝিরিঝিরি বৃষ্টির সন্ধ্যায়
নিরালা বন্ধুজনে ঘিরে ঊনতে ভালো লাগে—
কোনোদিন ছিলেম আমি প্রভাতের ঝলমল রৌদ্রের মতো···
অথবা এক ঝলক বাঁধনহারা হাওয়ার মতো দুরন্ত কিশোর।
হাতে নাগ নিয়ে কলার ভেলা ভাসাতাম বিলের জলে,
ডুবে আসতাম গন্ধে গন্ধে শাপলা আর পানিফল,
রোদের আর কলমুচা কুড়িয়ে সেঁধে তুলতাম মালা,
তুঁতচড়ের ডালে বসে বাঁশীতে ধরতাম ঈমন,
সাহনের ঘোলা ঘোলা রাধাচূড়া তখন ঝুঁঝিছে মত্ত-পাগল।

সৌরভের কোনো এক মাতালী মুহূর্তে যদি
মদালোক ভরে কিশোরী ধরিত্রীর হাসি কুড়িয়ে থাকি,
যদি একটিও হাসফুলের অনুরাগ আমাকে মাতাল ক'রে থাকে,
তবে সেই কোনোদিনের এবং কোনো একদিনের
লাবণী জড়ান লোগে থাকুক আমার স্বপ্নবেলায় চোখে ;
সেই স্মৃতি কুড়িয়ে অজস্র অনুরাগের মালা সেঁধে সেঁধে
আমি পরিয়ে দিয়ে যাবো আমার ভাগ্যবিধাতাকে—
যিনি আপন হাতে নানা মূর্তি গড়তে গড়তে
কিসু রঙ আর কল্পনা দিয়ে আমাকে কবি ক'রে দিয়েছেন।

গোধূলি অথবা ভোর

শিবকন্যু পাল

ভোর বেলাছিল ঘটে,
ছিল শিশিরের মতি ;
অন্ধকারের ঘরে
কমল অন্ধদ্যুতি।

সোধূলি গগনে মেঘে
তবে ঢেকেছিল তারা ?
চেয়ে দেখি নেই লেগে
মেয়াদের ঘনঘোর।
ঘনে ঘেছে চন্দ্রবালি
ইঁটপাটি শব্দে গাঁথা ;
আমার গৃহস্থালী
তোমারই মতন গাঙ্গল।

ঝলোছিলে ঘটে তুমি
ছড়ায়ে পরম কণা :
গগনে সপ্তর্ষিমি
সঞ্চিল আভাবৃত্ত।

সেখানেই সন্ধেবেলা
মিলে যায় উষার,
কিংবদন্তি নয়
সোধূলি অথবা ভোর।

ভ্রান্তিই চলচ্চিত্র

সত্য গুহ

ভ্রান্তিই চলচ্চিত্র উৎসারিত জনতা-নির্ঝরে
ভ্রান্তি দর্শনেই পড়ে পাথরে পাঁচ কিল
'লাস্তর মহাবস্তু' জনাদশের অন্ধজনে মতীর বিষয়ে
আলো যান ; হবে হাসি মনে মনে বিলম্ব বিস্ময়ে

বিচিত্রবীর্যের বংশ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুই আজ তুলিছেন
গাঁর ঘরে অধিনকান্ত নোঙ্গরের সঙ্গে বাঁধে উঁচু মহলের

এইখানে স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গ প্রথা
শুধুমাত্র বাঁচার টিকা ভক্ষণেচ্ছা ভোজনেলা কথা
শূন্য আকাশে ঘরে থাকেনা প্রাণের চিহ্ন
বর্ণাঢ্য পাহাড়ে চাপে পরাজয়ী নির্বাচিত ও মহতের ঋণ

আর পালটির ঘর ফিরে ফিরে চরা একই বাঁধা পঙ্কুতের
আকাশে অজ্ঞান বিষ, জেনে শুনে পান করে নিব পরমাণু মনুষ্য ধ্বংস

চারদিকে কুরুক্ষেত্র ; ভাঙা চাকা, নদী, রক্ত—পাণ্ডুলিপি হর্ষের বিষয়ে
যারা কোরব তারা থাকব হে, এ উৎপন্ন কিসের প্রত্যয়ে
কোন্ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ? কোন্ মহাবস্তু জনলো পাঞ্চালে ? শ্রবণে ?
মহাভারতের কথা এই শুনো অমৃত সমান ?

প্রতিশ্রুতি আর নিত্য প্রতিশ্রুতি ভাঃ আর অভিমন্যু কর্ণবধ পালা
কুরুক্ষেত্র ঘরে ফেরে নপুংসক অশ্বত্থ ও গান্ধারীর বুকফাটা জ্বালা ॥

বেতাল জাগে, মা

শুভ বসু

এমন যজ্ঞের প্রতীক্ষায়ই প্রহর
জপালিকের তৃষ্ণা মিটে আগামে পারা শহর।

শালের একপাশে তার শমশম চুলোর গভীর
বিদ্রি আটে বর্ষার অমেথ্যা জলের অবতা
হা-করা মুখের ভল ফেরে
পাঁকুরে পাঁকুরে যায় হতাশ্বাস হাওয়ার অঞ্জলি
আতে ঘিরে অন্ধকূপ উপাদানে
পাক দিয়ে ঘিরে ঘাটে সুখী দাস মানুষের
ভাজহীন পাথরের মুখ।

হাতে তাকে ঘিরে ঘরে ভক্ষাভোজা অন্ধকার হয় অবীর অজানায়।
গালে হাত দিয়ে দেখে ভক্ষাভোজা অন্ধকার
ভীরুমন বাজ থাকে, এ ওকে নাড়িয়ে
ফিসফিস করে বলে "এরজন্যই ঘরে।
পৃথিবীর ধনা, আলো, জল
পৃথিবীর সমুদয় জনা চিন বরাদ্দ থাকে না।"

গমগম ঘরে যাকে অন্ধকারের গমগমা ; বরদালান, বাড়ি
'সুখ সুখ সুখ' বলে ঠাট্টা হেসে আকাশ আঠায়,
সেই সব
হঠাৎ টান টান বলে আকে যেন খোঁজে—
গভীর আঁধার লাগে ঝিলামে-ঝিলামে, বরাবর।

বেতাল জাগে বেতাল জাগে বেতাল জাগে, মা
গা-ঘমঘম শহর গাঁয়ে এটুকুই সান্ত্বনা ?

বোতাম হয়, কলমও হয়

রবেশ্বর হাজরা

এই চন্দনের বনে হিংসেরা থাকে কিরে যাও তুমি
এসে যাবে এই গাছে সাপ নেই, আর
বাঁশও চন্দন নয় তবু এর কাঠে
শিশুদের ধনু হয়—মৌকার গলুই হয়
বইয়ের আলমারি হয়
জানার বোতামও হতে পারে।

এখানেই যাবে পায় এই গাছ, এর
শিকড় মাটিতে যায়—ঘন ডালপালা
উত্তরে খড়িদে ছোটে ঈশানে নৈর্ঋতে
অনন্তেই ডগা ছোটে—এর জন্য শরীর
চন্দন লাগে না এসে যাবে
দেহকান্ত ভক্তিক্ত নয়।
এর চন্দন নয় এই গাছ, তবু এর কাঠে
ঘর-করা মাটু হয়
ভূলকাটা পালকি হয়
ঘটার আসবাব হয়
লেখার কলমও হতে পারে।

শিল্পী : নীতেশ রায়

তারবেরের মুখ দেখেছি

সৌরি ঘটক

বাঙালির ছেলেদের আড্ডা শুরু হয়, 'কি রে খবর কি' বলে। তারপর রাজনীতি, ফুটবল, ক্রিকেট, লটারি, পাচার জাইবুড়ো মেয়েদের স্বভাব-চরিত্র প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচনার পর হয়ত শেষ হয় এসে ভূতের গল্পে।

ক্লাবে, রেষ্টুরেন্টে, বাড়ির রোয়াকে, বৈঠকখানায় যেখানেই পাঁচজন বাঙালি ছেলে জোটে সেখানেই এরকম আড্ডা চলে। কোনো সিদ্ধান্তে না পৌঁছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনি নিরেজাল আড্ডা দিতে বোধহয় একমাত্র বাঙালিরাই পারে, হয়ত বা এটাই বাঙালির বাঙালিত্ব।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বর্ধমান-কাটোয়া রেলপথের বনকাপাশি স্টেশনে পরম মমতায় মিষ্টির দোকানে এমনি আড্ডা জমিয়েছে তিনটি যুবক। এদের বাড়ি মাইলখানেক দূরে গ্রামে। মফস্বল এলাকার গ্রামের ছেলেদের আড্ডা দেওয়ার সবচেয়ে প্রশস্ত জায়গা হল রেল স্টেশন। বিকেলবেলা এরাও বেড়াতে এসেছিল স্টেশনে তারপর সন্ধ্যার ট্রেন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড কালবৈশাখী। দিক্-বিদিক্ অন্ধকার করে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, কড়কড় করে মেঘ ডাকছে, কড়ের ঝাপটায় দোকানের খড়ের চালের বাঁশগুলো মড়মড় করে দুলে উঠছে। এরই ভেতর কাঠের বেঞ্চিতে বসে রসগোল্লার রসের চায়ের কাপ নিয়ে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে ওরা।

তিনজন যুবকের মধ্যে পাতলা ছিপছিপে শ্যামল ছেলেটির নাম অনিমেষ। সে কলকাতায় ডাক্তারি পড়ে। দ্বিতীয় জন সমীর পড়ে আইন। আর টকটকে ফর্সা মাথার কোঁকড়া চুল ইঞ্জিনিয়ারিং।

নানা বিষয়ে আলোচনার পর, ওরা এখন তর্ক করছে—'এদেশে শিক্ষিত ছেলেদের কোনো ভবিষ্যত আছে না নেই'-এ নিয়ে। অরুণাভ বলছে—'আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে চলে যাব যদি প্রাণে। সেখানে আবার কি ভগবানে এক একজন ইঞ্জিনিয়ারকে যা বেতন দেয় তা আমাদের দেশের দশটা ইঞ্জিনিয়ারের সমান। বুঝলি।'

তাকে সমর্থন করে অনিমেষ বলল—'ডাক্তারির ক্ষেত্রেও তাই। পাস করে আমি যদি কানাডা কি আমেরিকা য় একটা চাকরি নিয়ে যাই তাহলে গাড়ি বাড়ি সব হবে আমার। এদেশে পড়ে থেকে মার খেয়ে কি লাভ?'

সমীর কোনো কথা না বলে চুপচাপ সিগারেট টানতে টানতে তাকিয়ে রয়েছে বাইরের দিকে। প্রবল বৃষ্টিতে মাঠঘাট বন গ্রাম সব ঢাকা পড়ে গিয়েছে। ছাওয়ার কাপটায় ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ এসে নাকে লাগছে পরম মমতা এত তোপে বসে ঘলস্ত উনোনে এক কড়াই রসগোল্লা ফোটাচ্ছে অরুণাভ কথা বলতে বলতে ওকে একটু খোঁচা দিয়ে বলল—'তুই শালা পড়তে গেলি আইন। তোর শালার বাইরে যাওয়ার কোনো আশা নেই।'

সমীর গম্ভীরভাবে বলল—'আমি অন্য কিছু পড়লেও বিদেশে যেতাম না।'

—'কেন?'

—'আমি সুখে দুঃখে দেশের মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে চাই।'

অনিমেষ সঙ্গে সঙ্গে ওকে খোঁচা দিয়ে বলল—'ও। তুই তো আবার ছাত্র ইউনিয়ন করিস।'

সমীর বলল—'হ্যাঁ করি। কিন্তু সেটা কারণ নয়?"

অরুণাভ বলল—'তবে কারণ

বলল—'তোরা

দেখাচ্ছিস টাকা পয়সার দিক। কিন্তু আমাদের মত অনুন্নত দেশের মানুষদের দেশপ্রেমও থাকা দরকার।'

—'ভাগ বেটা। দেশপ্রেম। শালা ছেলেদের মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে শিওন পর্যন্ত সবাই চোর সেখানে আবার দেশপ্রেম। শালা টাকা লুটছে না কে—' অরুণাভ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সঙ্গে ধমক দিল সমীরকে।

কিন্তু সমীর এতে উত্তেজিত হল না। সে শান্ত গলায় বলল—'টাকা লুটছে না দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ যারা বাস করছে দারিদ্র্য-সীমার নিচে—'

অরুণাভ ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল—'ইউনিয়নের বক্তৃতা মারবি না আমাদের কাছে। গরিবের ওপর তার কত দরদ আমার জানা আছে। ও সব ভোটের সময় বলবি।'

সমীর বলল—'এখানে আর ভোট হচ্ছে না।'

—'তবে ও সব বড় বড় কথা বলছিস কেন?'

সমীর বলল—'কিছুই বড় কথা বলি নি। বলছি বিদেশে গিয়ে নিজের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়ানোর চেয়ে অনেক বড় কাজ হল নিজের দেশকে জানা, নিজের দেশকে ভালবাসা।'

অনিমেষ বলল—'ওটা আমরা তোকে ভার দিলাম। তুই শালা আমাদের হয়ে দেশকে দেখ, ভালবাস। আমরা শালা জীবনে পয়সা রোজগার করতে চাই। যেখানে দুটো পয়সা বেশি পাব সেখানেই যাব।'

সমীর বলল—'চলে যা। কেউ তো আর তোদের পায়ে ধরে আটকায় নি। তোরা থাকলেও দেশ চলবে, না থাকলেও চলবে।'

—'চলুক দেশ। গড়গড় করে চলুক। তুই শালা ভোটে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী হয়ে চালা। আমরা ও লাইনে নেই। আমাদের শালা টাকা চাই, পয়সা চাই, স্ফূর্তি চাই, আনন্দ চাই। জীবনকে শালা পুরোপুরি ভোগ করতে চাই।'

সমীর চুপ করে রইল। ওরা আবার একটা করে সিগারেট ধরিয়ে বলল—'আজকাল শালা দেশ দেশ করে কথা বলা একটা ফ্যাসান হয়েছে। এর আগে ছিল গ্রাম। তখন বলত গ্রামে যাও, গ্রামকে চেন, গ্রামের উন্নতি কর; কচুরি পানা তোল, রাস্তায় মাটি দাও এইসব। আরে শালা গ্রামে গেলেই কি গ্রামকে চেনা যায়। তাহলে এদেশের এ বার আনা লোক গ্রামে বাস করে তারা সব তো গ্রাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হয়ে যেত।'

সমীর বলল—'কোনোখানে যাওয়াটা বড় কথা নয়। আসল কথা হল দরদ দিয়ে বোঝার মতো মন, দেখার মতো চোখ।'

অরুণাভ ওর কথার মাঝখানে বিদ্রূপ করে বলে উঠল—'তোমার তো শালা চোখ মন সব আছে! তুমি দেখেছ দেশকে?'

সমীর বলল—'হ্যাঁ। দেখেছি।'

অনিমেষ বলল—'বেশ বলত কি দেখেছিস। শালা কলকাতার বাইরে তো তুই তারমণ্ডহারবারও যাস নি। কি দেখেছিস দেশের বল।'

সমীর একটু জিদ করে বলল—'আমি দেখেছি আমার ভারতবর্ষকে।'

—'ভা-র-ত-বর্ষকে?'

—'হ্যাঁ। শুনবি?'

—'শুনব বল? মরব্বা বুড়ো আর এক কাপ করে চা দাও তো?'

ও কোণ থেকে ময়রা জবাব দিল—'একটু দেরি হবে গো। রসগোল্লার কড়াইটা নামিয়ে উঠতে পারব না।'

—'বেশ হলেই দিও?'

ওরা সব মড়েচড়ে বসল।

সমীর হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে চুপ করে বাইরের জল-কাদার দিকে তাকিয়ে কি একটু ভাবল, তারপর আস্তে আস্তে শুরু করল—'বছর তিনেক আগেকার কথা। আমার বোনের একটা পাত্রের খোঁজ-খবর নিতে যেতে হবে মন্নারপুর বর্ধমানে রাত এগারটার প্যাসেঞ্জারে চড়েছি। ট্রেনটা রাত তিনটেয় মন্নারপুর পৌঁছাবে বাকি রাতটুকু স্টেশনে কাটিয়ে সকালবেলা গ্রামে যাব, এই হল মতলব।

গাড়ির যে কামরাটায় উঠলাম সেটা একটা ছোট কামরা এক ভদ্রলোক নেমে যাওয়াতে উঠেই জানালার ধারে কোণে একটা সিট পেলাম।

একটু পরেই গাড়ি ছাড়ল। স্টেশনের আলো, প্লাটফরমের কলরব, যাত্রীদের চেঁচামেচি, সব মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে। অন্ধকার গ্রাম বাংলার ভেতর দিয়ে ঝিকঝিক ঝিকঝিক করে চলতে লাগল আমাদের গাড়ি।

সব কিছু সুস্থির হওয়ার পর একটু নজর দিলাম একরাতের সহযাত্রীদের দিকে। ওপরে গাড়ির মাঝখানে আলোর ঢাকনির মধ্যে একটা বাল্ব জ্বলছে টিমটিম করে। সেই আলোয় মোটামুটি দেখা যাচ্ছে গাড়ির ভেতরটা।

তাকিয়ে দেখি আমার পাশেই বসেছেন প্যান্ট সার্ট পরা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। কালো রঙ, মাথায়

ঝাঁচোপাকা চুল, চোখে চশমা। ভদ্রলোকের কোলের ওপর একটা কিড্‌স্ ব্যাগ। সেটার ওপর হাত দুটো রেখে ইতিমধ্যেই ঢুলতে শুরু করেছেন তিনি। ঢুলতে ঢুলতে এক একবার মাথাটা ঝুঁকে পড়ছে কোলের ওপর। তাঁর ঝাঁকানি খেয়ে ভদ্রলোক মাথাটা তুলে ঘোলাটে চোখে একবার চারধার দেখে নিয়ে আবার চোখ বুজছেন।

ভদ্রলোকের ওধারে বসেছেন দুজন বৃদ্ধ। পরে ময়লা পাঞ্জাবি। একজনের চোখে নিকেলের চশমা। পায়ে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অন্যজনের মাথায় বড় টিকি। কথা শুনে বুঝলাম দুজনেই মামলাবাজ। টুকরো টুকরো যে শব্দগুলো কানে এসে লাগছে সেগুলো হল—পরচা, খাস নং, খতিয়ান নং, ফি, উকিল, মহুরি এইসব।

তাদের ওধারে বাকি বেঞ্চিটা জুড়ে রয়েছেন এক দরিদ্র মধ্যবিত্ত দম্পতি। দুধারে বসেছেন স্বামী-স্ত্রী আর মাঝখানে তিনটি ছেলেমেয়ে এ ওর ঘাড়ে পা তুলে, এ ওর পেটে মাথা দিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

আমার সামনে গোটা বেঞ্চটা জুড়ে বসেছে এক বহুল মধ্যবিত্ত পরিবার। কাঠের বেঞ্চের ওপর ফুলতোলা বেড কভার বিছিয়েছে। তার ওপর বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছে দুটি ছেলে আর মেয়ে। সুসজ্জিতা ভদ্রমহিলা বসেছেন কোণের দিকে হেলান দিয়ে, আর ভদ্রলোক বসেছেন ওপাশে। বেঞ্চের নিচে নামানো রয়েছে তাদের সুটকেশ, জলের ফ্লাস্ক, বেডের মুড়ি এইসব।

ভদ্রমহিলার ঠিক ওপাশেই বসেছেন ঠিক তাঁরই মতো আর একটি সুসজ্জিতা ভদ্রমহিলা। তবে তিনি গোটা বেঞ্চটা দখল করেন নি। মাঝখানে খানিকটা ফাঁক রয়েছে। বোধহয় তাঁর ছেলেরা রয়েছে। তার ওধারে বসেছেন তাঁর স্বামী। তাঁর পাশে এক বৃদ্ধ দম্পতি।

আর ওপাশের জানলার ধারে বেঞ্চের কোণায় বসেছে এক মোটা মাড়োয়ারি ভদ্রলোক। তার ঠিক পাশেই গেরুয়া আলখাল্লা গায়ে এক সাধু। তার পাশে গোটা প্যান্ট আর হাওয়াই সার্ট পরা তিনটি যুবক।

বেঞ্চের যাত্রীরা বাদে ওধারে পায়খানার দরজার পাশে মেঝের ওপর বসে রয়েছে এক আদিবাসী পরিবার। বুড়ো মা বাবা আর দুটি জোয়ান ছেলে। তাদের সামনে নামানো একটা ঝুড়ি। তার ভেতর দুটো কোদাল আর একটা গাঁইতি। বোধহয় কোনোখানে মাটি কাটার কাজ করতে গিয়েছিল কিনা যাচ্ছে। আর তাদেরই কাছে বসে রয়েছে একজন গ্রাম্য ভিক্ষুক। হাতে একতারা, কাঁধে ভিক্ষের ঝোলা।

ঘটাঙ ঘট্, ঘট্ ঘট্ শব্দ তুলে চলছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। জানালা দিয়ে চোখে পড়ছে নিশুতি রাতের নির্জন মাঠ। তালগাছগুলো লম্বা ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। খোপগাড়গুলোকে মনে হচ্ছে চাদর মুড়ি দিয়ে একদল বুড়ো বসে রয়েছে, খেজুর গাছের লম্বা পাতাগুলো নড়ছে, মনে হচ্ছে যেন কেউ ভয় দেখাবার জন্যে হাত দোলাচ্ছে। দূরে-অনেক-দূরে কোনো একটা গ্রামে টিমটিম করে একটা আলো জ্বলছে, কোথাও বা শূন্য মাঠে তরল অন্ধকার পুকুরের জলের মত স্থির হয়ে রয়েছে।

গাড়ি একটু পর-পরই একটা করে ছোট স্টেশনে থামছে। হাতে জলের বালতি নিয়ে একটা লোক হেঁকে যাচ্ছে 'পানি পাঁড়ে', নীল জামা গায়ে দেওয়া স্টেশন মাস্টার গার্ডের গাড়ির দিকে যাচ্ছে। দু চারজন যাত্রী ওঠা-নামা করছে। তারপর গার্ডের হুইসেল বাজার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনে তীক্ষ্ণ বাঁশি বাজিয়ে, ভোঁস ভোঁস করে ধোঁয়া ছেড়ে গাড়ি আবার চলতে শুরু করছে।

ঘুমোবার কোনো উপায় নেই, তাই বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলাম। হঠাৎ নারী কণ্ঠের অনুচ্চ আলাপে কান খাড়া করে ফিরে তাকালাম। আমার ঠিক সামনের মহিলার সঙ্গে তার ওপাশের মহিলার আলাপ চলছে

আমার সামনের মহিলাটি বলছে —'ওনার সকালবেলাতেই একটা জরুরী কাজ আছে। তাই এইভাবে যেতে হচ্ছে। নইলে মেলট্রেনে ফার্স্টক্লাস ছাড়া উনি চড়েন না।

ওপাশের মহিলাটি শুনে একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল—'ট্রেন আজকাল যা হয়েছে তাতে ওঁর ছেলে ট্রেনে যাতায়াত একেবারেই পছন্দ করে না। কোম্পানির দুখানা গাড়ি পায় সে। সেই গাড়িতেই উনি দিল্লী জালন্ধর পর্যন্ত ঘুরেছেন।'

ওপাশের ভদ্রমহিলা ন্যাং খেয়ে একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল—'তাছাড়া গরমের দিনে ট্রেনে যাতায়াত করতে ওঁর সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হয় জলের। ফ্রিজের জল ছাড়া উনি একেবারে খেতে পারেন না।'

ওপাশের ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে

বললেন, —'তাঁর ছেলেও গরম একেবারে সহ্য করতে পারে না। সেজন্য সামনের বছর বাড়িটা এয়ার-কণ্ডিশন করিয়ে নেবে বলেছে।'

এ ভদ্রমহিলা আবার ন্যাং খেলেন। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ভেবে বললেন—'তাঁর বাপের বাড়িও শিগ্‌গির এয়ারকণ্ডিশন হবে। তাঁর এক ভাইপো জার্মানী গিয়ে মেম বিয়ে করে এনেছে তার জন্যেই করতে হবে।'

বেশ মজা লাগছে কথাগুলো শুনতে। যুদ্ধ মাস্তিত করিব লড়াই যেন। দুজনে হাত নেড়ে মুখ ঘুরিয়ে উঠছে। কথা বলছে, ঠুকিতে টুং টাং শব্দ আর কথাগুলো মিলে মিশছে অপরের মনস্তলে।

ওপাশের মহিলাটি এখন জার্মান বৌ-এর জবাবে কি বলা যায় ভাবছেন ফলে একটু বিরতি এসেছে দু'পক্ষের কথায়।

ওঁদের স্বামীদের দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁরা দু'জন তখন দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চাপা গলায় আলোচনা করছেন।

ওধারে জানালার ধারের দেরুয়া-পরা সাধু এদিকের বৃদ্ধ দম্পতিকে ভগবান তত্ত্ব বোঝাচ্ছে—'আজকালকার মানুষ ধর্ম মানে না। ভগবানে ভক্তি করে না। আচার নিয়ম পালন করে না বলেই সংসারে এত দুঃখ কষ্ট।'

বৃদ্ধ দম্পতি পরম বিনীতভাবে ঘাড় নেড়ে সাধুর কথায় সায় দিচ্ছে। আর ঝুঁড়িওয়ালা মাড়োয়ারীটি থেকে থেকে মাথা নেড়ে বলছে— 'সাচ্ বাত। ঠিক বাত। আচ্ছা বাত।'

তাদের ওপাশের তরুণ তিনটির একমাত্র কথা হল অ্যাকেয়ার্স। শিখার অ্যাকেয়ার্স। কাজলের অ্যাকেয়ার্স। রেবার অ্যাকেয়ার্স। কথার সঙ্গে তারা পরস্পরের গায়ে চিমটি কাটছে। খিল খিল করে হেসে উঠছে। মাঝে মাঝে সিগারেট ধরাচ্ছে আর সমানে ঐ অ্যাকেয়ার্স নিয়েই আলোচনা করছে।

এধারে আমার পাশের ভদ্রলোকটি ঘুমের ঘোরে ঝুঁকে পড়েই মাঝে মাঝে নাক ডাকাচ্ছে।

তার ওধারের মহিলাটি মাঝে মাঝে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলছে—'উঃ কি ছারপোকা গাড়িতে। বসা যায় না। ছেলেদের জোর সেব করে দিল।'

আর তদিকে ধরনার ওপাশে সেই আদিবাসী পরিবারটি বসে আছে পাথরের মূর্তির মতো।

একটা ছোট্ট স্টেশনে গাড়ি থামল। মালপত্তর ভদ্রলোক দু'জন নেমে গেল। বেঞ্চে একটু জায়গা হল। ওপাশের ভদ্রমহিলা একটু সরে এসে ছেলেমেয়ে তিনটিকে টেনে ছেঁচড়ে একটু ফাঁক করে শুইয়ে দিল।

ততক্ষণে কিক্‌কিক্ করে গাড়ি আবার চলতে শুরু করেছে। আমার সামনের ভদ্রমহিলা দেখি ফের আক্রমণের মুখে পড়েছে। ওপাশের ভদ্রমহিলা তাকে শোনাচ্ছে—'বাপের আমলে ফরিদপুরে তাদের কি বিরাট জমিদারি ছিল তার কাহিনী।'

ওধারে সেই মোটা মাড়োয়ারী নিজেই এবার বৃদ্ধ দম্পতিকে ভগবানের ক্ষমতা বোঝাচ্ছে—'দো তিন বরষ আগাড়ি হামারা তিনঠো চিন তেল পুলিশ সিজ কর দিয়া। তো হাম কেয়া কিয়া? সিধা রাধা-কিষণ মিট কা মন্দিরমে যা কে এক হাজার রুপেয়াকা পূজা ডাল দিয়া। উসকো বাদ সব চিজ কিষণজিকা মেহেরবানিসে ছোড় দিয়া। সি'লুর লেকর কপাল মে লাগাকে দারোগা কা পাস গিয়া। তব পাঁচসো রুপেয়ামে মকদ্দমা খতম হো গিয়া।'

এমনি সব কথাবার্তা চলছে এমন সময় পাশখানার পাশে দেওয়ালে হেলান দেওয়া গ্রাম্য ভিখারীটি তার একতারাটি হাতে তুলে নিয়ে টং টং করে সজোরে গোটা তিনচার টঙ্কার দিল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল গোটা কামরাটা। কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল, সবাই মুখ ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে। কিন্তু ভিখারিটি কোন কিছু ভ্রুক্ষেপ না করে মাথাটা একপাশে কাত করে হেলিয়ে চোখ বুঁজে একতারার টুং টং ধ্বনী তুলে অসম্ভব মিষ্টিসুরে চাপা গলায় গান শুরু করল :

'ওরে নিঠুর পরবী
তুই কি ফুল ফোটাবি
বাস ছোটাবি
সবুর বিহনে—'

কামরার পরিবেশটা একেবারে বদলে গিয়েছে। সবাই চুপ করে তাকিয়ে আছে ভিখারীর মুখের দিকে। এইরকম একটা নোংরা লোকের এত মিষ্টি গলা।

সুরটা যেন একটা সুন্দর স্বপ্নের মতো দুলছে কামরার ভেতর। ভিখারিটা গাইছে :

দেখ না আমার পরম গুরু সাঁই
যুগে যুগে কুসুম ফোটায়
তাড়াহুড়া নাই
ও তোর লোভ প্রবৃত্তি
পাবি যত
উপায় কি তাবিস মনে।'

নির্জন রাতে চলমান গাড়ির ঘুমুনির সঙ্গে মিশে অদ্ভুত লাগছে গানটা।

কিন্তু ভিখারিটা শেষ করতে পারল না গান। তার আগেই আমার সামনের ভদ্রমহিলা গলা বাড়িয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল :

"আমি যে জলসাঘরে' গানটা জান।"

ভিখারি একটু চুপ করে থেকে 'না মা আমরা আউল বাউল লোক। ওসব গান জানি না।'

এরপর কিন্তু সে আর গাইল না। খানিকক্ষণ একতারাটা টুং টুং করে বাজাল তার পর সেটা নামিয়ে রাখল পাশে।

ইতিমধ্যে গাড়ি একটা স্টেশনে এসে থামল। কামরায় নেমে যাওয়ার কেউ ছিল না। কিন্তু হঠাৎ বাইরে থেকে দরজাখুলে চারজন যুবক ধড়মুড় করে উঠে পড়ল গাড়ির ভেতর।

যুবক চারজনই সমবয়সী। পরনে চোঙা প্যান্ট, গায়ে হাওয়াই সার্ট, পায়ে রবারের চপ্পল, কাঁধে ঝোলা।

হঠাৎ এই গভীর রাতে চারজন অচেনা যুবক কামরাতে ওঠায় সবাই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাল।

কিন্তু যুবক চারজন গাড়ির যাত্রী-দের দিকে কোনরকম ভ্রুক্ষেপ না করে দরজার দোড়ায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে আলোচনা শুরু করল—'এত রাতে না গেলেই হতো। বলেছিলাম কাল সকালে যাব।'

'সকালে দশটার আগে ট্রেন আছে নাকি?'

'দশটার ট্রেনে গেলেই হতো। রাত জাগতে হত না।'

তাদের আলোচনা শুনে সবাই নিশ্চিন্ত হল যে এরা নিশ্চয় সাধারণ ছেলে এরা।

এক মিনিট থেমে ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। তারপর সেই গাড়িটা প্লাটফরম ছাড়িয়েছে অমনি ফুলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সাপ।

যুবক চারটি দরজাটা বন্ধ করে দিল তারপর একজন মাঝখানের বেঞ্চের কোণে দাঁড়িয়ে কোলার ভেতর থেকে একটা রিভলবার বের করে তুলে চিৎকার করে উঠল, 'চোপ। কেউ কোন শব্দ করো না। যে যেখানে আছ চুপ করে বসে থাক।'

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর দু'জন যুবক কোমর থেকে দুটো ঝকঝকে ধারাল ছোরা বের করে হাতে তুলে ঢুকে গেল বেঞ্চের মাঝখানে। আর চতুর্থ যুবকটি গিয়ে দাঁড়াল এমার্জেন্সি চেনের নিচে, যাতে কেউ চেন টানতে না পারে।

পলকের মধ্যে ঘটে গেল সব কিছু। প্রথমে গাড়ির সবাই হতভম্ব। তারপরই মেয়ে কণ্ঠের একটা চিৎকার, 'বাঁচাও' সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারধারীর ধমক—'চোপ। শব্দ করলেই গুলি করে দেব।' সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা আতঙ্কের শিহরণ আর অখণ্ড নীরবতা।

পর মুহূর্তেই দু'পাশের দুই বেঞ্চের কোণে ছোরা হাতে যুবকদের আদেশ—'যার যা আছে দিয়ে দিন তাড়াতাড়ি। এক মিনিটও দেরি করবেন না। দিয়ে দিন।'

আমার সামনের ভদ্রমহিলার বুকের সামনে নাচছে ছোরাটা, 'গয়নাগুলো খুলে দিন, তাড়াতাড়ি।'

—'দিচ্ছি, দিচ্ছি'—আতঙ্কে কলকল করে ঘামছে ভদ্রমহিলা আর কোঁপাচ্ছে 'দিচ্ছি দিচ্ছি প্রাণে মেরো না বাবা।' কিন্তু দিচ্ছি বলেও হাতের চুড়ি খুলতে পারছে না মহিলাটি। দুটো হাত তার ঠুক ঠুক করে কাঁপছে।

—'কানের দুলুন। তাড়াতাড়ি। নইলে কান কেটে নামিয়ে নেব।'

এ পাশের ভদ্রমহিলার দেখাদেখি ওপাশের মহিলাটি নিজে থেকেই গহনা খুলতে শুরু করেছে। আর তাদের স্বামীরা খুলে ফেলছে হাতের ঘড়ি, পেন।

ওপাশের কোণে ছোরার সামনে বাঘের মতো ঘপ্‌ঘপ্‌ করে লাফাচ্ছে মাঝোহারীটা—'লে লেও। সব লেও লেকিন ছোরাকো জারা সে হটা লেও

এবারে রিভলবারধারীর আদেশে সেই অ্যাটেনশানের যুবক তিনটি এক এক করে খুলে দিচ্ছে হাতের ঘড়ি, ক্যামেরা পেন, পকেটের টাকা।

তাদের দেওয়া শেষ হতেই রিভল-বারধারী গর্জন করে উঠল—'মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।' যুবক তিনটি মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে রইল।

সেই গেরুয়াপরা সাধুটি একবার বলার চেষ্টা করল—'আমি সাধু।'

রিভলবারধারী ধমকে উঠল—'টাকা বের করে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে সাধু সুবোধ বালকের মতো আলখাল্লার পকেটের ভেতর থেকে টাকা বের করে দিল।'

কামরা ভর্তি মানুষের জমাট বাঁধা মূর্ছাহত রূপান্তরিত হয়েছে এক অদ্ভুত নৈঃশব্দে। একটা ছুঁচ পড়লেও বুঝি শোনা যায় শব্দ।

দু' থেকে তিন মিনিটের মধ্যে লুণ্ঠন প্রায় শেষ হতে এল, আমার সামনের ভদ্রমহিলার গহনা খোলা শেষ হলেই ধরবে আমাকে। এবারে তাকিয়ে দেখি সেই দরিদ্র ভদ্র মহিলাটি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে তার ছেলে তিনটিকে।

হঠাৎ চোখ গিয়ে পড়ল সেই আদিবাসী পরিবারটির ওপর। দেখি বাপ ওদের আর দুই ছেলের চোখ ঐ ধারাল ছোরার চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। মানুষের চোখ যে এমন করে জ্বলে উঠতে পারে তা আমি জীবনে কোনদিন দেখিনি।

ওরা শুধু মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে ব্যাপারটা। তারপর তিন জনের চোখে চোখে কি যেন একটা ইশারা হয়ে গেল।

পরক্ষণেই এক পাড়ি মানুষের সেই চূড়ান্ত আতঙ্ক, তীক্ষ্ণ আত্মসমর্পণ ব্যর্থ মনুষ্য আর মেয়েদের অসহায় আর্তনাদের মাঝখানে দু'জনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আদিবাসী তরুণ দু'টি আর তার বাবা।

কেউ কিছু বোঝার আগেই পলকের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা। যেন আকাশ থেকে তিনটে বাজপাখী ছোঁ মেরে নেমে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারের ওপর। ছোট ছেলেটি জাপটে ধরল পিছলবাজ ধরা দুর্বৃত্তকে। আর বড় ভাই এগুলাকে বেঞ্চ টপকে গিয়ে ধরল ওপাশের ছোরা হাতে লুণ্ঠনকারীকে। আর তাদের বাবা গিয়ে জাপটে ধরল এ পাশের দুর্বৃত্তটিকে।

পরক্ষণেই ধস্তাধস্তি করতে করতে তারা টাল খেয়ে গড়িয়ে পড়ল বেঞ্চের পাশে, তারপর মেঝের ওপর।

চতুর্থ যে ছেলেটি এতক্ষণ এলার্ম চেনের কাছে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল সে অবস্থা বুঝে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ঝাঁপ দিল চলন্ত ট্রেন থেকে।

তার এই পালানো সাহস এনে দিল যাত্রীদের মনে। এতক্ষণের চাপা নীরবতা যেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চৌচির হয়ে ফেটে পড়ল

—'ডাকাত। ডাকাত।'

—'বাঁচাও। বাঁচাও।'

—'খুন। খুন।'

—'চেন টান। চেন।'

এই চিৎকার হুটোপুটিতে জেগে উঠল ঘুমন্ত শিশুরা। সঙ্গে সঙ্গে তারাও গলা কাটিয়ে চিৎকার শুরু করল।

আর এই চেঁচামেচি, হুটোপুটির মধ্যে আমার পাশের সেই ঢুলুঢুলু ভদ্রলোকটি—লাফিয়ে গিয়ে এলার্ম চেনটা টেনে ধরে ঝুলে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির চারিধার থেকে কাঁচ, কোঁচ, খটাং, ঘট প্রভৃতি নানাধরনের শব্দ এক সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল। তারপর কাঁচ করে লম্বা একটানা একটা শব্দের সঙ্গে ধীরে ধীরে স্লথ হতে আসতে লাগল গাড়ির গতি।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে মানুষের এই কলরব আর যান্ত্রিক শব্দগুলোকে ছাপিয়ে গুরুম করে গর্জন করে উঠল একটা গুলির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে 'আঁক' করে একটা তীব্র আর্তনাদে চমকে উঠল গাড়ির ভেতরটা।

এক মুহূর্ত ভয়াবহ নীরবতা।

তারপরই শুরু হল এতগুলো মানুষের প্রবল আর্তনাদের কলরোল—'গুলি। গুলি।'

—'গুলি চালাচ্ছে।'

—'বাঁচাও। বাঁচাও।

—'মরে গেলাম। বাবারে —মারে।'

বলতে বলতে এতগুলো মানুষের এক সঙ্গে পালানোর চেষ্টা শুরু হল। আরম্ভ হল এক উন্মাদ ধস্তাধস্তি, ধাক্কাধাক্কি, এ ওর ঘাড়ে পা দিচ্ছে, ও ওকে দলিছে, এ ওকে লাথি মেরে এ বেঞ্চ থেকে ও বেঞ্চে লাফ-ঝাঁফ করে এক বীভৎস পরিবেশে,—মেয়েদের বিকট আর্তনাদ, শিশুদের গলা ফাটানো কান্না, পুরুষদের কারো কারো বাঙ্কের হুক ধরে ঝুলে থাকার ভেতর আস্তে আস্তে থেমে গেল গাড়িটা।

গাড়ি একেবারে থামার আগেই এক ঝটকায় দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে গেল সেই ডাকাত দলের দুটি ছেলে। তারপর গাড়ি থামা মাত্র পুরুষরা হুড়মুড় করে বাইরে লাফিয়ে পড়ে চিৎকার শুরু করল। আর মেয়েরা দরজার কাছে গিয়ে প্ল্যাটফরম নেই দেখে লাফানোর ঝুঁকি না নিয়ে বাইরে গলা বের করে পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগল। গাড়ির ভেতর শুধু তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে বাধ্য হওয়ার মর্মপীড়িত মহিলাটি একটা বেঞ্চের ওপর উঠে দু'হাত তুলে লাফাতে লাফাতে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'খুন। খুন। সব খুন হয়ে গিয়েছে। বাঁচাও। বাঁচাও।'

মাঠের মাঝখানে একটা ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছে থেমেছিল গাড়িটা। গভীর রাত। প্রতিটি কামরাতেই যাত্রীরা ঘুমিয়ে রয়েছে। এই চেঁচামেচি হৈ চৈ-এর শব্দে দু' চারজন যাত্রী নেমে আসতে লাগল। ওধারে গাড়ির শেষপ্রান্ত থেকে হাতে লাল লণ্ঠন ঝুলিয়ে লাইনের পাথর ভেঙে এগিয়ে আসতে লাগল গার্ড। সামনের দিক থেকে এগিয়ে এল

আদিবাসী মাথা নীল জামা পরে ইঞ্জিনের খালাসিরা।

তারপর সমস্ত উত্তেজনা আর কলরবকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দেখা গেল খুন হয়েছে দু'জন

সেই রিভলবার হাতে দুর্বৃত্তের গুলিতে মারা গেছে ছোট আদিবাসী তরুণটি। দুর্বৃত্তটি পালিয়েছে। পড়ে আছে তরুণের মৃতদেহ। গুলিটা একেবারে বুকের মাঝখানে লেগেছে। তার তাজা রক্তে থৈ থৈ করছে বেঞ্চের তলা, মাতায়াতের পথ। সেই রক্তের ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করছে মানুষ। তাদের পায়ে পায়ে রক্তের ছোপে লাল হয়ে গেছে গোটা মেঝে আর সব কটা বেঞ্চ।

আর তার একটু ওধারে ছোরা হাতে দুর্বৃত্তটির গলা দুহাতে টিপে ধরে বসে আছে আদিবাসী বড় যুবকটি। শ্বাসরোধ হয়ে মারা গেছে সে। ছোরাসুদ্ধ হাতটা এলিয়ে পড়েছে মাথার পাশে। চোখদুটো লাল হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে, মুখটা বীভৎসভাবে হাঁ হয়ে গিয়েছে, জিবটা বেরিয়ে এসেছে অনেকখানি।

আর তাদের বাবা, ছোরা হাতে যে দুর্বৃত্তকে ধরেছিল সে ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে পালিয়েছে। বৃদ্ধ সরে এসে বসেছে চাপ চাপ রক্তের ওপর মৃত ছোট ছেলেটির পাশে। এক অদ্ভুত, শুষ্ক, অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টিতে সে চেয়ে রয়েছে মৃত সন্তানের মুখের দিকে।

গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির মা, সেই বৃদ্ধা আদিবাসী রমণীও এসে বসল তার শিয়রে। অদ্ভুত শান্ত হয়ে বসে রইল দু'জনে। তাদের কণ্ঠে এতটুকু আর্তনাদ নেই, চোখে একবিন্দু জল নেই, দেহে এতটুকু আক্ষেপ নেই, কোনভাবে কোনখানে সন্তানহারা প্রাণের যন্ত্রণার কোনরকম আভ্যন্তরিক চিহ্ন নেই, তারা যেন বহুযুগ আগের মোষাই করা কোন প্রাচীন শিলামূর্তি, যাদের পায়ের কাছে এইমাত্র একটি নরবলি দেওয়া হয়েছে। যার উষ্ণ রক্তে এখনও ডুবে রয়েছে তাদের পা-গুলি

ওদের সেই নির্বাক, শুষ্ক মূর্তির দিকে তাকিয়ে হতচকিত মানুষের সেই চিৎকার, আর্তনাদ, ছুটোছুটি, হৈ চৈ কি ভয়ঙ্কর রকম-ভাবেই না কানের কাছে বিরূপ করতে লাগল।

পাড়ার ইঞ্জিনের খালাসি, অন্য তিনি থেকে ঘুম ভেঙ্গে উঠে আসা লোকজন খানিকক্ষণ দেখল ওদের। তখন ঘোটা ঘটনা তারপর তারা নেমে গেল

গাড়োয়ার নির্দেশে ড্রাইভার ধীরে ধীরে গাড়িটাকে টেনে নিয়ে চলল সামনের স্টেশনের দিকে।

গাড়ি চলতে শুরু করা মাত্র আদিবাসী যুবকটি ছোরা হাতে দুর্বৃত্তের মৃত দেহটি ছেড়ে এসে বসল ছোট ভাইয়ের পাশের জোড়ায়। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে এসে ঠাঁই নিল একতারা বাজিয়ে সেই ভিক্ষুক যাযাবরটি।

রক্তের ওপর সেই মৃত দেহটি ঘিরে চারজনে বসে রইল নির্বাক হয়ে। ওটা যেন একটা পবিত্র সমাধিক্ষেত্র হয়ে গেল। গাড়ির অন্য লোকজন যারা এতক্ষণ এত চেঁচামেচি হাপাহাপি করছিল, তারা এই তাজা রক্তের মুখোমুখি হয়ে অন্য এক আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে চোখ বড় বড় করে তাকাতে লাগল। এই মুহূর্তে কারো সাহস হল না ওদের নাম ধাম পরিচয়

With
Best
Compli
From

★

M/s. Bitumen Products (India)

Phone 45 4756
44-9140

Factory :
90A, Bireo Roy Road (East)
Calcutta 41

City Office :
448, Samsul Huda Road,
Calcutta-17

Mfg. of
Blows Bitumen, Bitufelt
and other Bituminous
Products.

টুই জিজ্ঞেস করে। সন্ধ্যা বেলার সেই ক্রিজ, এভারক্লার, মাটন চপ, আর কোও ট্রিংকেস-এর জীবনের সমস্ত বাগাড়ম্বর আর আস্ফালন এই দীপ্ত সৌর্য, এই নির্ভীক আত্মদান, এই রক্তমাংস মৌনতার সামনে এই মুহূর্তে এমন মিথ্যা হয়ে গেল যে জোরে কথা বলার সাহসটুকুও ওদের হারিয়ে গেল।

গাড়ির মধ্যে শুধু জেগে উঠতে লাগল ফিস ফিস দু-একটা কথার টুকরো:—'আমার ঘুমটা পেলাম না।'

—'আমার ঘড়িটা খেল।'

—'আজকাল রাতের গাড়িতে চলাফেরা করাই বিপদ।'

ধীরে ধীরে গাড়ি স্টেশনের দিকে চলছে। এত ঘটনার পর আমি শুধু তাকিয়ে আছি মৃত তরুণটির মায়ের মুখের দিকে। ট্রেনের অনুজ্জ্বল আলো পড়েছে বৃদ্ধার মুখে। বলি রেখাকুঞ্চিত এক আদিবাসী নারীর অভিব্যক্তিহীন মুখ। তার মনের ভেতরে যে ঝড় বইছে তার এতটুকু বহিঃপ্রকাশ নেই কোথাও।

নিজেরই সন্তানের রক্তে ডুবে রয়েছে তার পা দুটি। একটি হাত নামান রয়েছে ছেলের মাথায়, চোখের অপলক দৃষ্টি মৃত মুখখানার ওপর স্থির হয়ে আছে। এমন রূপে কোন মাকে আমি জীবনে কখনও দেখিনি। আমি তাকাতে পারছিলাম না সে মুখের দিকে। কিন্তু চোখ সরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও আমার ছিল না।

এক দৃষ্টে সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হল এই বুঝি ইতিহাস। চোখের সামনে আমি বুঝি আমার জন্মভূমি, আমার মা, ভারতবর্ষকেই দেখছি। শত সহস্র বছরের উত্থান-পতন, শত সম্ভাতার ভাঙাগড়া, আক্রমণ, সংঘাতের মধ্যে নিজের সহীন সন্তানদের তপ্ত রক্তের মাঝে এমনি করেই তো জেগে বসে আছে চিরন্তনী ভারতবর্ষ।

যুগে যুগে এই মাটিতে কত রাজা-মহারাজা, কত আমির ওমরাহ, ধনী-মহাজন, কত শাসন ব্যবস্থা, বিলাস-বৈভবের কত বিকৃত উৎস মুখকেই না উজ্জীবিত করেছে।

কিন্তু আজ কোথায় সেই তারকারা? কোথায় তাদের দম্ভ আর কলকোলাহল? স্ফুলিঙ্গের অধিক দুর্গতির মতো চিরকালের মতো তারা বিলীন হয়ে গেছে।

শুধু বেঁচে আছে ভারতবর্ষ আর তার মেহনতি সন্তানরা। প্রতিটি সংকটের মুহূর্তে এরাই উঠে দাঁড়িয়েছে, এমনি করেই বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিরোধ করেছে সমস্ত অন্যায় আর অবিচারকে। —আজও তাই ঘটল, ভবিষ্যতেও এই ঘটবে।

একটু থামল অনিমেষ। তারপর বলল, গাড়ি স্টেশনে এসে থামল। যাত্রীরা হুড়মুড় করে নেমে পালিয়ে গেল অন্য কামরায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ দু'টো নামাল। তাদের সঙ্গে নেমে গেল সেই আদিবাসী পরিবার আর সেই ছন্নছাড়া গায়ক। শূন্য গাড়িটায় শুধু পড়ে রইল জমাট বাঁধা চাপ চাপ রক্ত।

সমীর চুপ করল। অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। বাইরে ঝড়ও অনেকক্ষণ থেমে গেছে। উদাস হয়ে গেছে কালবৈশাখীর মেঘ। পরিষ্কার নীল আকাশে একফালি চাঁদ উঠেছে। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় বাইরের পৃথিবীটাকে মনে হচ্ছে কোন সিল্ক-বসনা-সুন্দরী।

সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অনিমেষ বলল—'গল্পটা বানিয়েছিল ভাল। তবে এরকম কোন ট্রেন ডাকাতির পাল্লায় পড়লে তুই যে সব আগে পালাতিস এটা আমি লিখে দিতে পারি।

সমীর একথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল—'রাত হয়েছে। চ এবার বাড়ি যাই।'

পৌষ পেরিয়ে

(৩৪ পৃষ্ঠার পর)

ছড়া লিখত। এখন সে বাউলদের জন্যে গান লিখছে। তার 'যেন-বিদেশের মানুষ গো, যাও এ বীরভূম ঘুরে'—এই গানটা খুব নাম করেছে।

নিজের গান নিজে বানায় এমন বাউল এখন বিরল। রেডিও সিনেমা জলসায় এখন বাউল গানের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় বাউলের জীবনচর্চার সঙ্গে তার গানের ফারাক হয়ে যাচ্ছে। এটাই বোধহয় কালের নিয়ম। এই বিচ্ছেদটাকে মেনে নিয়ে বাউল গানে এ কালের প্রাণের স্পন্দন যদি ভরে দেওয়া যায় তাতেও লাভ আছে।

যখন চলে আসছি দেখি এক আসরে গান হচ্ছে। দুটি ছোট ছেলে সে আসরের নায়ক। তার মধ্যে একজন—আরে, রানীগঞ্জে যাবার সময় ওকেই তো ট্রেনে দেখেছিলাম। সেই এক প্যান্ট, সেই এক পোশাক। চোখেমুখে ক্লান্তির ভাব। কাল সারা রাত আখড়ায় আখড়ায় গান গেয়েছে।

আগের বার ওর নাম জানা হয় নি। এবার জেনে নিলাম। শুকদেব বাউল। দুর্গাপুরের কাছে থাকে। কি ইস্কুলে পড়ে? খুব ইচ্ছে করছিল জানতে। কিন্তু জিগ্যেস করতে সাহস হল না।

কবিতা

আজ হোক বরাভয়

বিকু দে

এ জীবন আজ হোক বরাভয়।
ক্ষমা করো ওগো জীবন! ব্যর্থতাক্লিষ্ট জীবন
প্রায় শেষ হতে, যদিই বা হারে—
তাই অনেকেই ঘরে তাই ঘরে—

জীবনটা যেন সিগ্নিওয়ালার যাত্রা।
নেই তার আশা-মুক্তি, অথবা মাত্রা।
আমাদের দিনরাত্রির বরফেই
আর জীবনেই ভোগে জীবন!

সব জীবনেই সদা হোক বরাভয়,
হে জীবন। হোক আজীবন।
এক বরাভয় সবার বিশ্বে হোক—
শুধু সুখ নয়, দুঃখ যা নয় হোক।

এক হোক সদা সব মানবিক মন,
তবেই তো হবে নিত্য সজীবন—
গোটা পৃথিবীতে দুঃখী জেনেই লোক নয়,—
শুধুই কি থাকে হোক, দুঃখ যা তার?

সর্বদা যেন সকলের থাকে যাত্রা,
একটি জীবন হোক সকলের ধাত্রী,
সবার জীবনে হবে এক বরাভয়—

দুঃস্বপ্নেতে কি বলো হে সঞ্জয়।

পেছনের টান ঃ অগ্রগতির স্ফুরণ

জ্যোতি দাশগুপ্ত

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র-সমূহের ইউনিয়নের ষাট বছর এবং স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের তিরিশ বছর পূর্ণ হবার বর্ষ এই ১৯৭৭ সাল। এ দু'য়ের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য-অটুট সম্পর্ক সেতুবন্ধ অগ্রাহ্য করার সাধ্য তাদের থাকলেও তাদের সাধ্য ক্রমে বিলীয়মান। ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক পিতৃরাষ্ট্র যৌবনে অক্টোপাসের ফ্যাসিবাদকে চূর্ণ করে বিশ্বমুক্তির প্রবাহধারা ফুলে দিয়েছিল; ঔপনিবেশিক জাতিগুলির স্বাধীনতার মূল তার ফলেই দুর্বার হয়ে গেল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রগতিশীল ধারা বরাবর সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম ও বিকাশে মুক্তির অগ্রদূতকে অবলোকন করেছে। তার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং স্বাগত জানিয়েছে। রাজনৈতিক মুক্তির প্রথম পর্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তিতে সম্পূর্ণতা অর্জন করবে এটা মানুষের সহজাত চিন্তাও বটে। এর উপর রয়েছে সচেতন সাধনা। সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের নায়করা জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামের মধ্যে থেকে এবং বাইরের থেকেও এই পরস্পরের সম্পর্কের সৌধটি নির্মাণ করেছেন সজাগভাবে।

শত্রু এক বলেই সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম পরস্পরের নিকট হয়। সেই শত্রু হল সাম্রাজ্যবাদ যা পুঁজিবাদেরই সর্বোচ্চ স্তর। লোভলালসাহীন পুঁজিবাদ যেমন অচিন্তনীয়, তেমনই সর্বোচ্চ মুনাফার নিশ্চিতি ব্যতীত একচেটে পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদ অচল হয়ে যায়। ফলে রাজনৈতিক মুক্তির প্রথম পর্বে অর্জিত ক্ষমতা দ্বিতীয় পর্বে লোভমুক্ত সমাজের আকাঙ্ক্ষা স্থাপনে অগ্রসর হবে—সেটাই জাতীয় চাহিদা হয়ে ওঠা স্বাভাবিক।

পুঁজিবাদী সমগ্র দুনিয়া এবং সমাজতান্ত্রিক সমগ্র দুনিয়া আজ যখন ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত, তার ছোঁয়া ভারতীয় রাষ্ট্রেও আঁচড় দিয়েছে। ভারত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র নয়—কিন্তু পুঁজিবাদী বাজারের ও ধনবাদী বিশ্বের অঙ্গ। তা সত্ত্বেও দু'বারবার মধ্যে তীব্র সংঘাতের ছায়া ভারতসমেত সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে বিস্তৃত। মুদ্রাস্ফীতি, দরবৃদ্ধি, বেকারি প্রভৃতি পুঁজিবাদী বিশ্বে যখন জরুরি হয়ে দেখা দিচ্ছে তখন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে তার ছায়ামাত্র নেই। পুঁজিবাদী বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের সমাজ-তন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ এ-অবস্থায় কে কেমন করে ঠেকাবে?

তবু পুঁজিবাদ মোহের পথ ছেড়ে দেবে না—ভারতের পুঁজিবাদীরা বিনা যুদ্ধে পথ ছাড়বে না। তাদের সেই আবশ্যকতা থেকেই বিশ্ব পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নাড়ির সম্পর্ক কাটতে যাদের আপত্তি ও ভীতি তারা আজ এক শিবিরে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করবে এ যেমন অনিবার্য, তেমনই তার বিপরীত শিবির গড়ে উঠবে নবচেতনাসম্পন্ন জাতীয় মুক্তির সৈনিক ও সমাজতন্ত্রীদের সমন্বিত ঘনিষ্ঠতায়।

আজের ছকে এই বিবরণী যেমন সরল, কোটি কোটি মানুষের মন ও অভিজ্ঞতা নিয়ে গঠিত একটা জাতির কাছে সেই প্রক্রিয়াটি তেমন সোজা নয়। ঘাম-অশ্রু-রক্ত ঢেলে তাকে পেতে হয়। আজ আমরা যে-বিষয়গুলিকে জাতীয় নীতির মর্যাদা দিয়ে থাকি তার কোনটাই বা কঠোর সংগ্রাম ব্যতীত আপনা-আপনি অর্জিত হয়েছে? সার্বভৌমত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সামাজিক সুবিচার, পরিবেশ রক্ষার্থে ভূমিসংস্কার, ধনসম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের উপর একচেটের কর্তৃত্বের খর্বীকরণ ও উৎপাদন, উৎপাদন-সংগ্রহ-বণ্টনে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের প্রসার প্রভৃতি যে-বিষয়গুলি আজ জাতীয় চেতনার অঙ্গ হয়ে গেছে তা সবই অর্জিত হয়েছে কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে এবং সেই লড়াই এখনো বাড়ছে বৈ কমছে না।

এ এমন এক জীবন-নাট্য যা থামতে পারে না। ফলে রাজনৈতিক মুক্তির আন্দোলন তার প্রথম পর্বের সীমানা অতিক্রম করে অর্থনৈতিক

ও সামাজিক মুক্তির মোড়ে যে সমাজতন্ত্রের আঙিনায় প্রবেশ করছে তা জীবনেরই ধর্ম। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে "সমাজতন্ত্র" বাক্যটির সংযোজন সেজন্যই আকস্মিক নয় এবং এটা একটি তুচ্ছ ঘটনাও নয়।

জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্রের ধারণের সঙ্গে অর্থনৈতিক-সামাজিক মুক্তি ও জনগণের গণতন্ত্রের প্রবক্তা সমাজতন্ত্রের এই যে মিশ্রণ, তার ফলে সমাজতন্ত্রের চিন্তাকে দানা বাঁধাবার কাজটি সহজ হয়ে গেল—এরূপ একটা কল্পনা কিন্তু অবশ্যই ভ্রান্ত। জাতীয় জীবনে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে অসমর্থ পুঁজিবাদ যখন সমাজতন্ত্রের ভেক ধরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে তখন সেই শত্রুকে আবরণ-চ্যুত করাটাই সমাজতন্ত্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হয়ে ওঠে। আদর্শের মধ্যে ভেজালের কোনো স্থান নেই, বিশেষ করে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র যখন পরস্পরের জাত শত্রু।

• • •

সমাজতন্ত্র হল শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি—শ্রেণীবিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজে বিদ্যমান শ্রেণীগুলির মধ্যে প্রলেতারিয়েতের নিজস্ব শ্রেণীগত বিশ্লেষণ। সেজন্যই অপরাপর শ্রেণী যখন সমাজতন্ত্রে ভেজাল মেশাবার জন্য প্রেরিত হয়, তখন তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শ্রেণী-সংগ্রামেরই অন্তর্ভুক্ত এবং ভাবাদর্শের এই সংগ্রামের দ্বারাই সমাজতন্ত্রের আদর্শ বাঁচে ও বৃদ্ধি পায়।

সাম্রাজ্যবাদ তথা পুঁজিবাদ আজ বিশ্বজোড়া ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্রের কাছে নৈতিকভাবে পরাজিত। তবু পলায়নপর সৈন্যবাহিনী অনেক ঘাঁটি যখন করেছে এবং তারা দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়ছে। পুঁজিবাদীদেরই একাংশ যখন আজ সমাজতন্ত্রের ভেক ধরে আত্মরক্ষা বাড়াবার চেষ্টা করছে তা তাদের নৈতিক পরাজয়ের সাক্ষ্যবাহী বটে কিন্তু মাত্র ততটুকুই দ্রষ্টব্য নয়। কারণ শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন ও শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতাপুষ্ট ঐ তথাকথিত সমাজতন্ত্র ও সামাজিক সুবিচারের কথা বলা হচ্ছে এ-কারণেই যে, কতদিন শ্রমিকশ্রেণীর নিকট থেকে মেহনতী কৃষক ও অপরাপর শ্রেণী ও বর্ণকে ধনিকশ্রেণী টেনে আপন কক্ষে ঘুরাতে পারে। বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের যে-প্রতিযোগিতা, এখানে তা জাতীয় প্রতিযোগিতার প্রবেশ করল। শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতন্ত্র থেকে তার সম্ভাব্য মিত্রদের পৃথক করে রাখতে পারলেই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের পোয়াবারো—কারণ নতুনের অভ্যুত্থান তাতে অবরুদ্ধ হয়ে গেল।

শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতন্ত্রকে প্রলেতারিয়েত ব্যতীত অন্যেরা গুছিয়ে নিয়ে যাবে এরূপ আশা বাতুলতা। ফলতঃ এই পরিস্থিতির যে-চাহিদা তা হল শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতন্ত্রের ধারণাকে প্রলেতারিয়েতকেই যেমন মতাদর্শের সংগ্রাম তেমন রাজনৈতিক সংগ্রামের দ্বারা চালু করতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘ শাসন-শোষণে পশ্চাৎপদ এবং আজও বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের কব্জাভুক্ত বলে প্রতিনিয়ত বৈষম্যে জর্জরিত একটা দেশে শ্রেণী হিসেবে প্রলেতারিয়েতেরও পশ্চাৎপদতা ও দুর্বলতা অসীম। শ্রমিকদের সংখ্যালঘুতা থেকে শুরু করে শ্রেণী-সত্তা হিসেবে তার দানা বেঁধে ওঠাতেও অনেক বিপত্তি রয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েতের প্রতিদ্বন্দ্বী ধনিকশ্রেণী পুঁজিবাদী পথে ছিটে-ফোঁটা, অসম ও অসংলগ্ন কিছু অগ্রগতির বাহন হলেও তার বেশীরভাগ সমাজের এক বিশাল অংশের উপর প্রভাব টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয় এবং বহুলাংশে যেন কিছু তাদের জন্য সক্ষমও হয়।

রাজনৈতিক এই পরিস্থিতির মধ্যে আবার ভাবাদর্শের ভেজাল যখন প্রবর্তিত হয় তখন শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্যের দুরূহতা সহজেই অনুমেয়।

তবে, সমাজের নতুন মোড়ের জন্য, সমাজতন্ত্রের জন্য, নায়ক হওয়া শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক নিয়তি। কর্তব্যের দায় ঘাড়ে পড়ে বলেই তার ঐক্য অপেক্ষাকৃত কম সময়ে সম্ভব হবে। ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের এও এক শিক্ষা। তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী পাঁচটি রাষ্ট্রের মধ্যে জারতন্ত্রাধীন রাশিয়াই ছিল সবচেয়ে পশ্চাৎপদ। কিন্তু রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীই তার পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা করেছিল।

এর উপর আজ বিশ্বের এক-ষষ্ঠাংশ জুড়ে সমাজতন্ত্রের জয় হয়েছে এবং বিশ্ব-সমাজতন্ত্র প্রত্যেক দেশের শ্রমিকশ্রেণীর জন্য অভিজ্ঞতা ও সহায়তার ভাণ্ডার সৃষ্টি করেছে। শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন যে আন্তর্জাতিক তার অন্যতম কারণস্থল এখানে যে, এক দেশের অভিজ্ঞতা অন্য দেশের শ্রমিকশ্রেণী গ্রহণ করে।

সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী অবক্ষয়, অপদার্থতা ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতা নতুনের জন্য সারা দেশে যে আকুল আগ্রহের সৃষ্টি করে, শ্রমিকশ্রেণীর সাধ্য ও সামর্থ্য তাতেও

দ্রুত বৃদ্ধি পায়। পুঁজিবাদী পথ বিসর্জন ও সমাজতন্ত্রের জন্য সামগ্রিকভাবে দেশের আকাঙ্ক্ষা যখন বাড়ে তখন শ্রমিকশ্রেণীর বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের জন্য চাহিদা বাড়বে—এবং তার নায়ক ও বাহকরাও তখন না জেগে পারে না। ঐতিহাসিক শক্তির উত্থানে ইতিহাসের অবদানই সর্বাধিক।

* * *

পুঁজিবাদ ভারতবর্ষে যে মেটালিটা অর্জন এনেছে এমন আর কোনো কালে দেখা যায় নি। দীর্ঘদিনের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে মূল্যবোধগুলি গড়ে উঠেছে আজ তার উপর আক্রমণ পুঁজিবাদের প্রথম কীর্তি। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বয়ম্ভরতা, গণতন্ত্র-একচেটের খর্বীকরণ, পরিবেশ রক্ষার্থে ভূমিসংস্কার, সামাজিক সুবিচার, পরিকল্পিত উন্নয়ন, উৎপাদন-সংগ্রহ-বন্টনে রাষ্ট্রীয় অনুশাসন প্রভৃতি যে নীতিসমূহ সৃষ্টি হয়েছে তার মূলগত অস্বীকৃত হচ্ছে। পুঁজিবাদকে রক্ষার বিশ্বদীক্ষা থেকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার বদলে সাম্রাজ্যবাদকে নিকট করার আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। আর এসবেরই ফলে যে প্রধান রাজনৈতিক বাস্তবতার সৃষ্টি হয়েছে—তা হল, সমগ্র জাতিকে পশ্চাতে টানতে গিয়ে সামগ্রিকভাবে ধনিক শাসকদের যে শ্রেণী-পক্ষপাদগামিতা তা দেশের ছন্দে ভূত হয়ে চেপেছে।

কেন্দ্রীয় শাসনের এই কেন্দ্রীকৃত মেটালিটাপনারই অপর দিক হল সংকট থেকে মৌলিক পরিবর্তনের দুঃসাহসীরা ব্যতীত অপরাপর শ্রেণী ও বর্গ সংকটের সন্নতত্তার দরুনই সংকেটের স্রষ্টাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইবে। আর সেটাই হল মার্কসের জাল যাতে পুঁজিপতি-শ্রেণী অপরাপর শ্রেণী ও বর্গকে আটক করে রাখে।

পুঁজিবাদী পথ ভারতে যে অচল হয়েছে এ আজ একটি বিতর্কাতীত বাস্তবতা। কিন্তু বিনাযুদ্ধে কোনো শ্রেণী পথ ছেড়ে দেবে না বলেই অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ধনিকশ্রেণীর প্রস্তুতির কোন বিরাম নেই। পক্ষান্তরে তার বিকল্প কেন্দ্র অপ্রস্তুত। আর এরই ফলে শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতন্ত্র যাদের অবশ্যই আকর্ষণ করবে তাদের অনেকে আপাতত পুঁজিবাদের সাথার উপরই আশ্রয় নিচ্ছে—বন্যায় যেমন খাদক ও খাদ্য এক ও'ড়িতে ভাসে।

যখন লড়াই উপস্থিত হয়েছে পথের প্রশ্ন নিয়ে, যখন প্রশ্ন হল জাতীয় নীতিসমূহ বিসর্জন কিংবা তাকে অগ্রসর করা এবং অগ্রসর করতে গিয়ে গুণগত পরিবর্তনের জন্য লাফ দেওয়া, তখন সেই প্রধান, মৌলিক ও সময়োচিত প্রশ্নকে উপেক্ষা করে কীভাবে কোন্ উপায়ে কিছুটা বাচা যায়—এ হল বিধাগ্রস্তদের দর্শন। ঐরূপ সকলে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী সমাজতন্ত্রের বীক্ষায় আকৃষ্ট না হওয়া পর্যন্ত পা পিছলে পড়াই তাদের বিধিলিপি। বিপদ জয় করার পৌরুষ ব্যতীত বিপদে মোরে রক্ষা করার প্রার্থনা কোন ঐতিহাসিক শক্তির জন্ম দিতে পারে না।

জাতীয় নীতিসমূহকে যখন আরও জোরে আঁকড়ে ধরতে হবে তখন একদিকে বিশ্ব-পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদ, অপর দিকে দেশের ভেতরে একচেটে পুঁজির কাছে সংকট থেকে পরিত্রাণ করার প্রার্থনা জানানো হচ্ছে। ভারত সরকারের প্রতিনিধিরা বলছেন আমাদের চলতি শিল্প-নীতিরও আবশ্যকীয় রদবদল করে বহুজাতিক কর্পোরেশনকে স্বাগত জানানো হবে।

কারা এই বহুজাতিক কর্পোরেশন? ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ এই দু'বছরে তৃতীয় দুনিয়ার দেশ থেকে এই বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি ২৫৫০ কোটি ডলার স্বদেশে স্বীয় তহবিলে পাচার করেছে। কত হারে ও কী কায়দায় বহুজাতিক কর্পোরেশন তৃতীয় দুনিয়াকে লুঠ করে তারই এক দৃষ্টান্ত ভারতের কোকাকোলা কোম্পানি। মাত্র ৪০ হাজার পাউণ্ড পুঁজি লগ্নী করে এই বিদেশী কোম্পানি ভারত থেকে ইতোমধ্যে ৮০ লক্ষ পাউণ্ড স্বদেশে পাচার করেছে।

অর্থনৈতিক লুণ্ঠন হল একদিক। এর সঙ্গে বহুজাতিক কর্পোরেশনের রাজনৈতিক লুঠ হল তৃতীয় দুনিয়ার সার্বভৌমত্ব। গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশগুলির কলম্বো সম্মেলনে এবং জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত বিবিধ অনুষ্ঠানে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে। স্বয়ং একজন ভারতীয় ব্যক্তি এল কে ঝা'র নেতৃত্বে গঠিত জাতিসংঘ কমিটি তাদের ১৯৭৪ সালের রিপোর্টে বলেছে: "সংশ্লিষ্ট দেশগুলি খুবই বিব্রত যে তাদের মূল আর্থনৈতিক সেক্টরগুলি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ওদের কাজকর্মের ধরনে প্রত্যেক দেশের মরোত্তা অর্থনীতিকে বিপুল ব্যয় বহন করতে হয়, রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের উপর পরিষ্কার প্রভাব ওরা বিস্তার করে এবং প্রত্যেক দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উপর ওদের সম্ভাব্য কুপ্রভাব পড়ে....."।

কোনো কোনো মহল থেকে বলা হচ্ছে যে, বহুজাতিক কর্পোরেশনকে নিয়ন্ত্রণ করে গ্রহণ করা সম্ভব।

একথা সুবিদিত যে, লগ্নী করার আগে বহুজাতিক কর্পোরেশনই এই শর্ত আদায় করে নেয় যে তাদের জাতীয়করণ চলবে না। নিয়ন্ত্রণ শব্দটি কতটা অর্থহীন এ থেকে বোঝা যায়। প্রথম দফাতেই যখন জাতীয় সার্বভৌমত্ব বিসর্জিত তখন অপরাপর নিয়ন্ত্রণ কথাটি নিছক কথা ছাড়া আর কিছু নয়।

দ্বিতীয়তঃ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠি ও বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ। বিদেশী অর্থ ছোঁব না এমন একটা পণ অবশ্যই অর্থহীন। ব্রিটিশ ঋণে দুর্গাপুর, পশ্চিম জার্মানীর ঋণে রাউরকেলা ইস্পাত কারখানা স্থাপনে কেউ কোনোদিন আপত্তি করে নি। আপন প্রয়োজনে নিঃসর্ত ঋণ অবশ্যই গ্রহণীয়। কিন্তু পুঁজিপতি রাষ্ট্রগোষ্ঠি ও বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ কদাচিতই অমন ধরণের হয়। ১৯৭৪ সাল নাগাদ ভারত আমেরিকার নিকট থেকে ৪১৪২·৮৭ কোটি টাকা, ব্রিটেনের নিকট থেকে ১২০১·৭৮ কোটি টাকা, পশ্চিম জার্মানী থেকে ৭১৭·২৪ কোটি টাকা, জাপান থেকে ৩২০·৮২ কোটি টাকা, কানাডা থেকে ৩১৭·৪৩ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা থেকে ২০০৭·২৩ কোটি টাকা, বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ৩৪৮·২৪ কোটি টাকা পেয়েছিল। সর্বদাকুলো '৭৬ সালের মার্চ মাস অবধি বিদেশের কাছে ভারতের এই যে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকার ঋণ তার বার্ষিক সুদ প্রায় ১০০০ কোটি টাকা ছুঁতে চলেছে। আর পুঁজিপতি রাষ্ট্রগোষ্ঠি এবং বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতকে যে ঋণ দেয় তার পরিমাণ এমন যে ঐ বার্ষিক সুদের কাছাকাছি থাকে। তাছাড়া বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামে ভারতের সহায়তায় ক্ষিপ্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ভারতকে ওষধান বন্ধ করা, বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণের এই শর্ত যে বিদেশী ও দেশী কোন পুঁজিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা যাবে না প্রভৃতি স্মরণ করলে বুঝতে কি কোন অসুবিধা থাকে যে, মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হাতিয়ারগুলোই বিশ্ব-পুঁজিবাদ ঋণদানের ঐ অস্ত্রটিকে দেদে দেদে ব্যবহার করছে?

ফলে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতার এই কালপর্বে—বিশেষ করে যখন সেই পথ বাছাইয়ের প্রশ্নটাই তীব্র হয়ে উঠেছে তখন—পুঁজিবাদী বিশ্বের যাবতীয় অর্থ গ্রহণের ব্যাপারে সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা তো বটেই, এমন কি এ-বিষয়ে অতন্দ্র প্রহরার আবশ্যকতা বলে শেষ করা যায় না।

তৃতীয় দুনিয়া স্বীয় উদ্যোগে এবং জাতিসংঘের মঞ্চ থেকেও বিশ্বে এক "নতুন আর্থনৈতিক ব্যবস্থা"র জন্য লড়ছে। বৈষম্যহীন সমানে-সমানে বাণিজ্য নীতি প্রচলনে তৃতীয় দুনিয়া ঋণ কিংবা ভিক্ষার বদলে আপন ঐক্যবলেই যতদূর অগ্রসর হতে পারে। জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থার '৭৬ সালের সম্মেলনে উল্লেখিত হয়েছিল, উন্নয়নশীল দেশগুলি গত বছর উন্নত দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যে তার আগের বছরের তুলনাতেও ৩০ শতাংশ প্রকৃত মূল্য হারায়: রপ্তানিকৃত পণ্যের দর ১৭ শতাংশ পড়ে যায় বলে এক প্রকার ক্ষতি, সেই সঙ্গে উন্নত দেশগুলি থেকে আমদানিকৃত কারখানাজাত পণ্যের দর বেড়ে গিয়েছিল বলে তৃতীয় দুনিয়ার এজুনে ক্ষতির পরিমাণ ৩০ শতাংশ।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি তাদের স্বদেশের কারখানাজাত পণ্য তৃতীয় দুনিয়ায় তথা ভারতেও বেশি বেশি করে রপ্তানিতে যখন খুবই আগ্রহী তখনই তৃতীয় দুনিয়ার কারখানাজাত পণ্য স্বদেশে আমদানির সময় শুল্ক শুল্কের প্রাচীর সৃষ্টি করে। তৃতীয় দুনিয়ার কাঁচামাল নিতে তারা খুবই খুশি, কিন্তু কারখানাজাত পণ্য ক্রয়ে যতদূর সম্ভব বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এরই কয়েকটা দৃষ্টান্ত যথা: তৃতীয় দুনিয়া থেকে তুলো কেনার সময় উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি যখন গড়ে ২ শতাংশ শুল্ক ধার্য করেছে তখন তুলোজাত বস্ত্রের উপর শুল্ক ধার্য করা হয়েছে ২২ শতাংশ; লৌহেতর ধাতু আকরের ক্ষেত্রে উন্নত পুঁজিপতি দেশগুলির শুল্কের পরিমাণ যখন ০·৫ শতাংশ তখন পরিষ্কৃত ধাতুর উপর শুল্ক ১৩ শতাংশ: কাঠের ক্ষেত্রে শুল্কের হার যখন ১ শতাংশ তখন কাঠজাত দ্রব্যের উপর শুল্কের হার ১৭ শতাংশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আজ থেকে ১০ বছর আগে তৃতীয় দুনিয়া থেকে আমদানিকৃত সকল পণ্যের উপর সোভিয়েত ইউনিয়ন, বাণিজ্য-শুল্ক সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছে।

• • •

স্বদেশের একচেটে পুঁজির আচরণ আরও সুতীব্র দৃষ্টি দাবি করে—কারণ এই ক্ষেত্রটি শ্রমিকশ্রেণীর প্রাত্যহিক সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। একচেটে পুঁজির পূর্বাপর ব্যবহার, তার ঐতিহাসিক বিচার, জোড়া ধরে তার সমাধান—এই দৃষ্টিভঙ্গি উপেক্ষিত

হলে সেই হারিয়ে যাওয়াই ভবিতব্য।

পশ্চিমবাঙলার চটকলসমূহের কথাই ধরা যাক। চটকলের একচেটে পুঁজি ভেদা বেড়ালের মত দিল্লী ও রাজ্য সরকার সকলের কাছে নিবেদন করেছে যে শ্রমিকদের বোনাস দেবার মতো টাকা তাদের নেই; তারা আর্থ, রুগ্ন, অসহায়। আনুষ্ঠানিক অডিট-করা হিসেবের খাতাপত্রে তাদের সাক্ষীও নিযুক্ত।

কিন্তু পূর্বাপর ইতিহাস বিশ্লেষণে সকলের কাছে জ্ঞাত যে আকাশচুম্বী মুনাফার টাকা বছর বছর অন্তত পাচার করে এই মালিকরাই চটকল-গুলিকে নিঃস্ব করেছে।

চটকলে একচেটে পুঁজির দীর্ঘ-দিনের লুঠ পূর্বাপর সরকারগুলিরও জানা আছে। প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার যে-তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করেছিল তাদের প্রথম পর্যায়ের রিপোর্টও সরকারের কাছে রয়েছে।

পুঁজিবাদকে বাঁচাবার জন্যই সরকার—কিন্তু একচেটে পুঁজির লুঠ ও উৎপাতে সরকারী কর্তাদের মেজাজ ঠিক রাখাও কঠিন হয়ে পড়ে। দু'বছর আগে যখন কংগ্রেস দল কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারে আসীন ছিল তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্যের মন্ত্রীদের বক্তব্যের কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

চটকলগুলি মরতে বসেছে বলে আর্তনাদের জবাবে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য-মন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় '৭৩ সালের ৪ঠা মে মালিকদের এক সভাতেই অভিযোগ করেন যে, "বিগত কতকগুলি বছরে অঢেল মুনাফা কামিয়েও আপনারা শ্রমিকদের প্রাপ্য দেন নি, এমন কি জুট কর্পোরেশনের পাটের দাম বাবদ প্রাপ্য টাকাও দেন নি।"

১৯৭৩ সালেরই ১১ এপ্রিল পশ্চিম-বাঙলার শ্রমমন্ত্রী মোশাল বাসনাগ রাইটার্স বিল্ডিং-এ এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলেছিলেন যে, মন্দার নাম করে ও অর্থাভাবের দোহাই দিয়ে কিছু মালিকের ব্যবহার ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি খড়দহ জুট মিলের উল্লেখ করে বলেছিলেন, এর মালিক সম্প্রতি জয়পুরে তিনটে ও উত্তর ভারতের অন্যত্র আরও দু'টো নতুন কারখানা স্থাপন করেছে, কিন্তু এ-রাজ্যের চটকলটিকে বন্ধুর করে দিয়েছে।

১৯৭৩ সালেই পশ্চিমবাঙলা বিধান-সভার বাজেট অধিবেশনে মন্ত্রী জয়নাল আবেদিন অসহায়ের মতো ঘোষণা করেছিলেন "আমার দপ্তরের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও চটকল ও চা শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করা অসাধ্য হয়েছে।" (হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড, ১ মার্চ '৭৩)।

এসবই হল মন্ত্রীদের নালিশ। চটকল শ্রমিক ও পাটচাষীদের অভি-যোগ এবং তার বিবরণ দিতে গেলে মহাভারত হবে। বর্ণডিয়ের দোতে রাজহংস হত্যার সে-কাহিনী—সে সম্প্রতি আবার জাতীয় সম্পদ।

সেজন্যই প্রশ্ন, চটকল মালিকদের চলতি খাতা কিংবা ইতিহাসের পাতা কোনটাকে ধরে জাতি অগ্রসর হবে? চলতি খাতা ধরা হলে যখন চটকল মালিকদের জাজাল বিবাহ আবশ্যক, তখন পূর্বাপর ইতিহাসের বিচারে চটকলসমূহকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে একচেটে পুঁজিকে গলাধাক্কা দিয়ে বিদেয় করতে হবে।

চলতি পরিস্থিতি—যখন কেন্দ্রে পুঁজিবাদকে রক্ষা করার জন্য নীতি-ক্ষেত্রে আরও পশ্চাদপসরণ চলছে—তখন চটকলের একচেটে পুঁজি দাবিপত্রের সুর আরও চড়িয়ে দিয়েছে। শ্রমিকদের যদি বোনাস দিতেই হয় তবে চটকল মালিকদের চাহিদা হল, সরকার তাদের উৎপাদন শুল্ক দু'বছরের জন্য আধার স্থগিত রাখুক—যে দেনা হবে সুদহীন, এবং যারো বছর পর পরিশোধ্য। অর্থাৎ চটকল শ্রমিকদের ৭ কোটি টাকার বোনাস দেবার জন্য চটকল মালিকরা সরকারের কাছে চল্লিশ কোটি টাকার দাবিপত্র উপস্থাপিত করেছে।

এই অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী কী করবে? তারা কী শুধু বোনাসের টাকা পেয়ে খামবে—কিংবা চটকল-সমূহের জাতীয়করণের আন্দোলনকেও দুর্বার করবে? শ্রমিকশ্রেণী কী শুধু আমার টাকা বুঝে চাই বলবে—কিংবা একচেটে পুঁজিকে দেশের টাকা দেওয়া যাবে না বলেও আন্দোলনে নামবে?

• • •

জাতীয় নীতিসমূহের নিশান ধনিকশ্রেণীর রাজনীতিকরা যখন পরিহার করছে তখন তাকে অগ্রসর করে নেবার এবং তাকে পরিমাণ থেকে গুণে রূপান্তরের দায়িত্ব শ্রমিক-শ্রেণীর কাঁধেই চেপেছে। পুঁজিবাদী রাজনীতিকরা আজ সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ। তাদের রাজনীতিক এবং ভাবাদর্শগত জোড়াতালির যুগও নিঃশেষিত। অ-শ্রমিক অন্যান্য শ্রেণী ও বর্গের ভাবাদর্শ ও রাজনৈতিক আচরণ ও পরিবর্তনের এই বন্যার মধ্যে ঠাঁই পাচ্ছে না। এসবই মিলে পুঁজিবাদী পথের সামগ্রিক সংকটকে ঘনীভূত করেছে। সকল দল, সকল রাজ-নীতিক এবং সকল মানুষই আসন্ন দিনে বিস্ফোরণের ঘ্রাণ পাচ্ছেন। আর সেজন্যই সংকটের পরিত্রাতা শ্রমিকশ্রেণীর আজ জাতীয় মঞ্চে পৌরুষ নিয়ে প্রবেশ করার মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। এ শুধু শ্রমিক-শ্রেণীর নিজের প্রয়োজন নয়; এ হল জাতীয় প্রয়োজন। এবং সে জন্যই প্রগতিশীল, গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী প্রত্যেকের কর্তব্য হল তাঁর নিষ্ঠা, মেধা ও জ্ঞান শ্রমিকদের মধ্যে ছড়াবার ব্যবস্থা করে প্রলেতারিয়েতকে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণে সাধ্যমত সহায়তা করা।

■

জলাতঙ্ক

বাসের মধ্যে চেপটে ছিলো গৌর নেমে শ্বস্তি হোলো, বাস-টা যেন হড়াক করে বমি করে দিলো গৌর-সহ কয়েকজনকে। চটচটে ঘামে ঘামিরই দুর্গন্ধ। ভিতে হাওয়ায় রাস্তার ধারের নর্দমার গন্ধও উঠে আসছে। তবু হাওয়া-টা ভালো লাগলো গৌরের। বাস-টা তাকে ফেলে চলে গেল।

হাঁটা শুরু করলো। তাড়া আছে। গৌর কলকাতায় সাহাবাবুদের দোকানে কাজ করে। সাহাবাবুরা লোক ভালো। নমঃশূদ্র বলে তাকে ঘেন্না করে না। খাটায় খুব। কিন্তু খাওয়া-থাকা বাদেও নগদ কিছু টাকা দেয়। গৌর তা থেকে বাড়িতে পাঠায়। নিজের জন্যে কিছু রাখে। বিড়ি, এক-আধটা সিনেমা—এ মাসের খরচা আছে। বর্ষাকালে এই কাবা-কিচোড়ের মধ্যে তার বাড়িতে আসতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু মা-র চিঠি পেয়েছে: বর্ষার জলে বাড়ি-ঘর-দোর সব ভেসে যাচ্ছে, অবিলম্বে আসা দরকার। তাই—এ: জুতোটা পড়লো কাদায়। সাহাবাবু তার পরিত্যক্ত এক জোড়া রবারের জুতো দিয়েছে গৌরকে। এক পাটির তলার দিকে একটু ফাটা। কিন্তু সে তো আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। ওপরটা বেশ চকচকে। ঐটে পরে, হাফ শার্ট গায়ে দিয়ে গ্রামে ঢুকবে, লোকজন চেয়ে থাকবে, এইটে ভাবা ছিলো। কিন্তু শার্টের অবস্থা ভাখো না, বাসের চাপে আর ঘামে—ধুৎ। এখন আবার ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামলো। বাস থেকে নেমেই শার্ট-টা টেনে-টুনে একটু ঠিকঠাক করেছিল গৌর, কিন্তু এই বৃষ্টি এখন বারোটা বাজাবে। অবিশ্যি এমনিতেই গৌরের গায়ে খাতির আছে কলকাতার চাকুরে বলে।

'আরে কেত্তা যাব? কোন দিকে যাওয়া হবে?'

এতক্ষণে গৌরের চোখ পড়ল। আরো কয়েক জন—একটা দলই বলা যায়—চলেছে একই রাস্তা ধরে।

'কেত্তা? গৌত্তা না? কইলকাত্তার ধন নাকি? হাড্ডি হাও নাই? যাইত্যাছে'? ঐ দিক তো ভাইঙ্গা গেছে একেবারে আমাগো দিকেও তাই যেই শুনেই তো সদরে গেছিলাম—দল বাইন্ধা।'

গৌর চিনলো—গদাধর মণ্ডল। গৌরের বাপকে চিনতো। সবাই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। সীমানা পেরিয়ে কিছু জমিতে কুঁড়ে করে বসতি পেতেছে নতুন ভাবে। গদাধরদের গাঁ ছিমরাইল, সেখানেই নতুন বসত গৌরের বাপ কুঁড়ে বেঁধেছিল বটতলি। পাঁচ-ছয় মাইলের ফারাক।

'সদরে গেছিলেন ক্যা?'

'আরে এই কইলকাত্তার বাবুর কথা শোন। সদরে গেছিলা ক্যান? ইদিকের খবর কিছুই জানো না বাপ?'

গড়গড় করে গৌর মা-র চিঠির কথা বললো। মা লিখতে পারে না। কাকে দিয়ে যেন লিখিয়েছে। মুন্সিখানার খাতার আধলে লেখা। চিঠিটা ভিজে খরকুটো বেরিয়ে গেছে। পড়তে গিয়ে গৌরের চোখে কাদা লেগেছিল।

'হ রে বাপ পত্তর কি এইছনে ছাপা কাগজ না হইয়া যাইত্ব হইতে পারে। বিত্তির জলে কাগজ, চোখের জলে ক'গজ ভাইস্ক' ভুইস্কা গ্যাছে সব, হাতের অক্ষর নাই রে বাপ। তাই ভইস্কে তো গেছিলাম সদরে। সাহাইত্ব চাই।'

'কেডা দিব সাহায্য?'

'কা'! সরকার গবমেন্ট

'কী কইলেন জেনার'?'

'হা হগল সমস্যেই জন ভাইবা' থাকবেন। ভাবতে ভাবতে হগল পইচ্যা হাইয়া গ্যালো আর আবার নামলো। হালার বিষ্টি, তোর মরণ নাই রে। মর, মর না, তুই মরবি ক্যান? আগে আমাগো সব করতারে মারবি তুই—' আকাশের দিকে হাত তুলে গদাধর চিৎকার করে গালাগাল করতে থাকে।

ওকে শান্ত করবার জন্যে গৌর তার হাতটা ধরে

গদাধর বলে, 'বাপ রে, তুমা শুধা কি শোর পাড়ি সেই বড় কড় হইল যে মনে, সেই যার আমার চাইর বছরের ছাওয়ালডারে নিছে এই জলের রাইক্কস। ঘরের চাইরদিকে জল। কী কইর‍্যা যান পাইড়্যা গেছিল।'

গৌর একটু ঠেলে ঘরে ঢোকে।

গদাধর বলে, 'সেই কিক্সা এই জল থাকলেই ম্যান খেইয়া উঠি। সেই যে জলাতঙ্ক রোগ আছে না—পাগলা কুত্তায় কামড়াইলে হয়—সেই। আমিও; ম্যান পাগলা কুত্তা হইয়া যাই—রাগি, চেঁচাই, ছটফট করি, মারতে ইচ্ছা করে, কামড়াইতে ইচ্ছা করে। কী, বিশ্বাস হয় না। সেই জল তুমি থাখো নাই বাপ। জলের নাম জীবন। কিন্তু জলের নাম মিত্যুও হয়। সেই মিত্যুর মতো জল তুমি থাখো নাই।'

গৌর দেখে, গদাধরের কঠিন মুখের ওপর দিয়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টির কতগুলো সরু রেখা নামছে।

'এই সনেও বৃষ্টি বড় খারাপ। নামছে চত্তিরে-বৈশাখে, নাইমাই চলছে, নাইমাই চলছে। ইয়ার যান আর শ্যাষ নাই। তলাইয়া যাইতাছে সব। তোমাগো ঐদিকের অবস্থাও ভালো না। হ, তুমি কত দিন আসো না বাড়িতে?'

'সাত-আট মাস।'

'সাত আট! তয় তো তুমি কিছুই জানো না।'

গৌর অপরাধীর মতো বলল, 'ছুটি পাই না। চাকরি তো।'

'তোমাগো ওদিকের অবস্থাও খুব খারাপ। জল যান এইটু এইটু কইরা আউগাইয়া আসতাছে। হাঁ কইরা গিলা খায়। সামনে যা পায় তাই। সেডা যে কত বড় হাঁ, তা তো তুমি জানো না, বাপ। মাটি ভিক্সা আকাশ পইর্যন্ত—সেই গরাসের বাইরে কেউ নাই—কেউ না। থাখতাছো না আকাশখান! চাপ চাপ ম্যাঘ—ম্যান জইমা পাথর হইয়া রইছে। পাথরের মতো ভারি, কিন্তু বরফের মতো গলতেই আছে, গলতেই আছে। রাইক্ষসের লালা করতাছে। আর নিচের মাটি থাখো। মাটি কই? কতটুক বাকিয়ার মাটি? মাটি ছাপাইয়া খালি জল—এইটু এইটু কইরা উপরে উঠতাছে—নিচের চোয়ালখান আউগাইতেছে উপরের দিকে। উপরের চোয়াল নামতাছে নিচের দিকে। এই গরাসে আমাগো গিলা খাবে। আমরা তো কেডা। মুষিা থাখো? না, তারে গিলা খাইছে। এই গরাসের মইধ্যে থাইকা পাগলের মতো লাগে না? মনে হয় না পাগলের মতো সব ভাইঙ্গা চুইরা ফেলি?'

বটতলির রাস্তায় গৌরকে এক রেখে গদাধর যখন শিমরাইলের রাস্তায় তার দলবল নিয়ে চলে গেল, তখন গৌরের হঠাৎ একটু ভয় করে উঠলো। কথায় কথায় অনেকটা গাঁয়ের দিকে চলে এসেছে গৌর। যত দূরে চোখ যায়, জল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। নিথর জল। কোনো স্পন্দন নেই। যেন পৃথিবীটা ঘুমে পড়ে আছে, আর তার ওপরে মলমলে একটা চাদর টেনে দেওয়া আছে। এই দুত্তা রাজ্যের কোথায় যাবে সে! ওই চাদরের কোন কোণা-টা তুলে সে আর মানুষদের দেখতে পাবে! ওপর থেকে বিন্দু বিন্দু মৃত্যু ঝরছে। চাদরটা ঘন হচ্ছে। নিচের চোয়াল ওপর দিকে উঠছে। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল, ওপরের চোয়ালও নিচে নামছে। আকাশটা ঘোলাটে মেঘের পাথর-ভারে যেন নেমে আসছে। বৃষ্টি বাড়ছে।

হাঁটতে লাগলো গৌর। এখন আর ঝুন্তো-আমার কথা ভাবতে পারছে না সে। কাঁচা রাস্তায় নেমেছে। রাস্তাটা সে আন্দাজে বুঝে চলছে। সবটাই জলে ঢাকা। পাতে পাতে মড়ার চাদরটা একটু কুঁচকে গিয়েই আবার সমান হয়ে যাচ্ছে।

জল ঠেলে ঠেলেই বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ালো। ডাকলো মাকে চেঁচিয়ে। ছোট ভাই অজয় ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ওর প্রচণ্ড জ্বর হয়েছে।

পাশের বাড়ির দরজায় দেখা গেল বকুলকে। বিলাসের বৌ বকুল। বিলাস গৌরের বন্ধু। সে বারাকপুরে চাকরি করে। বকুলের বাচ্চা হবে। একেবারে ভরা মাস।

ক্রমে আরো লোকজনের দেখা পাওয়া গেল। খবরও শোনা গেল।

সবারই ঘরের মধ্যে জল উঠেছে। চালের অবস্থাও ছিল শতচ্ছিদ্র এত বৃষ্টিতে ছিদ্র এখন গর্ত। ওপরে নিচে জলের আক্রমণে কিছু লোক কয়েক দিন আগেই স্থানীয় স্টেশনের প্লাটফর্মে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। বৃষ্টি কমবার আশায় যারা থেকে গিয়েছিল, তারা এখন যাই-যাই করছে, গৌরকে দেখে তারা হঠাৎ যেন একটু আশ্বস্ত হোলো। তাদের চোখে এই আশার আলোটুকু দেখে গৌর অসহায় ও অস্বস্তি বোধ করে। না হয় সে এসেছে কলকাতা থেকে, কিন্তু কী করতে পারে সে। ওরাও বোঝে সেটা। তখন ওরা স্টেশনের প্লাটফর্মে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়। তর্ক, বিলাপ, আত্মা, ভগবানকে অভিশাপ—এ সবের পরে সবাই জড় হতে থাকে। এখানে কোন্ বাড়িতে কে থাকবে, তা নিয়েও বচসা চলতে থাকে। এর এক ফাঁকে গৌরের মা বিলাপ করেন, গৌর আসতে এত দেরি করল কেন এই জন্যে। আগে এলে কী সুবিধে হোতো তা অবিশ্যি গৌরী বুঝতে পারে না। বুড়ো বিশ্বাসদাদুর হাঁপানির টান উঠেছে, সে অবিশ্রান্ত বকর বকর করে চলেছে, কেউ তার কথায় কান দিচ্ছে না। হঠাৎ গৌরের মা তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো, 'মর, মর, মর।' গৌর প্রথমে বুঝতে পারে নি, পরে বুঝলো, বৃষ্টির মৃত্যুকামনা করছে মা।

কিন্তু বৃষ্টির মরবার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বেশ গা ছেড়ে মেঘেছে। একটা বিরাট দল নেমে পড়ল, এবং গৌর সভয়ে আবিষ্কার করল, দলটা তার ওপর

নির্ভর করে, যেন রাস্তায় নামলো। এত লোকের এত দায়িত্ব! মা র চিন্তাই যত নষ্টের মূল। নইলে এখন সে কলকাতায়, দিব্যি—

'ও বৌমা, বিলাসের বৌরে বাইরে—'গৌরের মা চেঁচায়।

গৌরের চোখ পড়ে, বকুল হাঁটছে। তার বন্ধু বিলাসের বৌ। তার বাচ্চা হবে—এখন-তখন অবস্থা। সে এতটা রাস্তা হাঁটবে কী করে। প্রায় দেড় মাইল। তাছাড়া খানিকটা পাকা রাস্তা বাদ দিলে, বাকি সবটাই জল ভেঙে যেতে হবে। বকুলের শরীরটা টলমল করছে, পা ফেলছে ধীরে, যেন মাটি কামড়ে।

ঘরে ভজনের পা পুড়ছে। ভিজতে ভিজতে সেও চলেছে। বিশ্বাস বাবু অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটছে কাদতে কাদতে। দেখলে মনে হয় না স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছবে।

আরো অনেকে। মাইল-সত্তর জন তো হবেই। তার বেশিই বরং। সদলবলে সারা গা। ভিজে ন্যাতা জড়িয়ে লেপটে কিছুতে চেহারা। মুখে তারা দেবতাকে ডাকছে, কখনো বা অভিশাপ দিচ্ছে। শাঁচি আর জুতোর কথা ভাববার সময় পাচ্ছে না গৌর। হঠাৎ দেখলো সে সবার আগে হাঁটছে। কে যেন হাঁকলো: 'ও গোরা, আড়া। আমরা কি অত হাঁটবার পারি।'

দাঁড়ালো গৌর। পেছন ফিরে তাকালো দলটার দিকে। জল হাঁটু পর্যন্ত। জল ভেঙে এগোচ্ছে দলটা। ছাড়া ছাড়া। শিশুরা কোলে কাঁখে কাঁধে। বুড়ো-বুড়িরা মাথা নিচু করে। মাকে মাকে হোঁচট খাচ্ছে। মেয়েদের হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। কারুর সঙ্গে ছোট পোঁটলা—সেগুলোও ভিজে জাবি। ভজন ঘরের কথা ভুলে গেছে বোধ হয়। বকুলের কাপড় তার শরীরে সেঁটে গেছে—তার দেহ তার তার রোগা দেহকে ছাপিয়ে উঠেছে। একটা ছিপছিপে নৌকোর যেন পঞ্চাশ জন মাল তুলে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু নৌকোর মাঝির তুফানের মধ্যেও প্রাণপণে শক্ত হাতে হাল ধরে আছে। কিছুতেই ডুবতে দেবে না। অঝোরে ঝরছে বৃষ্টি।

হঠাৎ 'আহা-হা হা' করে উঠলো কয়েক জন। বিশ্বাসবাবু পড়ে গেছেন। সারা গায়ে কাদা লেপটে উঠলেন। মুখে খিস্তি ও কাশি অনর্গল চলছে। রাস্তা আর শেষ হয় না। খানা, খন্দ, গর্ত, ইট, বাশ, গাছের গোড়া—সবই জলের তলে লুকিয়ে বসে আছে। এ সবের মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে সমর্থ পদক্ষেপ গৌরের। সাহাবাবুরা তাকে দেখে ভালোই দেখে।

এ বৃষ্টি যেন আর কোনো দিনই থামবে না। বুড়োবুড়িদের হাড় অবধি বোধ হয় জল ঢুকিয়ে গেল। পড়ো, হোঁচট খাও, রক্ত পড়ুক, হাপাও, বুকতে থাকো, পা পা বাধা জড়ুক, তবু চল। গৌরের একবার মনে হোলো বকুল বুঝি আর হাঁটতে পারছে না। হাত ধরে সাহায্যও করা যায় না, সংস্কার বাধে। 'ঐ দিক দিয়া হাঁটো, ওদিকে জল কম।' বকুল মাথাটা কাঁকি দিল। বোঝা গেল, গৌরের দৃষ্টির সামনে সে দাড়াতে চাইছে না, সর্বাঙ্গ ভিজে কাপড় লেপটে তাকে নগ্ন করে তুলেছে।

কিন্তু, এখানে তো তবু কিছুটা নিজেদের মধ্যে, ভাবে গৌর। স্টেশনে তো কত অপরিচিত লোক থাকবে। থাকুক, তবু স্টেশনের প্লাটফর্মেই যেতে হবে। তাদের এই মুহূর্তের মোক্ষধাম।

ঐ তো দেখা যাচ্ছে স্টেশনের ছাউনি। আঃ! আর একটু চল সো সবাই। ঐ যে দেখা যায়। বিশ্বাসদাদু দেখি তোমারে কাঁধে নেই আমি। মা, তুমি ভজনের দেইখ্যো। বকুল, আমি আউগ্যাই, দেইখ্যা ওইয়া আইলো। আর ভয় নাই। ঐ যে দেখা যায়—ইস্টেশন। আইস্যা গেছি।

স্টেশন দেখে সবাই একটু চাঙ্গা বোধ করে। 'যাক্ বাচা গেল এবারের মতো।' বৃষ্টির সঙ্গে মুখোমুখি লড়তে লড়তে ওরা হাঁটতে থাকে।

প্লাটফর্মটা পাকা। কিন্তু সবটা মাথার ছাউনি নেই। ওরা হাড় হাভাতের পা বেওয়ার আগেই ছাউনির নিচের লোকের মধ্যে কেমন একটা সাড়া পড়ে গেল। সাড়া প্লাটফর্মে উঠে ওরা ছাউনির দিকে এগোচ্ছে—এত বিস্তর বাহিনী। এই ছোঁয়া খেতে-না পাওয়া লোকগুলোকে দেখে ছাউনির তলার সাড়াটা কিসের গৌরের ভাবাচাকা লাগে। কিন্তু থামে না। তার পেছনে আহাচোরা মানুষের দলটা পা টানতে টানতে আসছে। সবার পেছনে বকুল। হয় সে হাঁটতে পারছে না, নয় সামনে আসতে নারাজ।

ছাউনির তলার লোকেদের বিচলিত হওয়ার কারণটা বোঝা গেল। এক কৌটা জায়গা নেই। ক'দিন ধরেই ক্রমাগত এখানে লোক আসছে। একদম গায়ে গায়ে ঘেঁসে ছেলে বুড়ো মেয়ে সব জমে আছে। হঠাৎ সেখানে আরো ষাট-সত্তরটা লোকের জায়গা হবে কোথা থেকে। বিচলিত ভাবটা শান্ত ঠাণ্ডা হয়ে এলো—পাথরের মতো। একটা পাথরের দেওয়াল তুলে ওরা দাঁড়ালো গৌরদের সামনে। ঠিক ছাউনি অবধি এক দল। বে-ছাউনি গৌররা। দু'দল মুখোমুখি. গৌররা ভিজছে। বৃষ্টির বেগ বেড়েছে। একজন পাথরের দেওয়ালে একটা ভাটল দেখে পা বাড়ালো। পালটা পক্ষ বাধা দিল। 'এই, এইটা আমার যায়গা।' ভয়ের ঘোরে ভজন চেঁচিয়ে উঠলো, 'শালা, তোর বাপের যায়গা।' 'না, শালা তোর বাপের যায়গা।' ধাক্কাধাক্কি চলতে লাগলো।

গৌর দেখলো, পাথরের দেওয়ালটা টাল খাচ্ছে, টোল খাচ্ছে,

কিন্তু চিড় খাচ্ছে না। বিপক্ষের মুখগুলো হিংস্র, নিষ্ঠুর। পর পর পাথরের পর পাথর। দুই পাথরের একটা ফাঁকে একটা লোক বসে কাতরাচ্ছে—তার পেটে ব্যথা—পেট চেপে ধরে সে কাঁকিয়ে যাচ্ছে। একটা পাথর মূর্তি তার কাছে গিয়ে বলল, 'হাদুদা, খুব যন্ত্রনা হইতাছে?'

'তাতে তোর কি রে শালা।' হাদু চেঁচিয়ে উঠল।

হাদুকে চিনলো গৌর। কলমা-হাটে থাকে। খুব গোঁয়ার-লোকটা। লম্বা চুল ছেঁড়ে গলা। হাদু এদিকে বিশেষ নেই। পাথর-মূর্তির অনেকগুলো মুখই গৌর চেনে, সবই আশপাশের লোক। কিন্তু এখন—

হঠাৎ কী হলো গৌর জানে না, দু' পক্ষে লেগে গেল মারামারি। এক পক্ষ চুকবে, আর এক পক্ষ ঢুকতে দেবে না। তিনজন কাঁপিয়ে পড়েছে একটা লোকের ওপর। তিনজনের ওপর উল্টো দিকের একটা লোক লাফিয়ে পড়লো। একটা লোক গৌরের গলা টিপে ধরেছে। গৌর মারল এক লাথি। গৌরের মা-র কল বেয়ে রক্ত পড়াচ্ছে। ধাক্কা খেয়ে বিন্যাসদাদু খান-বাধানো প্লাটফর্মে ছিটকে পড়লো। গৌর একটা ছেলের গলা টিপে ধরেছে—ছেলেটা গৌরের গলা নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে। এর মধ্যে কয়েকজন মারামারি করতে করতে গৌরদের ওপর এসে হুড়মুড় করে পড়ল। গৌরের জামার খানিকটা ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। এইরকম চলতে লাগলো কিছুক্ষণ। দু'পক্ষের কেউ এখন আর পাথর নয়, পাগলা কুত্তার মতো অন্যকে ছিঁড়ে খাওয়ার চেষ্টা করছে, কামড়াকামড়ি করছে। ছেলে মেয়ে বুড়ো জোয়ান কাউকে মানছে না—পাগলা কুত্তা যেমন কাউকে মানে না। লাগলা চাই। সৃষ্টির বাইরে একটু ভাঙ্গা চাই।

এক সময় বোধহয় ক্লান্ত হয়েই থামলো সবাই। গৌরদের দলের প্রায় সবাই ছাউনির মধ্যে ও ওকে ও ওকে নিজেদের গুঁজে দিয়েছে। তাই নিয়ে এখন খুব খারাপ করে কপড়া চালাচ্ছে উভয় পক্ষ। গৌরের জামার ছেঁড়া একটা অংশ উৎকট এক নেতের মতো তার গলায় জড়িয়ে আছে। সেটা ফেলে দিল ছুড়ে। ছোড়ার কোনো পাত্তা নেই। বাইরে তাকিয়ে দেখলো, প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। আর হঠাৎ নজরে পড়ল, সেই বৃষ্টির মধ্যে যে ছাউনি প্লাটফর্মে একা দাঁড়িয়ে আছে বকুল ভিজে কাপড়ে তার আসন্ন মাতৃত্ব উৎকটভাবে স্পষ্ট হয়ে আছে। এতক্ষণ কেউ তার কথা মনে রাখে নি। মারামারির মধ্যে সে চুকতেও পারে নি। সে একা পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। এখনো আছে।

'বকুল!' ডাকলো গৌর। গলা দিয়ে বোধহয় আওয়াজ বেরোলো না। অথবা বকুল শুনতে পায় নি। নড়ল না সে একবিন্দু। হয়তো বা শুনতে চাইলো না। এতক্ষণ সে বীভৎস কাণ্ড চলছিল, তার বিরুদ্ধে এই হয়তো তার প্রতিবাদ। প্রবল বৃষ্টি তার মাথার ওপর আছড়ে পড়ছে। বকুল শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। এগোবার চেষ্টাও করছে না ছাউনির নিচে লোকে ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে। এখন বকুলকে আনলে নিজের যায়গাটা তাকে ছেড়ে দিতে হয়। কে দেবে? এই প্রশ্নটা নিঃশব্দে উচ্চারিত হচ্ছে বৃষ্টির প্রবল শব্দের মধ্যে।

'ওরে কুত্তার বাচ্চা সব।' হাদু চেঁচিয়ে উঠলো।

হঠাৎ—একেবারেই হঠাৎ—সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে হাদু তার পেটের ব্যথা ভুলে বৃষ্টির মধ্যে কাঁপিয়ে পড়ল সে মারামারিতে ঢোকে নি। পেট-ব্যথা সারলো নাকি? ছুটে গেল সে বকুলের কাছে। বলল, 'মা, তুমি আইসো। আমার যায়গায় তুমি বইসো।'

বৃষ্টির ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগোলো বকুল। সবাই মাথা নিচু করলো। হাদু তার নিজের যায়গায় তাকে বসিয়ে হঠাৎ আবার চেঁচালো ভীড়ের দিকে তাকিয়ে: 'কুত্তার বাচ্চা সব সব শালা।'

তারপর গোঁয়ার গোবিন্দ লোকটা ছাউনি থেকে বেরিয়ে গেল। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। স্থিরভাবে। তার মাথার ওপর যেন গঙ্গা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর সেই প্রবল ধারাকে একা মাথা পেতে নেওয়ার জন্যে সে আকাশ ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ বকুল কুঁকড়ে গিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। কয়েকজন বুড়ি কোথা থেকে একখানা কাপড় এনে তাড়াতাড়ি তাকে ঘিরে একখানা ঘর করে দিল। আশপাশের লোকদের গাল দিল: 'এই শুয়োর বাচ্চা, ওদিক যা, ওদিক যা।'

হঠাৎ হাদুদাও পেটটা চেপে বসে পড়লো। কিন্তু ঐ বৃষ্টির মধ্যেই। হঠাৎ গোটাকত ছেলে বৃষ্টির মধ্যে নেমে গেল: 'এই হাদুদা, বিষ্টি খিক্যা, এইদিকে আইসো।' হাদু আসবে না। ওরা হাদুকে টেনে আনতে লাগলো। হাদু আসতে চাইছে না।

গৌর খালি পায়ে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সে সবই করেছে। কিন্তু তবু যেন কোথায় আলগা। লোকে বলে—কলকাতার হাওয়া। কিন্তু চাকরি করতে না গেলেই বা সংসার চলতো কি করে! দুটো পেট-ব্যথার মধ্যেখানে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ছাউনির ওপর প্রচণ্ড বৃষ্টি।

ইতিহাস নিয়ে রাজনীতি

নরহরি কবিরাজ

জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পরে ভারত সরকারের রাজনৈতিক পলিসি, অর্থনৈতিক পলিসি, এমন কি, সাংস্কৃতিক পলিসিতেও একটি পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ক্রমে, এই পরিবর্তন এমন সর্বগ্রাসী রূপ নিতে আরম্ভ করছে যে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের মতো ব্যাপারটিও আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খবরের কাগজে প্রকাশ, জনতা পার্টির অভ্যন্তরস্থ একটি প্রভাবশালী মহল, আগের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কয়েকখানি ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই বইগুলি পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বাতিল করার জন্যে সুপারিশ করেছেন। এই খবরে আরও প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী নাকি এই বইগুলি প্রত্যাহার করার জন্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছেন।

সঙ্গতভাবেই বিষয়টি শিক্ষানুরাগী নাগরিক মাত্রকেই বিচলিত করেছে। বুদ্ধিজীবী এবং নাগরিকদের বিভিন্ন অংশ থেকে সঙ্গতভাবেই প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

এই বইগুলি সম্পর্কে জনতা পার্টির এই প্রভাবশালী মহলটির এত ক্ষিপ্ত হবার কারণ কি? তার কারণ, তাঁরা জাতীয় চরিত্রকে, জাতীয় ইতিহাসকে, জাতীয় আন্দোলনকে যে রঙে রঞ্জিত করতে চান, এই বইগুলিতে তার প্রতিফলন নেই।

জনতা পার্টির এই প্রভাবশালী অংশের মধ্যে আছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, জনসংঘ, সিণ্ডিকেট কংগ্রেস প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত রাজনীতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা। এঁদের আদর্শগত অবস্থান সুবিদিত। এঁদের মতে ভারত হিন্দুর দেশ। মুসলমানেরা এদেশে 'বিদেশী'। এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাঁরা ভারত ইতিহাসের একটি মনগড়া ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে চান। এঁরা জাতিভেদে, বর্ণভেদে বিশ্বাসী বর্ণ হিন্দুর দ্বারা হরিজন নির্যাতন তাঁদের কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার; শ্রেণীর দ্বারা শ্রেণীর শোষণ তাঁদের কাছে প্রকৃতির নিয়ম। জাতীয়তাবাদ বলতে তাঁরা বোঝেন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ—বৃহৎ বুর্জোয়া বা বৃহৎ সামন্তপ্রভুর চোখ দিয়ে দেখা জাতীয়তাবাদ—যার সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে, নয়া উপনিবেশবাদের সঙ্গে আপস করাটাই নিয়ম। বড়লোকদের পরিবর্তে গরিবদের ওপর নির্যাতন করার স্বাধীনতা—এঁদের কাছে গণতন্ত্র! জনগণের স্বার্থে গণতন্ত্রকে এঁরা মনের মতো তত্ত্ব করেন।

প্রত্যেক দেশের মতোই ভারতেরও দুটি ঐতিহ্য আছে। একটি প্রগতিশীল ঐতিহ্য। অপরটি প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহ্য। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, উচ্চ জাতি ও উচ্চ শ্রেণীর স্বৈরাচার, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে যে প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহ্য ভারতে আছে তারই এঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন। সরকারি ক্ষমতার অংশভাগী হবার পরে তাঁরা রাষ্ট্রীয় পলিসিকে তাঁদের এই প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারায় ঢেলে সাজতে চাইছেন। এটিই হল নতুন ঘটনা।

একথা সুবিদিত যে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদের সম্পর্ক বৈরীভাবাপন্ন। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদীরা স্বভাবতই সমাজতন্ত্রবাদকে তাদের প্রধান শত্রু বলে মনে করে। তাই কমিউনিস্ট বিরোধিতা তাদের আক্রমণাত্মক অভিযানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমন কি, যারা কমিউনিস্ট নয়, তাদেরও তারা কমিউনিস্ট নামে নামাঙ্কিত করে থাকে। কমিউনিস্ট বিরোধিতার জিগির তুলে গণতান্ত্রিক শিবিরে বিভেদ সৃষ্টি করা তাদের অন্যতম কৌশল।

উদাহরণ হিসাবে বলা চলে, আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকগুলির রচয়িতা যাঁরা তাঁদের 'কমিউনিস্ট' বা বর্ণচোরা কমিউনিস্ট বলে চিহ্নিত করে তাঁরা আসল প্রশ্নটা ঘুলিয়ে দিতে চান।

শোনা যায়, এই পাঠ্যপুস্তকগুলি সম্পর্কে তাঁদের যে-সব অভিযোগ আছে তার মধ্যে নাকি একটি—বইগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভূমিকার উল্লেখ আছে। জাতীয় আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা আছে স্বীকার করাই নাকি এঁদের চোখে বড় অপরাধ।

প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন, আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকগুলি তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রকের নির্দেশে রচিত হয়েছিল। কাজেই পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের, নিজস্ব কথামত যাই থাকুক কেন, ভারত সরকারের মূল দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বইগুলি লিখতে হয়েছিল। এই মূল নীতি ছিল প্রগতিশীল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের নীতি। স্বাভাবিকভাবেই, এই বইগুলির বক্তব্য এই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সীমারেখার মধ্যে সীমিত।

বলাই বাহুল্য, মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই বইগুলি লিখিত নয়, এমন কি বিপ্লবী গণতন্ত্রীর দৃষ্টি থেকেও নয়। জাতীয় আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির বিরাট অবদানের কথা এতে বর্ণিত

হয় নি, যদিও শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার উল্লেখ আছে।

তবুও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদীদের এত রাগের কারণ কি? রাগের কারণ, এতে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করা হয় নি। রাগের কারণ, এতে কমিউনিস্ট বিরোধিতা প্রচার করা হয় নি। রাগের কারণ, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ নয়, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বইগুলি লেখা হয়েছে।

বইগুলি লেখা হয়েছে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি হল তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার কর্তৃক অনুসৃত বুর্জোয়া মধ্যপন্থার Left of centre দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গির অবশ্যই সবলতার দিক আছে। সেই সবলতার দিকগুলি (১) ধর্ম-নিরপেক্ষতা, যা কি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, কি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা উভয় রোগ থেকেই মোটামুটি মুক্ত। (২) পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র, যা জাতি ধর্ম শ্রেণী নির্বিশেষে তাবৎ বয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করে; প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যা সরকার গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। (৩) ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনের অধিকার; যা ভারতকে বহু ভাষাভাষী দেশ বলে মনে করে, প্রত্যেক ভাষাভাষীর সমান অধিকারে যা বিশ্বাস করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বলতার দিকও রয়েছে। তদানীন্তন সরকারের পলিসি ছিল মিশ্র অর্থনীতির ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সরকারের পলিসি ছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চিন্তার দ্বারা আবদ্ধ। অন্ধ কমিউনিস্ট বিদ্বেষ—এই সরকারের নীতি ছিল না। তবে; মতাদর্শগত ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট মতবাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা, তার প্রসারকে সঙ্কুচিত করা—এটিও ছিল এই সরকারি নীতির একটি লক্ষ্য।

তবে এই দুর্বলতা থাকলেও ভারত আজও সমাজ গঠনের যে স্তরে রয়েছে, তা বিবেচনা করলে, এই মধ্যপন্থার দৃষ্টিভঙ্গির যে একটি ইতিবাচক দিক রয়েছে এটি মানতেই হবে। ভারতে অসম অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও নিম্ন জাতির ওপর উচ্চ জাতির অত্যাচার অব্যাহত, বিভিন্ন অঞ্চলে এক ভাষাভাষীর দ্বারা অন্য ভাষাভাষীর ওপর নির্যাতন আজও চলেছে, সমাজতান্ত্রিক শাসনের বেড়াজালে আজও ভারতের জীবনীশক্তি নিষ্পেষিত। এক কথায়, মধ্যপন্থার নিপীড়ন আজও যেখানে ভারতের সামাজিক অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে রয়েছে, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা, সংসদীয় গণতন্ত্র, উদার জাতীয়তাবাদের ভূমিকা —একান্ত ইতিবাচক ভূমিকা।

তাইতো ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বর্তমানে যে লড়াই চলছে তা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; তা হল দৃষ্টিভঙ্গির লড়াই; প্রগতিশীল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ বনাম প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের মধ্যে লড়াই।

এই লড়াইয়ে মার্কসবাদীরা অবশ্যই প্রগতিশীল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পক্ষে থাকবে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধটিকে মার্কসবাদীরা আন্তরিকভাবে সমর্থন করে। প্রতিক্রিয়াশীলদের তরফ থেকে যখন প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদের ওপর আক্রমণ আসে তখন মার্কসবাদীরা সেই লড়াইয়ে—প্রগতিশীলদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করে গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম এবং সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম—পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের জন্যে পথ প্রস্তুত করে।

গণতন্ত্রের সংগ্রামের সিঁড়ি পার না হয়ে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে পৌঁছানো যায় না। তাই মার্কসবাদীরা সকল প্রকার গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করে থাকে।

মার্কসবাদীরা জানে প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, ধর্মান্ধতা—সবরকমের অবৈজ্ঞানিক মতবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের বৈর সম্পর্ক। প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ সব চেয়ে অবৈজ্ঞানিক মতবাদ, অপরদিকে, সমাজতন্ত্রবাদ সব চেয়ে বৈজ্ঞানিক মতবাদ। এই দুইয়ের মধ্যে তেল আর আগুনের সম্পর্ক। প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদীরা তা জানে বলেই তারা সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজম সম্পর্কে অন্ধবিদ্বেষ প্রচার করে। ঠিক সেই কারণেই, সমাজতন্ত্রীরা প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রথম সারিতে এসে দাঁড়ায়।

প্রকৃত পক্ষে, পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সম্প্রতি যে লড়াই চলছে তা এই বৃহত্তর আদর্শগত সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই এটিকে লঘু করে দেখলে ভুল হবে।

প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদের আক্রমণ আমাদের রুখতেই হবে। এই কাজে সমস্ত সংকীর্ণতা পরিহার করে মার্কসবাদী, অ মার্কসবাদী, বামপন্থী, গণতন্ত্রী, এবং সব ধরনের প্রগতিশীলদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। এই সংগ্রামে জনতা পার্টির অভ্যন্তরে যে প্রগতিশীল শক্তিগুলি আছে তাদেরও কাছে আবেদন জানাতে হবে।

পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের সংগ্রামকে একটি উচ্চতর আদর্শগত সংগ্রামের পর্যায়ে উন্নীত করাই হবে এই মুহূর্তের কাজ।

■

বিলের বাজনা

অমলেন্দু চক্রবর্তী

'হ্যাভ ইউ সিস্টেমস্ অ্যাট দেয়ার ইন্ রেকর্ডিং বিজনেস্ টান্-আকশান ?'

সশস্ত্রবাহ নয়, মুখোমুখি মাত্র তিন জন, স্যুটকোটটাই-এর বাঙালী সাহেব। নিরাপদ ভাবছিল—'ইউ সিস্টেমস্ স্যর, সিক্সটি এনটি অ্যাণ্ড ডাবল এনটি—'

'হুইচ সিস্টেম্ ইজ্ মোর প্রেফারেবল ?'

'ডাবল এনটি'

'হোয়াই ?'

জল চাইলে কি জল দেবে এরা ভয়ও আস্তে আস্তে, নিজের সাধ্যমতো কারণ ব্যাখ্যা করে যাচ্ছিল নিরাপদ, পাইপ-টুকট-সিগারেটের ধোঁয়ার বুঁদ, বাপের বয়েসী বাঘা বাঘা তিনজন তেজী মানুষের সামনে, গাছের আমজামকাঁঠাল গাছের ছায়ায় নিজেদের ভাঙা মেটেঘরের বাইরে, জীবনে প্রথম বলেই হয়তো, এত তুচ্ছ, কীটপতঙ্গ মনে হচ্ছিল নিজেকে, মুখস্থ উত্তরগুলিও গুলিয়ে যাচ্ছিল। এত বিশাল ঘর, রং-করা দেয়াল, জানলা দরজায় কতো রঙের বাহার, কাচের ঘেরাটোপের বাইরে সার বাঁধা টেবিলে টেবিলে খটাখট খাটাখট টাইপ রাইটিং-এর তুফান চলেছে। রাত রাজত্বপুরে টিনের চালে অবিরাম বৃষ্টি-পড়ার মতো।

'তুমি তো সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট ?'

'আজ্ঞে—'

'তোমাটা ! আজ্ঞে ! আজ্ঞে কী বি স্মাট !' এত জোরে ব্ল্যাকবোর্ডিন, ডিরমি খেতে নিরাপদ তার অপরাধের ইতিহাস খোঁজে।

'কিভিক্স্ পড়ে রাইটিং-সিস্টেমের এত সব জানলে কী করে ?'

'আমার এক কাকা স্যর, এম কম্। তাঁর কাছেই

'তিনি কী করেন ?'

'ইস্কুল-মাস্টারি।'

'পেলে কে জানো ?'

'আ আ প্ আ' নিষিদ্ধ শব্দের উচ্চারণে নিরাপদ অতমত খায়।

'অল্ রাইট্, নিল্স্ বোরের নাম শুনেছ ? প্রফ হাইজেনবার্গ আইনস্টাইন্ ?'

বাঁচালেন আইনস্টাইন। যেহেতু ওই একটি নামই তার পরিচিত এবং এই ছিমছাম পরিবেশে যখন টাইপ-রাইটারের দুরীগত ধ্বনিগুলি তার মগজের শিরায় শিরায় অবিশ্রান্ত ছুঁচ ফুটিয়ে যাচ্ছে, এরকম একটা চাকরি পাওয়া, অন্তত তার পক্ষে যখন প্রায় অসম্ভব মনে হয়, ঘরপাক খাওয়া অথবা ভয়ে নিরাপদ চোখ বুঁজে অন্ধকারে শব্দভেদী বাণ ছুঁড়ল—'বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর—'

'তোমাদের গ্রামে কো-অপারেটিভ আছে না একটা সেক্রেটারির নাম কী ?'

'শ্রীপরেশচন্দ্র নায়েক।'

'হাউ ইজ্ হি ?'

বিটকেল পরেশ নায়েক কেমন লোক···পৃথিবীতে এটা যে একটা প্রশ্ন হতে পারে কখনও এবং তাকে উত্তর দিতে হবে—মাথায় পেরেক রেখে এতক্ষণ হাতুড়ির পর হাতুড়ি ঠোকার পরে, প্রথমদিকে কিছুটা খাবড়ে গেলেও নিরাপদ ঠোঁট কাঁপিয়ে বলল, অন্তত বলতে চেষ্টা করল—'ভ-ভ-ভ··· লো, ভালোই তো'

'এখন কী করে'

বুকের সন্ত্রাস হাঁটুর কাঁপুনি অনেকটা কমে এসেছে আত্ম-বিশ্বাসে ফিরে এসে নিরাপদ এবার একটু হাসতে চাইল—'ফোটো তোলে টিউশানি

'কোথায় ?'

'গাঁয়েই।'

'এনিথিং মোর ?'

'গাঁয়েই বড় খামকল আছে একটা। সেখেনে খাতা লিখি

'এ ঘরের ইলেকট্রিসিটি এ সি না ডি সি

নিরাপদ মাথার ঊর্ধ্বে পাখার দিকে তাকাল—'এ. সি স্যর।'

'অল্ রাইট্, এসো। চিঠিতে জানতে পারবে।'

কড়িকাঠে ঝুলন্ত বিশাল ঘর থেকে বেরিয়ে আসার মুখে যদিও তার একটা মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল, শেতলকাকা বলে দিয়েছিলেন—'চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় খুব আস্তে 'আল্লা হউ' বলে উঠবি, ওটা নিয়ম, সাহেবসুবোরা খুশি হন।' 'তালেগোলে কি যে হলো', সেখানে বেরোতে পারলেই খাম দিয়ে জল ছাড়ে, বাইরে এসে টাপ ছেড়ে বেঁচেছিল নিরাপদ। বাইরে তখন আরও অনাসাতেক অপেক্ষা করছে। সবাই গাঁয়েরই ছেলে কিংবা আশেপাশের গাঁয়ের। সকলেই চেনা। ওরা ডেকে বলল 'আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিট ধরে কী এতো কথা বললি বল্ দাদা! চাকরি ত তোর হয়ে গেল

আধঘণ্টা নিরাপদ খুশি হয়। সত্যিও শেতলকাকার খড়িটা তার বাঁ হাতের কব্জিতে বাঁধা ছিল ঠিকই, সে সময় দেখে নি। বরং এই উৎকট সম্ভাবনা থেকে রেহাই পেতে একভোগে সরে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জুতোজোড়াটা খোলার চেষ্টা করল।

উঃ বাপস্! এরকম সর্বোনেশে জুতো কেউ পরে! ভাগ্যিস্ শেতলকাকা একটু বেঁটেখাটো হালকামতো ছোট মানুষ। জামাপ্যান্টটা মোটামুটি ভালোমতোই গায়ে এঁটে গিয়েছিল। কিন্তু বেখাপ্পা চাউস পায়ের জুতোজোড়া যে কি' ছাই, চারদিকে চলচল করে। খুলে খুলে যায়। সামনের দিকে ঝাকড়া গুঁজে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে কোনরকমে কাজটা সারা গেল, কিন্তু ইন্টারভিউটার পর আর এক মুহূর্ত নয়, জুতোজোড়া খবরের কাগজে মুড়ে বগলে ফেলে বন্ধুদের দিকে ফিরল।

ভারতজোড়া হাঁকডাক, এমন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পাঁচশত আউত্রিশতম শাখা খোলা হয়েছে তাদের গ্রামে। বছর পাঁচেক আগে, ইস্টিশানের লাগোয়া বাজারের ধার ঘেঁসে সতীশ মুখুজ্জের নতুন পাকা-বাড়ির পুরো দোতলাটা ভাড়া নিয়ে প্রথম যখন আপিস খোলা হলো, একজন ম্যানেজার আর একজন কেরানিবাবু এলেন বাইরে থেকে। সেসঙ্গে রাইফেলধৃক একজন বিহারী গার্ড। সিমুরালি মৌজার চারদিকে গ্রামে গ্রামে, শুধু সিমুরালি কেন, ইস্টিশান ছুঁয়ে পুবে পশ্চিমে লম্বা পাকা সড়কে বাস চলে বলে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে দূরি চাপাতলি মাথাভুবি, নাথরা পুঁইখালি অবধি তার ঢেউ। ধানচালের কারবার, আলু-পিঁয়াজের কাঁচাপয়সা ইশকুল-কো-অপারেটিভের টাকা, এমন কি তেজারতি-মহাজনী কৃপণের ধনও এসে উপচে পড়তে লাগল। মাসকয়েকের মধ্যে ফুলে ফেঁপে এমন হল, কলকাতা-বর্ধমানের ডেলিপ্যাসেঞ্জার ম্যানেজারবাবু কেরানিবাবু বৌ-ছেলেপুলে নিয়ে গাঁয়েই ডেরা বাঁধলেন। গ্রামের ব্যাঙ্ক হলেও লোকের অভাবে শহরের ব্যাঙ্কের বিস্তর কাজ। পোড়ার দিকে যুধিষ্ঠির পাঁতরার হাবার সেকেণ্ডারি পাস মেজোছেলে কি করে যেন ক্লার্ক-কোর স্টাফ আর্দালির চাকরিটা বাগিয়ে নিয়েছিল। আরও লোকের দরকার হতেই, অন্তত আরও একজন কেরানি, একজন পিয়ন এবং যেহেতু উদ্বোধনী দিনে কর্তারা ঘোষণা করেছিলেন—চাকরির ক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষিত যুবকদেরই অগ্রাধিকার, সাবলিস্ট ভদ্দরলোকগোছের ম্যানেজারবাবু প্রশান্ত হলেন, যেন জাগাড়ে পড়েছেন, সকালসন্ধে ঘরেবাইরে উঠতে-বসতে চিলকুল তাড়ানোর দায়। গোটা তল্লাট জুড়ে হুলুস্থুল বেধে গেছে। গাঁয়ের মানুষের আর কোন কথা নেই, চাষ-আবাদ পরিবার-কলহ মামলা-মোকদ্দমা সব বন্ধ, বসটা গাঁয়ের শিক্ষিত ছেলেরা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে প্রাণপণে ছুটছে। প্রায় শতাধিক আবেদনপত্র, একটা চাকরি। মুরুব্বি-মাতব্বররাও নেমে পড়লেন। যাঁরা লাখ লাখ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করেছেন, মাসে মাসে হাজার হাজার টাকা এনে তুলে দিচ্ছেন ব্যাঙ্কের সিন্দুকে, ঘরে গ্র্যাজুয়েট ছেলে থাক আর নাই থাক কোনো-না-কোনো ছোঁড়ার জন্য তাঁদের সকলেরই সারিশি উমেদারি আছে। রোজগারপাতির টাকাকড়ি, হাঁড়ির খবর বিশ্বাস করে তাঁরা ব্যাঙ্কের ঘরে তুলে দিয়েছেন, এখন ব্যাঙ্কের বাবুরা যদি সেই বিশ্বাস না রাখেন, নিজেদের পছন্দমতো ছেলেছোকরার হাতে সেই কাগজপত্তর না থাকে, যদি হাঁড়ির খবর বেমকান হয়···গাঁয়ের চারদিকে ঘোঁট বাঁধতে শুরু করল। জটিল থেকে আরও জটিল অবস্থায়, পাকে পাকে জড়িয়ে গিয়ে সত্যি মিথ্যে মিশিয়ে দুহাত তুলে প্রাণে বাঁচতে চাইলেন ম্যানেজার বাবু—'আরে মশাই, আমি কে? কোন হরিদাস পাল। ওপরওলাদের তো লিখেছিলাম। তা আর্দালির পোস্টটা তো সান্‌ক্সান্‌ডই হল না। ক্লার্কের চাকরির অ্যাপ্রিকেশানটা আমি নিতে পারি মাত্তর। সিলেকসান কিলেকসান সব মশাই কলকাতা থেকে হয়। ধরাকরা করবেন তো সেখানে যান। ক্যাবোর্ড রোডে মস্ত আপিস···'

ম্যানেজারমশাই তো রেললাইনের লম্বা রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। বরং এই রাস্তাতেই মা-ছেলে তবু কিছু চেনাজানার ভরসা ছিল মধু আঢ্যের বড় ছেলে শীতলের। শীতল নিরাপদর দূর সম্পর্কের কাকা। মধু আঢ্য জাতিতে তামলি। বংশের চৌহদ্দিতে এতকালে খুব বেশি লেখাপড়া শেখার কথা ভাবে নি কেউ কোনদিন। শরিকে শরিকে, তন্ত শরিকে ভাগ হতে হতে এখন বিঘে চারেকের মতো ধানি জমি, কিছু চড়ার ফসল, বাজারে ছোটমতো একটা মনিহারি দোকান—এই নিয়ে সংসারে দশবারোটা পেটের জোগান হয় না। এরই মধ্যে শীতলটা হঠাৎ, কবে কখন কোথায় যে কোন অবুঝ ঠাকুর দেবতার বর পেয়ে গেল, গ্রামের হাবার সেকেণ্ডারি ইস্কুল থেকে ক্লাসে ভালোভাবে পাস দিয়ে কী সব ফার্স্টফিকির করে কলকাতায় গিয়ে ভর্তি হল রাত্তিরের কলেজে। খেয়ে না-খেয়ে আধা-খেয়ে হরেকরকম ঘ্যাচড়ামি করে গোটা তিনেক পাসও দিয়ে ফেলল পাঁচ বছরে। অ্যাকাউন্টেন্সিতে অনার্স গ্র্যাজুয়েট, এম কম। কিন্তু এত করেও গাঁয়ের বড়ো ইস্কুলে মাস্টারি জুটল না কিছুতেই। মধুআঢ্যির জাতি কুটুমরা পিছু লাগল। মুরুব্বি মাতব্বরদের পাতা ভোলা চাটুজ্জে পনের বছর ধরে ইস্কুলের সেক্রেটারি, শীতলের উপর কেন যে এত রাগ।

গ্রাম ছেড়ে জের কলকাতা গিয়ে ইস্কুলের মাস্টারি নিল শীতল। একদিন বাজারে ভোলা চাটুজ্জেকে ঘরে দশজনের সামনে এমন আচ্ছা করে ধুয়ে দিলেন মধু আঢ্য, দুই বুড়োতে হাতাহাতি বাধে আর কি। ভোলা চাটুজ্জে প্রতিশোধটা নিলেন পরে। এই ব্যাঙ্কের চাকরিতে। বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টের ব্রাঞ্চ, প্রথম ইন্টারভিউটা হয়েছিল উত্তরপাড়ায়। লিখিত পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিল শীতল। খবরটা চাউর হয়ে গিয়েছিল গ্রামে। ইন্টারভিউটাও ভালো হল। সবাই জানত, চাকরিটা নির্ঘাৎ ওর। ওই পাবে। কিন্তু ভোলা চাটুজ্জেও কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংএ চাকরি করেন। জবরদস্ত মানুষ। মোড়লমুরুব্বিদের সর্বসম্মত প্রার্থী রাখাল ঘোষালের ছেলে মদনের জন্য আপিস কামাই করে এমন লেখালেখি ছুটোছুটি শুরু করে দিলেন, কলকাতার বড় আপিসে প্রায় আট মাস নিয়োগপত্রটা ঝুলে রইল। শেষ অবধি মুরুব্বিরাই জিতলেন। মদনার চাকরি হল।

এ যেন পরাজিত বীরপুরুষ শীতলকাকা নিরাপদর গুরু। ব্যাঙ্কের চাকরি তার জীবনের বড় স্বপ্ন ছিল। সাধ মিটল না। মিটবেও না। বয়স পেরিয়ে গেছে। এখন শুধু কলকাতায় সকালে বিকেলে রাত্তিরে টিউশানি, দুপুরে মাস্টারি আর ফাঁকে ফোকরে ইন্সিওরেন্সের দালালি। বিয়ে করেছেন। হপ্তায় হপ্তায় গাঁয়ে আসেন। কথা বলেন না কারও সঙ্গে। কিন্তু কাজকর্ম বেড়ে যাওয়ায় গাঁয়ের ব্যাঙ্কে আরও একজন লোক নেবে বলে যখন বিজ্ঞাপন বেরোল, ইন্টিশানের মেয়রালে পঞ্চায়েতের নোটিসবোর্ডে টাইপ-করা কাগজ সেঁটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যখন আবার সোরগোল হৈ চৈ, কোত্থেকে খবর পেয়ে সেই ঠাণ্ডা-বনে-যাওয়া মানুষটা, শেতলকাকা ছুটে এসে নিরাপদকে বাসনে বললেন—'তুইও ত খরির বিধবা মায়ের ছেলে। এ্যা পাড়া। ইস্কুলে ভালো ছাত্তর ছিলি। কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছিস চোখ-জোড়া জলছিল মানুষটার···'অনার্স না পাস, বি এস সি ত পাস করেছিস্। নে অ্যাপ্লাই কর। আমি দেখব ···' ভিতরে ভিতরে কী যে প্রচণ্ড টান-ছিঁড়ামির রাগ, শক্ত করে ফেলে ছেড়েই ফেলতে চাইছিলেন নিরাপদর কব্জিটা। 'ওদোরের বাচ্চা ভোল' বামনা, আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট অর্ডারের সইসাবুদ বন্ধ চিঠি লিখেছিল কলকাতাতে। ওই হারামিগুলোর মুখ থেঁৎলে দেব এবার ···'

নিরাপদর লোভ ছিল লোভ বাড়ল। এবং ভয়। বাবা মারা যাবার পর কাকাদের গাঁতকাড়া মুখঝামটা খেয়ে ওরা ভাইবোনরা মানুষ। মা মুড়ি ভাজেন চিঁড়ে কোটেন, ঘুঁটে বেচেন, সংসারে দুবেলার রান্না রেঁধে জাকিরদের দাসীবৃত্তি করেন। পাস করার পর তিন বছর হাজার চেষ্টা করেও চাকরি নেই। সন্তায় ছাত্তর-পড়ানো আর রজনী ঘোষের কলে খাতা লেখা। বাইশ বছর বয়সেই যখন জীবনে বিশ্বাস, লোভ চাগিয়ে দিল ব্যাঙ্কের চাকরিটা। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারল না শেতল-কাকাকে। খেড়োগাই-এ ওরদা কী! বরং মুরুব্বিদের চোখে পড়ার চেষ্টা করল কিছুদিন। দেখা হলেই ভোলা চাটুজ্জেকে পেন্নাম, মাথা চুলকে কথা বলা, ঘরেক রকম আবড়াগাবড়ি। এবং যখন জানাজানি হয়ে গেল, মাতব্বররা এবার নস্ত চক্কোত্তির ছোটভাই

হারুকেই পাঠাবেন বলে স্থির করে ফেলেছেন, যে হারু কলকাতায় একটা চাকরি করে এবং যাকে গাঁয়ে আনার জন্যেই এত তোড়জোড়, নিরাপদ ছুটল কলকাতায় শেতলকাকার কাছে। অবিশ্যি বেশ এক প্রস্থ খিস্তি খেতে হল প্রথম কিন্তু তারপরই শেতলকাকা ধরাধরি ছুটোছুটি শুরু করে দিলেন এদিক-ওদিক—নিকুচি করেছে শালা স্যালনালাইজেশনের। ওষ্টির পিণ্ডি। পরিবার চালি রুগ পাবে না, খটিয়াটি বেচে ব্লাকে সস্তা খোল কিনবে আর তেলামাথায় তেল চালবে শালারা। একটা চাকরি হাজারটা ছেলে। আর সেই চাকরিটাও হবে মাঠজোড়া জোতজমির মালিক, ভেজারতি দুনম্বরি হারামি শয়তানগুলোর কথায়...'

অবিশ্যি শেতলকাকা ঘরে বসে যতটা তড়পান, বাইরে তা নন। চেনাজানা লোকেদের ধরেকরে বড় আপিসের যে দুচারজন সাহেবসুবোর সঙ্গে কথা বলেছেন, সেখানে একেবারে অন্য মানুষ। ঘাড় নিচু করে হাত কচলে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কথা—'একবার একটা অবিচার হয়ে গেছে স্যর...অবিশ্যি ও যদি পরীক্ষায় ইন্টারভিউতে আপনাদের খুশি করতে না পারে তো সে ভিন্ন কথা। কিন্তু দেখবেন স্যর, যেন শয়তানগুলোর ছোবলে...'

দু-এক জায়গায় নিরাপদও সঙ্গে ছিল। বিরাট বিরাট আপিসের বড় বড় সব মানুষ। চোখ কপালে গিয়েছিল তার। শেতলকাকা বলেছিলেন—'অত ঘাবড়ুচ্ছে, মঙ্গল হালদার পেদ্দাম কোম্পানির সব হারুর জন্যে কাড়ি কাড়ি ট্যাকা ঢালবে। ট্যাকা শালা আমিও ঢালব। তুই শোন দে' দিবি। কিন্তু আমার তো অতো ট্যাকার জোর নেই রা। বলিস তো বৌদিকে, যদি কোনো সোনাদানা...'

মেটেঘরের কোণে মাটির তলায় লুকোন হাঁড়ির ধন সব মিলিয়ে ভরি ছিনেকের এক জোড়া আড়াই প্যাচি অনন্ত, একটা মাদ্রাসা, একছড়া সরু হার, দাকরাস্তিরে মা লাবণ খুঁড়ে তুললেন। কানে কানে বললেন—'এইটুকুন মাত্তর আছে রা শেতলা। তা দে' দেব। তুই যখন চাইছি...'

শেতলকাকা সেগুলি চান নি এখনও—নিরাপদ জানে, নিজে কত টাকা ঢেলেছেন, আদৌ ঢেলেছেন কি না, সে জানে না। শেতলকাকা সত্যি সত্যি ঝেড়ো বাঁট। পেল্লাই পেল্লাই জাঁদরেল সব সাহেবসুবো, কি করে সে কি হয় সেখানে, কিসে চিঁড়ে ভেজে! হাড়হাবাতে কেরানি তো নয় যে ধমকে ঘুষ দেবে। বড় মানুষকে ঘুষ দিতে হলে বড় মানুষ হতে হয়। তানে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না, হাড়ঘাস সিটকোন মাস্টার...এখন কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছে না নিরাপদ। রক্তে রক্তে ক্ষোভ বাড়ে। রাগটা গিয়ে পড়ে শেতলকাকার উপর। অন্তত টাকাটা যদি খাইয়ে রাখা যেত কাউকে, একটা ভরসা থাকত।

শেতলকাকার চলচলে জুতোজোড়া কদমদাবা করে বন্ধুদের মধ্যে ফিরে আসে সে। একটা বিশাল ঘরের মাঝখানে খাট পালঙ্কের চেয়েও বড় টেবিলের চারদিকে অনেকগুলি চেয়ার। সেখানেই বসতে দেওয়া হয়েছে সবাইকে। চৌকাঠ পেরিয়েই সে অনুভব করল, কিছু একটা ঘটেছে এখানে। সকলেই কেমন যন্ত্র মেরে আছে। একবার শুধু নিঃশব্দে ওর দিকে তাকাল সবাই। উপস্থিত সকলের চেয়েই সে যখন বয়সে ছোট এবং গ্রাম সুবাদে সকলেই যখন দাদা অথবা কাকা, নিরাপদ অত্যন্ত সন্তর্পণে, ভয়ে ভয়ে এগোল—'কী হয়েছে গো নাণ্টুদা?'

'কী আবার হবে?' পরান হালদারের বড় নাতি নাণ্টুর অকারণ বিরক্তি।

নিরাপদ গলা খাটো করে আনে—'তোমরা কেউ কথা বলছ না যে! কার ডাক পড়েছে গো? কে গেছে?'

'কে আবার...' ওদিক থেকে পাঁচ নিঃশ্বাসে নিরদাঁড়া টান-টান করে নড়েচড়ে বসে বেলতলির নেতাই আদক—'তোদের পাঁয়ের ছেনাথ ছুতোরকে দে' যার পাছার মাপে নকুন চেয়ার বানিয়ে রেখেছে বেঙ্কের ম্যানেজরবাবু, তিনিই গেছেন...'

হারুদা। বুকটা ধলকে ওঠে। হারুদার বাচাই চলছে এখন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের সকলের প্রতিদ্বন্দ্বী। নিরাপদ কব্জিতে সময় দেখে। তিনটে দশ। না, ঠিক দশ নয়, বারো। ব্যগ্রতা ভীত হয়—'কখন গেছে বলো তো ঠিক ঠিক...'

'মিনিট পাঁচেক হবে।'

মিনিট পাঁচেক। নিরাপদ হিসেব মেলায়। বারো থেকে পাঁচ গেলে সাত। বেলা তিনটে সাতে ভিতরে ঢুকেছে হারুদা। কখন বেরোবে সে, হিসেব রাখবে। তার জন্য যদি চল্লিশ মিনিট লাগে, হারুদাকে ততক্ষণ ধরে রাখবেন ওরা! শেতলকাকা বলেছিলেন—'যত বেশি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তোকে, যত বেশি সময় লাগবে, বুঝবি তত ভাল হচ্ছে তোর ইন্টারভিউ। এলেবেলেদের

দেখবি দুচারটে প্রশ্ন ওদিকেই ছেড়ে দেয়

চারদিকে একে একে আটজনের পিঠ চুঁয়ে চুঁয়ে ন-নম্বর চেয়ারে গিয়ে বসল নিরাপদ। ঘা গরম। তার উপর বুকের চিপচিপানি। মাথার উপরকার পাখাটা ঘুরে পড়ল। তা হোক, গাঁয়ের ছেলে, ইলেকট্রিক পাখার বাতাস না খেলেও চলবে তার। অনেক দ্বিধা, অনেক ভাবনার পরও বগলের মোড়কটা সে দামী কাঠের অমন চকচকে টেবিলের উপরই রাখল। ঠক করে বড়োসড়ো একটা শব্দ উঠতেই সবাই চমকে তাকাল—'ওটা কী রা···'

'জুতো।'

'জুতো! কার জুতো?'

নিরাপদ হাসে—'সেতলকাকার। এই আমাজুতো প্যাণ্ট সবই তো সেতলকাকার। জুতোটা এমন বেখাপ্পা···'

'তাই বলে জুতোটা খুলে ফেললি তুই' ভূত নিকি রা! আ! এখন পায়ে কিরবি কী পরে?'

'কি করব! খালি পায়'

'খালি পায়! যাহারের প্যাণ্ট-জামার সঙ্গে খাড়া পায়ে। তুই সত্যি সত্যি এটা খাড়া ভূত মাইরি···'

গাঁয়ের মোটামুটি সম্পন্ন গেরস্তঘর ঘরুয়ার বন্ধুর ছেলে ছেলুদার হাসিতে নিরাপদর পায়ের দিকে উঁকিঝুঁকি মেরে হাসতে চেয়েছিল সবাই। কিন্তু অনেকেই হাসল না। ছেলুদা হাসতে হাসতে প্যাকেট খুলে সিগারেট বরাল।

'ভূত বলিস আর যাই বলিস, যতোই মনকরা কবিস, চাকরিটা যদি কোনো রকমে ছাড়তে হয়, সে তো এই খাড়াই পায়ে রা···' ওদিক থেকে আস্তে আস্তে মুচকি কাটে হিজলপাড়ার সন্তোষ।

'সে আর বলতে, আমাদের তো কারও তেমন সেতলকাকা নেই

বিচলিত অসহায় নিরাপদ হঠাৎ চড়াক করে উঠে দাঁড়ায়। তাকায় চারদিকে। যেকে না কেন এমন করছে এরা? সারা শরীরে ঝিলিবিটির জ্বালা—'কি গো, তোমরা এমনধারা ঝগড়া করছ কেনে? আমি কী করেছি তোমাদের?'

ওদিকে হাসিটা চাড়িয়ে যায় এবার। সহদেব ফুট কাটে—'লক্ষ্মী এমন কী মন্দ কথাটা বলেছে বল্ দিকিন। দুদিন বাদে তুই যখন বেহের বাবু সেজে নতুন জুতোর মচমচ তুলে গাঁয়ের রাস্তায় বুক চেটিয়ে যাবি, তখন চোখ টেরাবে না ছেলুর! এখন ভূত বলছে তোকে! এত সাহস!'

নিরাপদর ঠোঁট কাঁপে চোখ ফেটে কান্না পাচ্ছে তার।

ওরা ছাড়ে না। লক্ষ্মী অধিকারী

স্কেচ : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

লাফিয়ে ওঠে—'তখন তোর কত দাম রয় স্যাড়া। কম করে কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা নগদ, তরি পঞ্চাশেক সোনা। তার সঙ্গে ভাগোরডোগর কন্যা এট্টা জ্যান্ত মেয়েছেলে মাইরি। উঃ, কী যে কপাল করে জন্মেছিস তোরা…'

জন্মো থেকে চেনা, জানাশোনা গাঁয়েরই ছেলে সব। দু-চার বছরের বড়ো হলেও গাঁয়ের ইস্কুলে একই সঙ্গে পড়েছে সবাই, অনেকের সঙ্গে রোজই ফুটবল খেলে তামলিপাড়ার মাঠে আজই তো একই রেলগাড়িতে চেপে হৈ-হৈ করতে করতে বর্ধমান শহরে এসেছে ইন্টারভিউ দিতে। হঠাৎ এরা সব রাতার নেড়ি কুকুর হয়ে উঠল কেন? কি করবে ভাবতে না-পেরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার অভিপ্রায়েই নিরাপদ যখন জুতোর মোড়কটা দু-হাতে চেপে ধরল, দরজায় এসে দাঁড়াল ব্যাঙ্কের সেই লোকটা—'প্রদীপ বসু কে? প্র…দী…প ব…সু…স…'

জুতোর ভেতর সিগারেট মাড়িয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে দাঁড়াল ছেনুদা। নিরাপদ চমকে উঠল। এরই মধ্যে হয়ে গেল হারুদার! ঘড়িতে মাত্র সাড়ে তিনটে। না, ঠিক ঠিক সাড়ে তিনটেও নয়, সাতাশ। মাত্র পাঁচশ মিনিট। যদিও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বুকের আধাআধি ভরে উঠছে আবার, সকলের মতো ছেনুদার দিকে তাকিয়ে থেকেও নিরাপদ হাসতে পারছে না। উঠে দাঁড়িয়ে দুহাতের আঙুলে জামার প্যান্টে টোকাটাকি মেরে, ধুলো ঝেড়ে, রুমালে মুখ ঘষে পুবদিকে দুহাত তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল ছেনুদা। কি বিড়বিড় করল মনে মনে। তারপর হাত নামানোর সময়—'জয় জয় মা, ভালো কিছু হলে এবার পুজোয় জোড়া পাঁঠা মানো…'

'আই আই ছেনু সহদেব লাফিয়ে ওঠে—'পুজোর পর কিন্তু হবে তো রা। নইলে কিন্তু আমি নেই…'

'আআআট শালা, তোকে থাকতে বলেছে কে?' দরজা পেরিয়ে বেরিয়ে যায় ছেনুদা। বিশাল নিরাপদ আবার বসে পড়ে। ঠাকুরদেবতা নিয়ে এমন মশকরা করে—এদের কি ভয়ডরও নেই! কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছে না সে। কেমন থামচি মেরে আছে বুকটা। হারুদা কোথায় গেল! ওঘর থেকে বেরিয়ে এদিকে তো এলো না একবারটি! পালিয়ে গেল! জ্যাল জ্যাল করে বোকার মতো এদিক-ওদিক মুখগুলির দিকে তাকায়। চকচকে চোখগুলি! তাকে ছোট পেয়ে, নরম বুকে কখন লকলকিয়ে উঠবে আবার! কেন বোঝে না…দুহাতের তেলোয় চোখমুখ কপালের ঘাম মোছে… আসলে হারুদা, হারুদা আমাদের সকলের শত্রু। আমাদের অন্ন কেড়ে নিতে চায়।

'এখন আমার শালা ভয় কচ্ছে মাইরি…' বিশাল ঘর নিঝুম হয়ে এলে আবার কথা বলে ওঠে হিজলপাড়ার সন্তোষ।

'মা বলেছিস…' সহদেব—'একে একে এমন করে চাকে যেন মা-কালীর থানে একটা একটা পাঁঠা টেনে নিয়ে যাচ্ছে…'

'আমার শালা ভয়ডর নেই। হবে না সে তো জানিই। তবু যখন ডেকেছে…'

'হ্যাঁ, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ…'

'তুই আমাদের বেকার সমিতির প্রেসিডেন্ট। এট্টা সিগারেট ছাড় শুরু, ছাড়…'

'ভাগ শালা, তোর বাপের আট বিঘে দশ বিঘে জমি আছে মাঠে। তাই চষে খা গে যাক্কোৎ, তুই কেনে এয়েচিস এখেনে…'

'বাপ তুলে কথা বলবি নে বলে দিচ্ছি, ভালো হবে না কিন্তু…'

সচকিত হয়ে ওঠে নিরাপদ এবং সবাই। উত্তেজনায়, গলা চড়িয়ে মুখোমুখি উঠে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্মী আর সহদেব। হঠাৎই লক্ষ্মী চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ভাবুক ভাবুক ভঙ্গি করে হঠাৎ কেমন মিইয়ে যায়—'মা শালা এ্যাদ্দিন ধরে শক্ত প্রসুখে ভুগছে। পাঁঠা না পে' পে' করে টেঁসে যাবে। রাতদিন শালা খিটকেল বাপের খিস্তি। এট্টা ঘমি ছেল। হাটুড়ের মাঠের সেই এক বিঘে চার ছটাকী সরেস জমিটা শালা তোর বাপে রেজিস্টির করে নিলো…'

'রেজিস্টির কল্ল কি রে, সি কি মুফতে সমান সমান গলা চড়ে সনাতনেরও—'টাকা খায় নি তোর বাপ? কাগজপত্তরে লেখা নেই?'

'সেটা কথা নয়। যা না যাক্কোৎ, খা না গে সি টাকা। ফের আমার ভাত মারে এখেনে এয়েচিস কেনে?'

'এয়েচি বেশ করেচি। আমি একা এয়েচি। আসে নি আর দশ-জনে…' হাতাহাতি বেধে যেত। হিরুদা মাস্টারা নিতাই পল্টুরা সবাই ছুটে যায়। সোরগোলে আওয়াজে দরজায় এসে দাঁড়ায় বুকে তকমা আঁটা ব্যাঙ্কের সেই লোকটা। ওরে উল্টে-পালটে খেয়ে নিরাপদও উঠে

দাঁড়িয়েছিল। সবাই শান্ত হয়ে এলেও তার বুকের ঢাঁপুনি থামে না। বিস্ময় বাড়ে। ওদের দেশবন্ধু ক্লাবের ক্যাপ্টেন লেফট ব্যাক সহদেব আর দুর্দান্ত স্ট্রাইকার লক্ষ্মী, ওরা কি একসঙ্গে আর খেলবে না কোনদিন!

বিছিরি ওঠা ঘরটার কেমন আরও বেশি চকচকে ধারালো হয়ে ওঠে চোখগুলি। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে যদিও শান্ত, কিন্তু যে-কোনো সময়ে জ্বলে উঠতে পারে, কামড়ে দিতে পারে যে-কেউ। লক্ষ্মীকে আগটে ধরে চেয়ারে টেনে এনে বসিয়েছিল নাটু। বলল—'যা, তোরা সব কি কচ্ছিস মাইরি: বন্ধুতে বন্ধুতে সবাই নিজেদের মধ্যে···'

'এমনিতে শালা চাকরি হচ্ছে নিকি কারও! পাল্টিতে নাম না লেখালে···'

'সে-ও তো করেছিলাম র‍্যা, পেটে গুঁতকি মেরে পাঁচ সাতটা বছর কাত্তা নে' এত কল্লাম···'

'ওই, ওই শালা হারামি তোলা বামুন···'

'ঠিক, ঠিক বলেচিস। গাঁটাকে ছাটলো-পুইড়ো মারল ওই বুড়ো ক্যালানি। অ্যাত্তো করে বল্লাম সিদিন, জুতোর শুকতলি চাটতে বাকি রেখেচি মাইরি—আমরা গাঁয়ের ছেলে, বলা-কওয়া ধরাধরির লোক নেই আমাদের। আমাদের ডেকেছে আমরা যাব। ওদের যাকে ভালো মনে লাগে, বেছে নেবে। শেতলদাকে যেমন ভুইবেচেন, তেমন চিঠি লিখবেন না আপনারা। নাক গলাবেন না এর মধ্যে। তা কি বলল জানিস! বলে কিনা, আপ্নিন যাদে এট্টা ব্যাপ্ত হল গাঁয়ে, তোরা দুসজনে মিলে নষ্ট করবি র‍্যা। আ। তোরা চাকরি করবি কি। সব তো টুকে পাস করেচিস

'আঁ! বলল! এ কথা বলল তোকে

'তোর হাতে শালা ধন যা জুতো খাব যদি মিছে কথা বলি···

'দাঁড়া বারফাট্টাই বের কচ্চি বুড়োর। আমরা টুকলি করেচি! আমরা বখাটে! কেনে, তার পেকারের হাক টোকেনি পরীক্ষায়? অতো তো লক্ষ্মী ছেলে, ভালো ছাত্তর, ন্যাড়া টোকে নি! হ্যাঁ আমি ত সামনে বলছি র‍্যা। বলুক না বুকে হাত দে', বিবিয়া কেটে বলুক···'

গোটা শরীরে নাড়া খেয়ে, হঠাৎ চমকে ওঠে নিরাপদ। মুখোমুখি তারই দিকে চোখ সকলের। আক্রমণ আসবে, আসতে পারে জেনেও, নতুন ধাক্কার হতচকিত বিভ্রান্ত নিরাপদ চারদিকে জল খোঁজে। তেষ্টটা বাড়ছে। গলাটা শুকিয়ে আসছে। তার স্নেহের গোপন লজ্জার মতো, যা কেউ দেখে নি, কেউ জানে না, সত্যি কথা—সে টুকেছিল। বিশেষত অনার্সের সেকেণ্ড পেপারে, ফোর্থ পেপারে। সে কথা এরা জানল কেন?

বেঁচে যায় সে অনেকটা স্বস্তি। বুক চিতিয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্মী। অতোটা মারমুখো নয়, অনেকটা উদাস উদাস—'হাক যদি চাকরিটা পায়, শালা খুনখারাবি হয়ে যাবে গাঁয়ে। জেল-হাজত হয়, হবে। ওই বুড়োকে আমি দেখে নেব। বুড়ো শেতলদার ভাত মেরেচে, আমাদের ঠকাচ্ছে···'

'এমনিতেই হাক এটা চাকরি করে মাইরি। কলকাতায় সাহেবি আপিসে ভালো চাকরি

'হাক এমন ওটা কি র‍্যা! অমন বুকনিঝাড়া বাকতারা মারা ছেলে অনেক দেখেচি। এক নম্বরের পা-চাটা চামচা শালা···'

সবশুদ্ধ বারোজন। ইন্টারভিউও প্রায় শেষ হয়ে এলো। মিনিট দশেকের মধ্যে ছেলেরা ফিরে এসেছে, নাটুদার ডাক পড়ল। স্নায়ুতে ওঠে নিরাপদ। খোলা-দরজার চৌকাঠে লাফ মেরে ঘরে ঢুকলেন হারুদা, হারাধন চক্কোত্তি। বয়সে অনেক বড়ো লাটাশ-আঠাশ! শেতলকাকা বলেন—'এবিভেন্টিস করে বয়স গাঁড়িয়ে এখন তেইশ···' যার একহাতে জ্বলন্ত সিগারেট, আরেক হাতে মিঠাই-এর বাক্সো। বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা! অথচ সন্দেশ রানাঘাট! বাক্সোটা টেবিলে ছুঁড়ে মেরে সকলের দিকে চোখটা ঘুরিয়ে নিলেন একবার 'নে খা তো'রা···'

চকচকে ধারালো চোখগুলি বোবা মেরে গিয়ে মিষ্টি, হারুদা, হারুদার কায়দাবাজি ভাঁট গোল গোল করে দেখতে দেখতে যখন কোনো কথা বলার সাহসই পাচ্ছে না কেউ, নিরাপদরও শুকনো টাগরাটায় জিবটা জড়িয়ে যায় চোখজোড়া ঠিকরে পড়ে—এই মানুষটা! পুরটা বলতে ওঠে মুহূর্তে—ইংলিশানের কাছে সতীশ মুখুজ্জের পাকা বাড়ির দোতলার বাহারের আপিস, দেওয়ালের শিক-বসানো কাঠের পার্টিশনের এদিক আর ওদিক, ওদিকে চেয়ারে বসে মদনদা। চেয়ারটা শেতলকাকার হতে পারত। হয়নি। তার পাশে বসবে হারুদা! হারাধন চাক্কোত্তি! যেন জন্মের ছকে, রাশিচক্রে লেখা হয়ে আছে আগে থেকে। নিজেরই অজান্তে যখন, নিরাপদ তার ডানহাত বুকের কাছে

এনে হাতের পাতায় অবহেলায় ভাপা খেয়েছে। তাকায় মুখগুলির দিকে। আমাদের সকলের, যাদবাবুর এবং অনেকের হাতেই কি একরকম!

'সেই কখন শালা ঘর থেকে বেরিয়েছি। দু'চোখে ঘুম মাখিয়েলো পেটে কোমরে তিন ইঞ্চি বেল্টে দু'হাতের বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে, বুকে দাঁড়িয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসছিল হারু—'তা কিছু খেতে দেলাম। মনে পড়ল এতগুলো গাঁয়ের ছেলে, তোরা সবাই এয়েচিস···'

'তাই বুঝি মজা পেয়েচিস বাকোং, আঙালীভোজন করতে লেগেচিস' বাঁচোখ কুঁচকে গালে কপালে ভাঁজ তুলে আস্তে আস্তে এমনভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় লক্ষ্মী, বহুর দিকে তাক করা শিকারী চোখের দৃষ্টি স্থির নিরুদ্ধ থাকে। চাষাড়ে চোয়াল দুটো ভয়ঙ্কর, আরও ভয়ঙ্কর।

কড়ের আগে গাছপালা ডোবাপুকুর যেমন, ঘর ভরে একটি গাঁয়ের ছেলেরা সবাই থম মেরে থাকে। উঠে দাঁড়ায়। দু'হাতে জাপটে বাধা দিতে চেয়েছিল ছেনু, লক্ষ্মী ঝামটা মেরে হটিয়ে দিলো।

তখনকে চক্রাবক্রা জামা জুতো প্যান্টে বাহারের সাজপোশাকে খুশি-খুশি হারাধন ভ্যাবাচ্যাকা মেরে কুঁচকে আসছিল নিজের মধ্যে, ঘাড় অবধি লম্বা ঝাঁকড়া চুলে হাতের পাতা বুলোচ্ছিল আলতোভাবে। হঠাৎ, একেবারেই চোখের পলকে, লক্ষ্মী মিস্ত্রির প্যাকেটটা ওকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারতেই ঘর ভরে হুলুস্থুল কাণ্ড। সত্যি সত্যি মিহিদানা সীতাভোগ। চারদিকে ছড়িয়ে যায়। এবং দুচার পা পিছিয়ে গিয়ে হারু, ঝুঁত কোমরের বেল্টটা খুলে তেড়ে আসতেই···ছি, ছি, গাঁয়ের লজ্জা, তাদের সকলের অপমান···সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে মেটাতে গেলে আরেক ঘটনা, হৈচৈ হুড়োহুড়ি হল। চিৎকারে চারদিক থেকে, পিলপিল করে ছুটে আসে মানুষজন, ব্যাঙ্কের কর্মচারী, এমন কি, যারা ইন্টারভিউ দিচ্ছিলেন সাহেবযাবুরা।

হট্টগোলের মধ্যে ভয় পেয়ে এক কোণে সরে গিয়েছিল নিরাপদ। ভিড়ের মধ্যে খুঁজে পেতে কোত্থেকে ছুটে আসে সাতুদা—তুই কী করছিস রা এখেনে। পালালো যা, পালালো যা। তোর ভালোর জন্যে বলচি।'

গলা শুকিয়ে গেছে। স্বর বেরোয় না কণ্ঠনালীতে। নিরাপদ ফ্যালফ্যাল করে তাকায়—'কেনে গ! তোমরা?'

'আমাদের কথা তোকে ভাবতে হবে না। তুই পালা। হারুকে ওরা মারবে আমি জানতাম। এরপরে তুই···'

'আমি!' সাতুর ধাক্কা খেয়ে নিরাপদ ভিড়ের মধ্যে হামলে পড়ে। শুধু পিছু তাকায়—'আমাকে! আমাকে কেনে গ? আমার দোষ!'

'তোর সেজকাকা। সেজদা। কলকাতায় ঘরকন্নার লোক আছে তোর···' ধাক্কাতে ধাক্কাতে সত্যি ওকে ঘরের বাইরে ভিড়ের বাইরে একতলার সিঁড়ির মুখে এনে সাতু ঠেলে দেয় নিচের দিকে। পড়াতে পড়াতে সামলাতে না পেরে নিরাপদ হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং শোনে—'পাঁচটা না পাঁচটা-দশে গাড়ি আছে এটা। সোজা গাঁয়ে চলে যা। সাবধান, এসব কথা আর বাড়িয়ে বলবি নে কাউকে। গাধা, তা'লে কিন্তু মারা পড়বি। কেউ রক্ষে করবে না···'

নিরাপদ পালায়। সত্যি পালায়। খালি পায়ে। সেজদা-কাকার জুতো জোড়া সে ফেলে এসেছে ভিড়ের মধ্যে। মরুক সে যা-হোক। তাকে বাঁচতে হবে। বর্ধমান শহর ছুটছে। কার্জন গেট জি-টি রোড ইস্টিশান, কাতারে কাতারে মানুষ, বাস লরি মোটর রিকশা সাইকেল—কোথাও কিছু থেমে নেই, কেউ থমকে দাঁড়াচ্ছে না তাকে দেখে। অথচ সে ছুটছে, ছুটতে হবে। এ চাকরি তার হবে না। হারুদার হবে। হারুদাদের জোতজমি নেই, চাষের-চালের-ভাত নেই মোটা বছরের, মাটির ঘর, মায়ের সোনাদানা বন্ধকীতে বাঁধা···তবু হারুদা আমাদের কেউ নয়। হারুদা শত্তুর···

পাঁচটা-দশে রেলগাড়ির বাঁশি বাজে বর্ধমান স্টেশনে। গ্রামে ফেরে, নিরাপদ। একা।

■

ঐসব ফেলে রেখে

শ্যামল দাশগুপ্ত

'আয়—আয়—আয়' সন্ধ্যার ধূসরে আমা কালো ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে কিশোরী একটানা সুর তুলে আকুল ডাক ডাকে, 'আয় আয়-আয়, চৈ- আয়।' কাদের চোখের পাল বুঝি ঘরে ফিরছে না, কোন এক দল ছাড়া একক হাঁস বা জল চৈ চৈ মাঠে পথ হারিয়েছে একা একা ম'হ'রে কেঁদে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যার কালো ছায়া যতই ঘন হয়ে আসে কিশোরী কণ্ঠের 'আয়—আয়' ধ্বনি তত স্খলিত উদ্বিগ্ন রূপ পায়।

শেষ ভাদ্রের শেষ বেলায় একপশলা টান' বৃষ্টি হয়ে গেছে। যতীন্দ্রকান্তবাবু পুবের জানালাটি খুলে আকাশের দিকে চোখ মেলে-ছিলেন। ভিজে হাওয়া, ঠাণ্ডা হাওয়া কেমন ঘুম ঘুম ঘোর আনছিল। যতীন্দ্রকান্তবাবুর চোখের ওপরই দিনের আলো কালো হয়ে আসছিল। কিশোরীর আকুল আহ্বান তার কানে এসে লাগে। কান থেকে মনে, মাথার সমস্ত অনুভূতিতে ওই ধ্বনি ছেঁকার ডাক। জল চৈ চৈ মাঠে 'আয়—আয়—চৈ—চৈ—আয়—আয়।'

১

গায়ে চাদর টেনে শীত ভাবটাকে তাড়াতে চাইলেন, জল তেষ্টায় জিভ জড়িয়ে আসছে কারোকে ডাকতে চাইলেন, মনে হল প্রস্রবনের মতো গায়ে ঘাম বইছে মুছতে চাইলেন, কিন্তু কিছু করতে পারলেন না যতীন্দ্রকান্ত-বাবু। শুধু যেন দেখলেন, দুর্গা মণ্ডপে প্রতিমা নেই, শূন্য খাঁখাঁ চৌচালা মণ্ডপের মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রৌঢ়া মা কাঁদছেন, কপালের সিঁদুর নাকের ডগায়, গালে—চোখের জলে গলে একসা, মা কাঁদছেন। পাশে বাবা, চোখে জল নেই, চৈত্রের আকাশের মতো পোড়া মুখ তবু বোকা যায় তার মন প্রাণ হা হা করছে যাবাও তো কাঁদছেনই। আর সুধা, সুধামণি, উনিশ বছরের বেপরোয়া নিজের হাতে গোঁজা সিউলি ফুলের ডাঁটো চারটির গায়ে হাত রেখে আকুল অঙ্গ বিসর্জন করছে। ১৯৪৭-এর শ্রাবণে বরিশাল জিলার ওরপাশা গ্রামের বরদাকান্ত চৌধুরীর একমাত্র পুত্র যতীন্দ্রকান্তের সঙ্গে সুধামণির বিবাহ হয়েছিল। ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারীতে জন্মভূমিতে শেষ চোখের জল ফেলে ওরা অনিকেত যাত্রা শুরু করেছিল পশ্চিমের দিকে অকাল বয়সে প্রকৃতিও অকালের কৈবেছিল সেদিন। ভাঙা বাংলার কান্না, সে যে না শুনেছে সে বুঝতে পারবে না, বুঝতে পারেনা।

যতীন্দ্রকান্তর একবার সুধামণিকে দেখবার ইচ্ছা হল। চোখ মেলে 'বৌ' বলে একবার ডাকতে চাইলেন। আঠার মতো চোখ জড়িয়ে আসে। 'বৌ' 'বৌ' 'বৌ' ডাকেন যতীন্দ্রকান্ত, কেউ সাড়া দেয় না। নিজের স্বর নিজের কানেই পৌঁছয় না যেন। যতীন্দ্রকান্ত চোখ বোজেন।

২

দূরপাল্লার একটা মেল ট্রেন মাটি কাঁপিয়ে চলে গেল আকাশে তার রেশ এখনও মিলায় নি। স্টেশন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার বাতাস এখন ভারি। ওভার ব্রিজে দাঁড়িয়ে ওরা দুজন এখনও থর থর কম্পন অনুভব করছে। আকাশে সন্ধ্যা, মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তায় টিমটিমে আলো, অদূরে ব্রিজ্জা স্টাণ্ডে ঘন ঘন শঙ্খ শঙ্খ ধ্বনি। রাস্তার ধারে বাবলার ইঁটের চাতালে স্থায়ী জুয়ার আড্ডা, পাশে শিবঠাকুরের স্থায়ী মন্দির।

ওরা দু'জন ওভার ব্রিজ থেকে এসব দেখছিল। অথবা দেখছিল না নিত্যদিনের দৈনন্দিনতায় বিশেষভাবে দেখার কিছুই আছে। একটি ছেলে, বয়স পঁচিশ, কাঁধ-ঝোলা, পুষ্ট হাড়, চওড়া খোলা প্রশস্ত বুক, ঘন কালো দাড়ি। চঞ্চল অসহিষ্ণু স্বপ্নমাখা দুটি চোখ। অপরটি মেয়ে, বয়স উনিশ, রুগ্না, একহারা চেহারা, ছিপছিপে, ফিকে গোলাপী রঙের শাড়ির সঙ্গে রং মিলিয়ে ছোট হাতা ব্লাউজ। হাসলে ভালো লাগে মেয়েটিকে, সামনের অনুজ্জ্বল দাঁত

হাতে সৌন্দর্য আছে
নাম হতশ্রীপ্রভাত ।

ছেলেটি সিগারেট খাচ্ছে। মেয়েটি ছেলেটির খোলা বুকে তর্জনী দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে বলল, 'অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন তুমি ।' ছেলেটি সিগারেটে একবার টান দিয়ে মেয়েটির হাতখানা ধরল, ছেলেটির বাঁ হাতে মেয়েটির ডান হাত। ওরা এইভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ওদের চোখে দিগন্তে কালো মেঘের সারির নিচে সারি সারি কারখানার চোঙ। কোনোটা ধোঁয়া ওগড়াচ্ছে, কোনোটা বা মৃত আগ্নেয়গিরির মতো। ওরা এসব দেখছে, অথবা দেখছে না। তবে চোখের দৃষ্টি দূরে আকাশের প্রান্তে।

'আমার বাবার চাকরি এ বছর নভেম্বরে শেষ হবে। নো এক্সটেনশান, নাথিং।' অভিযোগ ভাঙল ছেলেটি।

'আমার বাবার এখনও পাঁচ বছর চাকরি আছে।' বলল মেয়েটি।

একটি লোকাল ট্রেন আসায় প্ল্যাটফর্ম ভরে যায় ক্ষুধমুখী যাত্রীর ভিড়ে। ছেলেটি মেয়েটির কানের কাছে মুখ এনে বলে, 'কেয়া, বাবা একা সংসার সামলাতে পারবে না। আমাকে একটা কিছু তো করতেই হবে। এখন শুরু করলে বাবা মা দুজনেই টাকা ইনভেস্ট করতে পারবে। আর কত দিন বসে থাকব বল ?'

কেয়া অসহায়ের দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকায়, বলে, 'ভালো লাগেনা, আমার একদম ভাল লাগে না।' কাঁদে না তবু কান্নার মতো শোনায় কথাগুলি। তারপর ভীরু যুক্তি খাড়া করতে চায় ও, 'কত ছেলে দেখ দশ বছরও বসে আছে, তুমি তো বি-এস-সি'র পর—কী বছর ? সেভেন্টি টু, সেভেন্টি থ্রি, সেভেন্টি ফোর, সেভেন্টি ফাইভ, সেভেন্টি সিক্স' গুনছিল কেয়া, হাত ধরে থামিয়ে দিল সজীব, 'থামো।' কে এমন খুঁড়ে খুঁড়ে বেদনা জাগাতে চায়। সজীবও চাইল না, কেবল ওর শক্ত হাতে কেয়ার কর গোনা থামিয়ে দিল, বলল, 'এ কোনও যুক্তি হতে পারে না—একজন দশ বা পনের বছর বেকার বসে আছে বলে আমি পাঁচ বছর বসে বসে বিড়ি ফুকে কাটিয়ে দেব ? তোমাদের মাথায় এসব হিসেব কারা ঢোকায় বলতো ?'

'তাহলে ?' বলে কেয়া বেশি ধনিষ্ঠ হয় সজীবের। বলে, 'তা বলে তুমি—তুমি কসাই হবে ?' বলে কেঁদে ফেলে। সত্যি কান্না।

সজীব বলে, 'এতদিনে আমার ছুরি কাটারী ধরা উচিত ছিল। উচিত ছিল মানুষ কাটা। তাতো পারিনি। বেঁচে থাকার ভিক্ষে চেয়েছি। অবাঞ্ছিতের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি। ঘরে বাইরে, সমাজে অসামাজিকতায় সর্বত্র। কোথাও কোনো খাতায় নাম ওঠে নি। না কোথাও না।'

কেয়া জানে সজীব আরো কি কি বলবে। সজীব বলবে, 'একমাত্র ভোটার লিস্টে ছাড়া কোথাও নাম ওঠে না আমাদের। গণতন্ত্রের মৌলিক অধিকার পাই।' তারপর গ ণ ত ন্ত্র কথাটিকে টেনে টেনে উচ্চারণ করবে আর হা হা শব্দে হাসবে সজীব। আশপাশের পথ চলতি মানুষগুলি কি ভেবে না ভেবে কৌতুকী চোরাদৃষ্টিতে চাইবে। সজীবের হা হা হাসি যে কান্নাই তা তো জানে না ওরা—কিন্তু কেয়া যে আর পারে না। সজীব হা হা শব্দে কাঁদবে আর কেয়া নীরবে অশ্রু ঝরাবে। হাত যে প্রেম—তাবলে কেয়া।

সজীব কিন্তু আজ হা হা শব্দে হাসলে না বা কাঁদলে না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'তুমি মানতে পারছ না, কিন্তু আমার এ ছাড়া আর পথ নেই। আমি, নন্তু, সনৎ, বাচ্চু, জীবন আমরা পাঁচজনে মিলে মাংসের দোকান খুলব। ইনভেস্টমেন্ট কম লাভ বেশি। আর মাংস খাবার মানুষ তো সমাজে থাকবেই, ডিমাণ্ডও থাকবে। কি, কেমন পাকা হিসেব বল ?'

কেয়া তবু কাঁদে। কী যন্ত্রণায় যে কাঁদে মেয়েটা।

৩

কার বাড়িতে কে যেন শঙ্খে ফুঁ দেয়। টানা এক পশলা বৃষ্টিপাতের পর ভেজা বাতাস বেয়ে সন্ধ্যার মঙ্গল শঙ্খ গভীর-গভীর হয়ে চারিধারে ছড়িয়ে পড়ে। শঙ্খধ্বনি শুনে সুধাময়ি ধড়মড় করে ওঠে, 'ওই যা, সন্টুডা বাড়ি ফেরল বোধায়, চলি দিদি।' দিদি অর্থাৎ ভট্টাচার্যি অর্থাৎ প্রতিবেশী সনাতন ভক্তর স্ত্রী কামিনীসুন্দরী হাসেন। ঠোঁট টিপে রঙ্গ করে বলেন, 'ছাওয়াল, না ছাওয়ালের বাপ, কে টানে ? যাও একা পাইবা অখন।' তাম্বুলে রাঙা ঠোঁট টিপে হাসেন ভট্টাচার্যি। সুধাময়ির গাল লাল হয়, এ বয়সে আজও এ ধরনের কথায় ব্রীড়া সিঁদুরে রঙ ধরায় গালে। লাজুক কিশোরীর গলায় বলে, 'আপনার মুখে কিছু বাকে না, কত রঙ্গই যে জানেন দিদি।' প্রায় বৃদ্ধা পঞ্চাশ উত্তীর্ণ কামিনী হাসেন, কে বলবে অরা তার দুয়ারে খা দিছে।

সুধামণি সন্তদের বাড়িতে এসেছিল ওদের থার্মমিটারটা ধার চাইতে। কত্তা আজ অফিসে যায় নি, শরীরটা নাকি ভাল না, শীত শীত করে। যা হয়, থার্মমিটার নেওয়া হল, দু'জনে মিলে পান খাওয়া হল। সন্তগিন্নি বললেন, 'বাঁচনের আর পথ রাখবো না, উনি রোজ বাজার দিক্যা আনেন আর কন, এমন আগুইন্যা বাজার বাপের জন্মে খাইছেন নায়।' বলে জিভ কেটে হাসেন কামিনীসুন্দরী। সুধামণির তাড়া আছে, ঘরে কেরার তাড়া। সংক্ষেপে জবাব দেয়, 'আমাগো কপালে আর সুখ নাই দিদি।' দিদি হাসেন, ঠেলা মেরে বলেন, 'সুখের তর অভাব কি লো। দোয়ামী উপায় করে, বড় ছাওয়াল উপায় করে, মাইয়াটারে পার কইরা দিতে পারলেই কাড়া হাত পা তুই। আর ছোট ছাওয়াল তো তর রত্ন রে। তুই তো রত্ন পরত্তা হবি।'

স্কেচ : শীতেশ রায়

সুধামণি সত্যিই কী সুখের আবেশ অনুভব করে। ১৯৪৮-এর রাত শেষে শিয়ালদা স্টেশন থেকে সকলের সঙ্গে ট্রেনে চেপে বসল নতুন বৌ সুধামণি, আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে নানা জেলা নানা জাতের মানুষের সঙ্গে এসে ট্রেন থেকে নামল এই এখানে। জলা জমিতে একগাছা তৃণ ছিল না, হাঁটু ডুবে যায় শীতল পঙ্কে। বঙ্গভঙ্গের ঝড়ে উড়ে আসা মানুষ সেই সেদিন এক হয়ে গড়ে তুলল এই উপনিবেশ। সেদিন কত ভয় ভর কত বাধা বিপত্তি। বড় ছেলে অভয় ছিল না, মেয়ে কেয়া বা ছোট ছেলে সন্টু। আর আজ—

তৃপ্তির রাশে ভেসে যায় সুধামণি। বলে, 'একটা কথা শোনছেন দিদি?' কামিনীসুন্দরী উৎসুক তাকান, অন্ধকার ঘন হয়ে আসে, ঘনিষ্ঠ দুই নারীর মাঝে নিবিড় মায়াময় অন্ধকার। সুধামণি বলে, 'সন্টু যে ইস্কুলের হেড মাস্টার বিপিনবাবু—আহা বড় ভাল মানুষ। ওনারে ডাইক্যা পাঠাইছিলো দিন দুই আগে। কইলেন, সন্টুরে অত বড় ইস্কুলে লইয়া যান। ওর যা মাথা তাথে ও 'স্টাণ্ড' করতে পারবে ফাইনাল পরীক্ষায়। কিন্তু আমার ইস্কুলে থাকলে তা তো হইবে না।' কামিনীসুন্দরী শোনেন এক পর্বতা মায়ের কণ্ঠ কেমন ধীরে ধীরে ভিজে ওঠে।

'উনি কইলেন, বড় ইস্কুলে বড় খরচ। আমি চালামু কি কইরা। মাসে বেতনই পঞ্চাশ টাকা, তারপর প্রাইভেট মাস্টারের পয়সা। কোথায় পামু, দিদি ক'ন?'

যতীন্দ্রকান্ত সুধামণিকে বলেছিলেন, 'জানো বৌ, সন্টুটা আরো বড় হইতে পারত। কিন্তু এ ভাগে শিক্ষারও গরিব বড়লোক ভাগ হইয়া গেছে। বড়লোক যে পোলা মাইয়ারা যায় ভাল ইস্কুলে, সুযোগ পায় অঢেল, ঘরে দিনভর চাইরডা প্রাইভেট টিউটর। এতটা ছেলের পিছনে কম কইরা পঁচাশ টাকা মাসে। আমাগো সন্টুর' পরাণে ক্যান। বৌ অসম দৈরথ বুঝি এরেই কয়। অসম দৈরথে কেডা যায়, সন্টুরা কেতত্তে পারে?'

সুধামণির চোখ ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসে। মায়ের চোখে অপরাধবোধ। কামিনীসুন্দরীও রসিকতা ভুলে যান, বিব্রত হয়ে পড়েন।

৪

অফিসের পরে কোনদিনই সোজা বাড়ি ফেরে না অভয়। আজ বাবার শরীরটা একটু খারাপ দেখে এসেছে, চিন্তা করার মত খারাপ নয়। তবু

আজ আর কোথাও যাওয়ার তাগাদা বোধ করল না। কিছুক্ষণ আগে জোর একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ট্রামের জন্য অপেক্ষা করেও শিয়ালদার কোনও ট্রাম ধরতে পারল না, বাধ্য হয়ে পায়ে হেঁটে শিয়ালদার দিকে চলল। রাস্তায় হোঁচট খেতে খেতে চলেছে গাড়িগুলি, মানুষ আর রিক্সা আর ট্যাক্সি আর লরি আর প্রাইভেট বাস। নিচে থক থকে কাদা, নিজের ভারসাম্য রেখে চলাই দায়। সব কিছু কেমন নুয়ে পড়েছে, মুখ থুবড়ে পড়তে আর বেশি দেরি নেই বোধ হয়। কলকাতা বুড়ো হয়েছে, কলকাতা মুষ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে পথ ফুরায় অবশেষে। শিয়ালদায় পৌঁছে হাত অজয়। সন্ধ্যা ফুরিয়ে রাত আসছে, এক ফালি চাঁদও আকাশে দেখা দিয়েছে। তার ক্ষীণ আলো ফালি ফালি হয়ে রাস্তা আর ফুটপাথের জলে ছড়িয়ে পড়ছে। শিয়ালদার এই পথে পা দিলেই সহজাত প্রবৃত্তিবলে অজয়ের দেহ মনে প্রতিরোধী এক সত্তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ভেজা থক থকে পথের ওপর সারি সারি শুয়ে আছে মানুষ, উলঙ্গ—অর্ধ উলঙ্গ। মা আর শিশু, স্বামী আর স্ত্রী। কেউবা ইঁটের উনুনে অথাদ্য সিদ্ধ করে তারই মধ্যে ভাত বা রুটির স্বাদ খোঁজে। পেটগুলি সব ফুলে ঢোলের মতো শিশুরা, পেট মোটা কঠা ওঠা মায়েরা চাঁদের করুণ আলোতে নিশিযাপন করে। স্ফীত উদরকে বিজ্ঞাপনের কাজে লাগিয়ে এদেরই কম বয়সী মেয়েরা খদ্দের চোখে খুঁজে বেড়ায় দু'চার পয়সার মালিক খেটে খাওয়া পুরুষ মানুষকে। ট্রাম-গুমটির পাশে ঢোলাই মদের হাঁড়ি। এখানে এলেই অজয়ের বিবেক আর ঠিক থাকে না, ফুঁসে ওঠে। চাষী থেকে জানজায়ী, তা থেকে ক্ষেতমজুর —বেথার মজুর হয়ে এই শহরের দুয়োর কোনো মতে আর খুঁটি ধরে থাকার জন্য নিখাদ 'দুশ্মন' বনে যাওয়ার ইতিহাস ওকে বংশাণুতে থাকে। মনের মধ্যটা দুঃখ কান্নায় ভরে যায়। মাথা নিচু করে কিছু না করতে পারার জ্বালায় হন হন করে হাঁটতে থাকে।

'বিশেষ সংবাদ'-এর বোর্ডের কাছে এসে প্রতিদিনই, মাথা উঁচু করে। সংবাদের ওই বোর্ডের কাছে সে কি চায় নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়, শুধু অভ্যাস, অভ্যস্ততা। আজও তাকায়, অভ্যাসের দাসত্ব। বিশেষ সংবাদ : ভারত বিদেশে পম রপ্তানি করবে। পড়ল অজয়। তাকিয়ে রইল তিন ইঞ্চি দীর্ঘ অক্ষরগুলির দিকে। এই লেখার নিচেই উলঙ্গ, অর্ধ উলঙ্গ বুভুক্ষু মানুষেরা। ইঁটের উনুনে সিদ্ধ অখাদ্যের মতো ভাত বা রুটির স্বাদ খুঁজছে।

অজয় জানে, পুঁজিবাদী পথের গতিই এই। আমেরিকার পমের দাম বাড়ানোর জন্য টন টন পম সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। ক্ষুধা ভারত বিদেশে পম চালান দেয়।

কিছু করতে না পারার ক্ষোভ অজয়কে জ্বালায়

যতীন্দ্রকান্তবাবুর মাথাটি একপাশে হেলে পড়েছে। আকাশে টুকরো মেঘ, ক্ষীণ চাঁদের আলো পড়েছে ওঁর উন্নত প্রশস্ত ললাটে, অজয় আর ধূপের মিলিত গন্ধ। গলায় ফুলের মালা, মাথার দু'পাশে দুটি তোড়া। ঈষৎ ফাঁক হয়ে থাকা ওষ্ঠাধর, দুই চোখে দুটি তুলসী পাতা। সামনে কাঁদ দিল অজয় আর সন্টু—দিতে হয়, বিধি। পিছনে সঞ্জীব আর নন্দ, সনৎ, বাচ্চু, জীবন—সেই পাঁচজনের টিম।

কেয়ার সারা শরীর ফুলে ফুলে ওঠে। কেমন অসহায় পোড়ানি। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে সুধাময়ীর হাহাকার। শাঁখা ভাঙার কান্না যে না শুনেছে সে কী বুঝবে এই গভীর উথাল পাথাল। তীব্র বিদ্ধ জন্তুর মতো তীক্ষ্ণ আদিম চিৎকারে সুধাময়ী পৃথিবীর সব কিছুকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়।

এইসব ফেলে রেখে যতীন্দ্রকান্তবাবু চাঁদের আলোয় মাখা দোলাতে দোলাতে চললেন কোন সে লোকে।

অপ্রত্যাশিত সাড়া মিলেছে—প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত !

বিবেকানন্দ

রচনাসংগ্রহ

আট খণ্ডে সমাপ্য। চারটি খণ্ড প্রকাশিত। মূল্য ৮০ টাকা গ্রাহক তালিকাভুক্তিকালে ৮ টাকা ও প্রতি খণ্ড সংগ্রহকালে ৯ টাকা জমা দিতে হবে।

নিবেদিতা রচনাসংগ্রহ

ভগিনী নিবেদিতার রচনাসমূহ বাংলা ভাষায় এই প্রথম সংকলনটি পাঁচ খণ্ডে সমাপ্য। মূল্য ৫০ টাকা। গ্রাহক তালিকাভুক্তিকালে ৪ টাকা ও প্রতি খণ্ড সংগ্রহকালে ৯ টাকা জমা দিতে হবে।

সাংবাদিক বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের
জন্য আমি
মূল্য ৪ টাকা

সাংবাদিক প্রফুল্ল রায়চৌধুরীর
West Bengal A Decade
(1965—1975)
মূল্য ১০ টাকা

বইপত্র ৮।৩, চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯

এ্যাম'ন হ'লও ক্যাম'ন হওয়?

চিত্তপ্রিয় রায়

"লনডনে লণ্ডণ্ড কাণ্ড"। হ'বার হোঁচট খেয়ে, ঠিকমত উচ্চারণ করে যখন পড়ব, তখন ব্যাপারটা দাঁড়াবে: "লণ্ডনে লণ্ডণ্ড কাণ্ড"। ব্রিটেনের রাজধানী 'লণ্ডন'কে 'লনডন' করা হল কেন? না, বাংলা লিপি বা অক্ষরকে সহজ করার জন্যে। একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক—আনন্দবাজার পত্রিকা—তাবৎ বিদেশী শব্দকে যুক্তাক্ষর বর্জিত করে চালু করার চেষ্টা চালাচ্ছে বেশ কয়েক বছর হল। যদিও বাংলা তৎসম ও তদ্ভব শব্দগুলির যুক্তাক্ষর এখনো তারা ভাঙে নি। সুতরাং, উচ্চারণ রীতি এক হলেও লণ্ডন লেখা হচ্ছে লনডন, কিন্তু লণ্ডণ্ড—লনড ভনড নয়। কাণ্ড-ও নয় কানড।

এ নিয়মেও যে মাঝে মাঝে গোলমাল হচ্ছে না এমন নয়। এ বছরেরই ৩০ আগস্ট (বুধবার, আগমট)-এর আনন্দবাজার (আনন্দ বাজার নয়) উদাহরণ হিসাবে দেখা যেতে পারে। তার প্রথম পৃষ্ঠার হেড লাইন "...গানের 'রেকরড' চায়" (অর্থাৎ 'রেকর্ড' চায়), কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় হেড লাইন "...'কমাণ্ড' ও কুমারটুলি খিজেছে" (কমানড নয় কেন?)। রেকর্ড এবং কমাণ্ড দুটোই বিদেশী শব্দ। পত্রিকাটি যে নিয়ম ধরে টেস্ট খেলাকে 'টেসট' করেছে, ইংল্যাণ্ডকে ইংল্যানড, সেই নিয়মে 'রেকরড' আর 'কমানড' লেখাই যুক্তিযুক্ত, যেমন, দৌড় বীর আলিয়াব্রো কাসানাসকে যদি আলিয়ানব্রো লেখা হয়, তাহলে 'আলবার্তো' উচ্চারণ করে 'আলবারতো' হবে না? মিসেস হালদার যদি খাটো "পানট" পরেন, তবে পায়ে "পাণ্টস" কেন, "পামপস" নয় কেন? (আনন্দবাজার ৩০. ৮. '৭৭ দ্রষ্টব্য)।

এসব অসঙ্গতি সত্ত্বেও পত্রিকাটি ইতিমধ্যে বিদেশী শব্দের বানানের ক্ষেত্রে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। তার দৌলতে Marx এবং Marcos উভয়েই বাংলা হরফে ইদানীং মার্কস হয়ে উঠেছেন। এবং আমরা, বঙ্গজনরা বাংলা হরফে বিদেশী শব্দের কোথায় হলন্ত ও কোথায় হলন্তবর্জিত উচ্চারণ হবে তা যদি জানতে চাই, তবে প্রথমে ইংরেজীতে নামটা পড়ে নিতে হবে।

এযাবৎকাল যে কোনোও বিদেশী শব্দকে বাংলা হরফে সব চাইতে কাছাকাছি রূপ দেবার জন্য প্রয়োজনে যে যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হচ্ছিল, তা'ও অবশ্যই নিখুঁত নয়। যেমন Marx কথাটি বাংলায় কয়েক বছর আগেও যখন 'মার্ক্স' লেখা হচ্ছিল, তখনো ইংরেজী 'বক্স' শব্দের বাংলারূপ 'বাক্স' (বাক্সোর)-র উচ্চারণ রীতি ধরে 'মার্ক্স'কে 'মার্ক্সো উচ্চারণ করাও খুবই সম্ভব ছিল।

আসলে, আমাদের বাংলা হরফে কখন যে আকার ইকার উকার বর্জিত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হলন্ত, কখন লুপ্ত ও অন্ত এবং কখন অ-অন্ত হবে তার কোনোও স্পষ্ট নির্দেশক নেই। ওটা অভ্যাস নির্ভর। সুতরাং নর্থ যখন তৎসম তখন তার স্বরান্ত উচ্চারণ, কিন্তু ইংরেজী north-এর বাংলা হরফে লেখা রূপ—নর্থ হলে তা হবে হলন্ত। আনন্দবাজারের বিধি অনুযায়ী যদি ইংরেজী 'নর্থ' কথাটাকে 'নরথ' করি, তাহলে বাংলা 'নরথ পরগনার' 'নরথ' এর সঙ্গে গুলিয়ে যাবার সমান আশঙ্কা থাকে।

তবু, বিদেশী শব্দ নিয়ে যুক্তাক্ষর ভাঙার তোড়জোড় কেন? কারণ, মুদ্রণযন্ত্র। ইংরেজী বা রোমান হরফে বেশ এক লাইনে সব অক্ষরগুলি টকাটক টাইপ করা যায়, শুধু অফিসের টাইপ রাইটারেই নয়, লাইনো টাইপেও। কিন্তু আমাদের বাংলার অনেক ফ্যাচাং। একার, ওকার, আকার যদিবা মূল ব্যঞ্জনলিপির সঙ্গে এক লাইনে থাকল, ঊকার, ঊকার, ঐকার, ঔকার, ঔকার, রেফ, রফলা ইত্যাদি কখনো উপরে কখনো নিচে বসে ব্যাপারটাকে রীতিমতো জবরজং করে তোলে।

শুধু কি তাই? ইকার যোগ এবং একার যোগের সঙ্গে উচ্চারণের সঙ্গতিই কি বর্ণলিপিতে (এমনকি দেবনাগরীতেও) আছে? ধরুন 'যে' কথাটি। এখানে আগে একার দিয়ে তারপরে য' লিখছি। অথচ উচ্চারণ 'এয়' না করে করছি 'এ'। কিংবা 'কি' শব্দটাই ধরুন। আগে ইকার দিয়ে ক লিখছি, বলছি না 'ইক্', বলছি 'কই'। অথচ 'কী'-এর বেলায় স্বরবর্ণ—ঈ-ইকার যথাস্থানেই পড়ছে, ক-এর পরে।

এবং, আমাদের যুক্তাক্ষরেরও যেন শেষ নেই। বিদেশত বিদেশী নাম, শব্দ যত আসছে, পৃথিবীর মানুষ যত পরস্পরের কাছাকাছি আসছে, আমাদের যুক্তাক্ষর তত বাড়ছে। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের

স্রষ্টা ও নায়ক ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন-কে বাঙালীর সামনে উপস্থিত করতে ভ ও ল এর একটি যুক্তাক্ষর দরকার হয়। যেমন ইংরেজী 'Station' কথাটার জন্য 'ষ্ট' যুক্তাক্ষরটির জন্ম হয়েছে। বর্ণবিধি অনুযায়ী ট-এর সঙ্গে শুধু ব-ই যুক্ত হতে পারে, ল বা স নয়। তবু, উচ্চারণের তাগিদে ব্যাকরণের নিয়ম ভেঙে তৈরি হল 'ষ্ট'। অর্থাৎ বাংলা টাইপ রাইটার, ছাপাখানার জটিলতা বাড়ল।

এই জটিলতা থেকে মুক্তিলাভের মানসেই বাংলা ভাষার উচ্চারণ রীতি, বাংলা অক্ষরের সঙ্গে উচ্চারণের যে সহজাত ঝোঁক থাকে, সেসবও উপেক্ষা করে বিদেশী শব্দকে যুক্তাক্ষর বর্জিত-রূপে হাজির করার উদ্যোগ হচ্ছে।

কিন্তু এর ফলে বাংলা টাইপের কিংবা ছাপাখানার বিশেষ সুরাহা হচ্ছে না, কারণ তৎসম ও তৎসম শব্দগুলির যুক্তাক্ষর থেকেই যাচ্ছে।

আসলে আমাদের লিপির সমস্যা হল এই যে, ব্যঞ্জনবর্ণের হরফগুলি রোমান বা ইংরাজী হরফের মতো হলন্ত নয়, স্বরান্ত, ইংরাজীতে K-র স্বতন্ত্র উচ্চারণ পরার আটকে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার পাশে একটি স্বরবর্ণ—a, e, i, o, u-এর যে কোনোও একটি—এসে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু বাংলা 'ক'—সে তার সঙ্গে 'অ'-কে নিয়েই বসে রয়েছে।

আর তার ফলেই কামেলা। ক-এর স্বরান্তরূপ লোপ করতে হলে তার সঙ্গে আর একটি ব্যঞ্জন হরফ যোগ করতে হবে, তবে সে হলন্ত হবে—যেমন 'শকতি' 'শক্তি' হয় ত-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই যুক্তাক্ষর বর্জন করতে পারি প্রচুর হলন্ত চিহ্ন লাগিয়ে। যেমন 'টেস্ট' কথাটা আনন্দবাজারীয় কায়দায় যদি ভাঙি, তবে 'টেস্‌ট' লিখলাম বটে, কিন্তু নিশ্চিত জানি না, পাঠক সেটা 'টেস্ট্' পড়বে না, 'টে-স্‌ট্' পড়বে। সেক্ষেত্রে 'টেস্‌ট্' লেখা যেতে পারে—উচ্চারণের যাথার্থ্য বোঝাবার জন্যে—'আপসট্'কে আপসট না লিখে লেখা যেতে পারে 'আপসুট্'। তা না হলে পাঠক 'আপসট' শব্দটিকে 'আপ্-সট্' 'আ-প-স-ট' 'আপসুট-অ' ইত্যাদি যা খুশি তাই পড়তে পারে। কারণ আমাদের ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে স্বরান্ত 'অ' থাকে স্বাভাবিকভাবেই—ক-অ, খ-অ, গ-অ ইত্যাদি

কিন্তু এতেও তদ্ভব, তৎসম ইত্যাদি শব্দের বেলায় যুক্তাক্ষর বর্জন করা যাচ্ছে না। সাহস করে যদি আমরা তদ্ভব, তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেও যুক্তাক্ষর বর্জন করি, এবং যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে হলন্ত চিহ্ন লাগাই, তা হলেও ছাপাখানার দৌলতে হলন্ত চিহ্নগুলি প্রায়শই ভেঙে গিয়ে লোপ পেয়ে নতুন কিস্তাই সৃষ্টি করতে পারে। আর তা যদি না-ও হয়, তা হলেও সমস্ত পৃষ্ঠা হলন্ত কণ্টকিত হয়ে একটা বিশ্রী রূপ নিতে পারে। যেমন, উপরোক্ত শেষ বাক্যটিকে হলন্ত চিহ্ন দিয়ে লিখলে দেখতে কেমন দেখায় দেখা যাক : 'আর তা যদি না্ও হয়, তা হলেও সমস্ত পৃষ্ঠা হলন্ত কণ্টকিত হয়ে একটা বিশ্রী রূপ নিতে পারে।' লক্ষ্য করুন, এখানেও 'একটা' কথাটি লেখা উচিত ছিল—উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী 'একটা'। অর্থাৎ আরো একটি হলন্ত চিহ্ন তা হলে বাড়লো। তাতেও কিন্তু টকার টকারের লাইনের উপরে নিচে যাওয়া ঠেকানো যাচ্ছে না। স্বরবর্ণের পরেও স্বরবর্ণের অতগুলি প্রতীক চিহ্ন থেকে গিয়ে বাংলা লিপি তথা টাইপের সংখ্যা বৃদ্ধি ও জটিলতা বৃদ্ধি করছে।

আরো আছে। বাংলা ভাষায় দুটি স্বরবর্ণের উচ্চারণ আছে, যার কোনোও হরফ নেই—অ্যা এবং অর্ধ-ও। 'এ' অক্ষরটি যুগপৎ এ এবং অ্যা উভয়ভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন বেলাভূমি, সন্ধ্যা বেলা (সন্ধ্যা ব্যালা), একটি, কিন্তু একটা (অ্যাকটা)। অর্ধ-ও এবং অ-এর উচ্চারণ নির্ভর করে শব্দের ব্যবহারের উপরে। যেমন, কেমন করে (কোরে) যে সে একাজ করে তা বোঝা কঠিন।

ভাষাতাত্ত্বিক যাঁরা তাঁরা বাংলা অক্ষরের এই ধরনের আরো নানান্ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বার করতে পারবেন। যেমন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, আদতা এবং উল্টা এই দুই ন-এর উচ্চারণ আলাদা। প্রথম ন-টি দন্ত্যবর্ণ, দ্বিতীয়টি তালব্যবর্ণ। তেমনি আমাদের সব ল-ই তালব্য ল, দু'টি ন-ই দন্ত্য ন। এ ক্ষেত্রে বাংলা উচ্চারণ অনুযায়ী অক্ষর হ্রাস করে ছাপাখানার ভার লাঘব করা যায় কি না, বাংলা লিপি সংস্কার নিয়ে যাঁরা ভাবছেন তাঁরা ভেবে দেখবেন।

কিন্তু যুক্তাক্ষর বা যুক্ত হরফের সমস্যার সমাধান করতে হলে, বাংলা মুদ্রণযন্ত্র, টাইপ রাইটারকে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ করতে হলে আমাদের বোধহয় রীতিমত কালাপাহাড়ী হতে হবে।

অনেকে বাংলা হরফের বদলে রোমান হরফের প্রবর্তনের কথা বলেছেন। এটা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আঘাত করে। তার চাইতে বাংলা হরফেই বৈপ্লবিক রূপান্তর আনার কথা ভাবা যাক না কেন?

রোমান হরফের মতোই সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণের অক্ষরকে হলন্ত করে নিয়ে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। এমন কি ব্যঞ্জনবর্ণের উপরে নিচে ই-কার, ঊ-কার, র-ফলা, রেফ, এ সমস্ত কায়েদা-ও এড়ানো যেতে পারে। অর্থাৎ, প্রতিটি ব্যঞ্জন হরফের আগে বা পরে প্রয়োজনীয় স্বরবর্ণের হরফটি বসিয়ে দিলেই হল। ছাপাখানার সুবিধার জন্য আ-এর জায়গায় া, অর্ধ-ও এর জায়গায় ইলেক (') এবং অ্যা-এর জায়গায় া্ চিহ্ন কটি রেখে বাকি সব স্বরবর্ণ যেমন আছে তেমন রাখা যেতে পারে।

এই পদ্ধতি গ্রহণ করলে বাংলা লিখন ও মুদ্রণ রীতি কেমন দাঁড়াবে তার একটা নমুনা দেওয়া যাক :

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি
পৃথিবীর পথে :
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে
মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি বিম্বিসার
অশোকের
ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূরে
অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;..."

জীবনানন্দ দাসের এই কাব্যাংশটির রূপ সংস্কার করা লিখন-পদ্ধতিতে দাঁড়াবে তাহলে এই রকম :

"হাজার বছর ধ'রে আমি পথ
হাঁটিতেছি পথিবীর পথে :
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে
মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার
অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূরে
অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;..."

ব্যাপারটা এখন অদ্ভুত মনে হচ্ছে, কিন্তু একবার অভ্যাস করে নিলে এটা খুবই সোজা ব্যাপার দাঁড়াবে। আসল কথা অভ্যাস। এখনই কি আমরা আপনট, টেলিট, লনডন ইত্যাদি আপনি, টেলি, লণ্ডন হিসাবে পড়তে অভ্যাস করে ফেলি নি?

সুতরাং যাঁরা বাংলা লিপি সংস্কার, মুদ্রণ যন্ত্র সংস্কার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, তাঁরা আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখুন :

এ্যা'ন হ'লএ ক্যা'ন হয়ন? (এমন হলে কেমন হয়?)। ■

১৯০৮ অভাল টেস্ট ম্যাচের রিপোর্টে উইসডেন লেখে : "তৃতীয় দিন চা-এর সময় হ্যামণ্ড নিশ্চয়ই ইনিংস ঘোষণা করতো না, যদি বিপক্ষ অধিনায়কের দুর্ঘটনা না ঘটতো।"

স্কোরবোর্ডে ইংল্যাণ্ড তখন ৭ উইকেটে ৯০৩ এবং 'বিপক্ষ অধিনায়ক' ডন ব্র্যাডম্যান। পায়ের পেশি মুচড়ে যাওয়ায় ব্র্যাডম্যান আর ব্যাট করতে পারবে না নিশ্চিতভাবে তা জানার পরই হ্যামণ্ড ইনিংস ঘোষণা করে। সে জানতো, ডন যদি ব্যাট করতে পারতো তাহলে নটসো রাণেও ইংল্যাণ্ড নিরাপদ নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে ইতালিতে মুসোলিনীর পতন ঘটেছে, কিন্তু হিটলারের জার্মানি লড়ে যাচ্ছে। কমন্স সভায় এক সদস্য বক্তৃতা করতে উঠে বললেন, "পলকোভ'কে আমরা অল্পেই আউট করেছি, এবার ব্র্যাডম্যান।" সভায় কারুরই এই রূপক দুরন্বয়ে অসুবিধা হয় নি। নির্দয়ভাবে বোলারদের নিষ্পেষণ করেছে যে ভয়ংকর ডিক্টেটর, তার নাম ব্র্যাডম্যান।

ব্র্যাডম্যানের প্রথম ইংলণ্ড সফর ১৯৩০-এ। নটিংহামে প্রথম টেস্টে করে ১৩১। সে যখন ব্যাট করছে নেভিল কার্ডাস জিজ্ঞাসা করলেন সিডনী বার্নেসকে, দেখে কি মনে হচ্ছে? বার্নেস জবাব দেন, "একথা বলবো না যে, আমি যখন যারুপভাবে বল করছি তখন ওকে আউট করতে পারতাম না। তবে আমাকে অত্যন্ত দারুণভাবে বল করতে হতো।" বার্নেস ২৭টি টেস্টে ১৮৯ উইকেট নিয়েছেন ১৬'৪৩ গড় রানে; এক সিরিজে ৪৯ উইকেট ১০'১৩ গড়ে।

ব্র্যাডম্যান একজনই

মতি নন্দী

বার্নেসের 'অত্যন্ত দারুণ' অতি-মানবদের জন্য।

১৯৭৪ সালে ব্র্যাডম্যানের ১১৯৬-৭ টেস্ট রেকর্ড লণ্ডনে বিক্রি হয়েছে ৭০০ গিনিতে, স্বাক্ষরিত 'কেয়ারওয়েল টু ক্রিকেট' বইয়ের কপি ১৪০ পাউণ্ডে।

কয়েকটি ব্যাপার মাত্র উল্লেখিত হলো, ডন ব্র্যাডম্যান কি ধরনের শ্রদ্ধা, ভয় ও বিস্ময়লতা আকর্ষণ করেছে বোঝাতে।

১৯৪৮ সাল পর্যন্ত একনাগাড়ে ২০ বছর ব্র্যাডম্যান যেভাবে ক্রিকেট মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে গেছে, তার আগে বা পরে কেউ সেভাবে পারে নি। অবিশ্বাস্য তার সাফল্যের ধারাবাহিকতা। ফিশের উপন্যাসের কোনো লেখকও তার নায়ককে এই রকম বিস্ময়কর সাফল্য দিতে সাহস পাবে না, ব্র্যাডম্যান যা করেছে: ইংল্যাণ্ডে প্রথম ম্যাচে ২৩৬; আগন্তুক প্রথম ব্যাটসম্যান যে মাসের মধ্যে ১০০০ রান; ইংল্যাণ্ডে প্রথম টেস্টে ১৩১; লর্ডসে প্রথম খেলায় ২৫৪; একপক্ষ পরেই লীডস-এ একদিনে ৩০৯ এবং লাঞ্চের আগে ১০৩। এসবই ২২ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে। এবং জীবনের ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি দ্বিতীয় ম্যাচে এবং প্রতি তৃতীয় ইনিংসে একটি শতরান দ্বারা ১১৭টি শতরান করেছে যতদিন না অবসর নিয়েছে। সব রকমের ম্যাচে ৬৬১ ইনিংসে রান ৩০,৭৩১ (গড় ১০'২৭)। শুধু প্রথম শ্রেণীর ম্যাচেই ২৮,০৬৭ রান ৩৩৮ ইনিংসে, গড় ১০'১৪ এবং টেস্ট ম্যাচে ৬:১৪, রান ৪০ ইনিংসে—গড় ১১'৯৪। অবিশ্বাস্য হয়ে যাওয়ার মতো হিসাব। ৮০টি টেস্ট ইনিংসের ৩৩টি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। অবশ্যই বলা দরকার ভারত, অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকার পিচে, যেখানে কুড়ি কুড়ি রান জমা, সেখানে খেলেনি নিউজিল্যাণ্ডেও না।

বোলারদের সম্পর্কে দুটি মূল কথা ব্র্যাডম্যান জানতো: কেউই ব্যাটের সুখের মুখের সঙ্গে অনবরত মোকাবিলা পছন্দ করে না কেউই সাধারণভাবে গুডলেংথ বোলিং পলকের দুটওয়ার্কে ওভারপীচ বলে রূপান্তরিত হওয়া পছন্দ করে না। বোলারদের খুন করার এবং বিপক্ষ অধিনায়কের মুখ বিমূঢ় করে তোলায় তার আনন্দ হতো।

ব্র্যাডম্যান যেমন বোলারদের শিরঃপীড়ার, তেমনি অপর প্রান্তে ব্যাটসম্যানের মানসিক শান্তি হরণের কারণ। একগাল হাসি নিয়ে সে গার্ড নেবে, সাজানো ফিল্ড দেখবে, ট্রাউজার্সে ছাঁচকা টান দেবে, ব্যাট হাতে তৈরি হয়ে দাঁড়াবে এবং তারপর তীক্ষ্ণস্বরে 'রাইট' বলেই প্রথম বল থেকে প্রথম রানটি নেবার জন্য বেরিয়ে পড়বে। এটাই সে অভ্যাসে পরিণত করেছিল। তারপর তখন যেন ২০, ৩০, ৩০ এবং অবশ্যম্ভাবী শতরানে পৌঁছে যেত, সে একাই খেলে যেত এবং অপর প্রান্তের ব্যাটসম্যান ক্রমশই হীনভাবের মধ্যে ডুবতো।

বোলিং-এ বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল ব্র্যাডম্যান। লারউডকে কলাগ্রে রেখে জার্ডিনের পরিকল্পনা—লেগসাইডে ফাস্ট বোলিং, মাথার

উচ্চতায় বল লাফাবে, লেগসাইড ঘিরে ফিল্ডসম্যান। কিন্তু ব্র্যাডম্যান যে-ভাবে এই বোলিং-এর (লারউডের জীবনের শ্রুততম অধ্যায়) মোকাবিলা করেছিল, কোনো যুগের কোনো ব্যাটসম্যানের পক্ষে তা সম্ভব হতো না। আশ্চর্যজনক উদ্ভাপূর্ণ সেই মোকাবিলা! হয়তো বেপরোয়াও! ১৯৩২-৩৩এ জার্ডিনের নিষ্ঠুর চ্যালেঞ্জের সামনে ব্র্যাডম্যান যে চোখ ধাঁধানো উদ্ভাবনক্ষমতা, 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' চারিত্রিক কাঠিন্য দেখিয়েছিল তার সারা জীবনে এর থেকে বিস্ময়কর আর কিছু সে করে নি

অনেকে বলেন, ব্র্যাডম্যান কেতাব-ছাড়া। একথাটাও ঠিক নয়। কেতাববহির্ভূত যদি হয়, তা ওর দৃষ্টিভঙ্গি। অন্যরা যে শুভ্রজ্যোৎস্না বল বিপজ্জনক সন্দেহ করবে, ব্র্যাডম্যান সেটিকে দৃশ্যান্তরে শান্ত দেখে। অকল্পনীয় আত্মবিশ্বাস, অসাধারণ বিচারবোধ, অসম্ভব রানের ক্ষুধা, অনতিক্রমণীয় মানসিক ধৈর্য ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ যদি আভাস দেওয়া হতো অমুক বোলার তাকে বুঝে ফেলেছে, তাহলে সেই বোলারের অংসই আমন্ত্রণ করা হতো

কেউ কেউ বলেন, এখনকার আঁটো আধুনিক অধিনায়কত্বের বিরুদ্ধে ব্র্যাডম্যান টিঁকতে পারতো না। আসলে ব্র্যাডম্যান মুচকি হেসে এই চ্যালেঞ্জ নিত। এই চক্রাকার ফিল্ড সে দেখেছে। কঠোর অধিনায়কদের বিরুদ্ধেও খেলেছে। ফিল্ড কিভাবে সাজানো হবে সেটা ব্র্যাডম্যানই ঠিক করে দিত, এটা ছিল তার কাছে মর্যাদার প্রশ্ন। বিপক্ষ অধিনায়করা বস্তুত তার ব্যাটিং-এর সময় হাস্যকর হয়ে পড়তো। তার বাউণ্ডারী প্রবাহ রোধ করতে হয়তো বিপক্ষ অধিনায়ক এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ফিল্ডসম্যান সরালেন আর সেই সরানো জায়গা থেকে ব্র্যাডম্যান পরের বলটি পাঠাবেই এবং একপাল হাসবে। পলকের মধ্যে বিদ্যুৎগতি ফুটওয়ার্ক দিয়ে চক্রাকার ফিল্ডের শোকগুলি সে বেকিয়ে দিত। অবশ্য বডিলাইন বল তাকে কিছুটা দমিয়েছিল। তার সেরা বছর ১৯৩০-এ ইংল্যাণ্ডে এক সিরিজে ৯৭৯ রান। ৪০ বছর বয়সে শেষ ইংল্যাণ্ড সফরে তার দুখী মেজাজটা অনেক কোমল, তবু ১১টি শতরান সে করেছে। ১৯৪৮-এ ব্র্যাডম্যান প্রায় ১০০০ রান তোলে যে ম্যাচগুলিতে ফ্রিম লেকার খেলেছে। একবারও সে ব্র্যাডম্যানের উইকেট পায়নি (১৯৪৬-তে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২টি ম্যাচে লেকার যথাক্রমে ১০ ও ১১টি উইকেট পায়)। ৪০ বছর বয়সেও ব্র্যাড-ম্যানের ফুটওয়ার্ক স্পিনারদের খুন করেছে।

টেস্টে একদিনে ৩০০ রান করা ছাড়াও ব্র্যাডম্যান দু'বার দ্বিশতাধিক রান করেছে একদিনে। অথচ বৃষ্টিভেজা পিচে ইংল্যাণ্ড বোলাররা ২০০-র কম রানে অস্ট্রেলীয় ইনিংস যেসব খেলার শেষ করে দেয় তার ১০টিতে ব্র্যাডম্যান খেলে। এই ১০ ইনিংসে চারবার মাত্র সে ১০ রান অতিক্রম করে। যে লোক ১৯২৭ থেকে ১৯৪৮ ক্রমান্বয়ে একের পর এক বিস্ময় সৃষ্টি করে গেছে, যে অলৌকিক ফুটওয়ার্ক আর দৃষ্টিশক্তি নিয়ে জন্মেছে স্পিন বোলিংকে জব্দ করতে, সে কেন কবচকুণ্ডলহারা কর্ণের মতো অসহায় হয়ে পড়ে বৃষ্টিভেজা পিচে।

এ সম্পর্কে ব্র্যাডম্যান কি বলে? তার মতে, স্টিকি উইকেট তো ব্যাটিং-এর বিজ্ঞানকে পারহাসের বস্তু করে তোলে। তাহলে তো ছেঁড়া টেবলে নামী খোলোয়াড়রা বিলিয়ার্ডস খেলবে আশা করতে হয়। তার বক্তব্য, সে জানে বৃষ্টিভেজা নরম পিচে কদাচিৎই ব্যাট করতে হবে। সুতরাং শক্ত পিচে খেলার জন্য যে টেকনিকটি দেরা তাই. সে প্রয়োগ করে এবং তাতেই সে অভ্যস্ত

স্টিকি উইকেটের টেকনিক অনাবৃত রেখেই সে টেস্টে হ্যামণ্ডের চেয়ে সাতটি এবং হাটনের থেকে দশটি বেশি শতরান করে। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তার ৩৭টি ম্যাচে ১৭টি জয়ে ১৩টিতে সে দিয়েছে শতরান, আর ১১টি হেরে যাওয়া ম্যাচে দিয়েছে ৪টি শতরান।

শুকনো উইকেটে এবং যখন সে ভুলে, কোনো বোলারই তখন ব্র্যাড-ম্যানকে আবিষ্কে রাখতে পারে নি। রান তোলার দ্রুতলয় সত্ত্বেও খুব কমই সে অসুন্দরভাবে বল মাটি থেকে তুলে মেরেছে। ব্যাটসম্যানশিপের দাবাড়ি সে জানিয়েছে, জানাতে গিয়ে নিজের হাত কখনো পোড়ায় নি। প্রত্যেক বোলার চেষ্টা করেছে মুহূর্তের জন্যও অন্তত ব্র্যাডম্যানকে খ্যাতিচ্যুত করতে। প্রথম রানটি বা দ্বিশত কি ত্রিশত সম্পূর্ণ করার রানটি পাবার জন্য কেউ তাকে একটিও সহজ বল দেয় নি। সেইজন্য ব্র্যাডম্যানও কখনো কোন ব্যাটসম্যানকে তার দাক্ষিণ্যের পাত্র করতে উৎসুক হয় নি। দিনের পর দিন তাকে ব্যাট করতে যেতে হয়েছে দূর-দূরান্ত থেকে আসা, সকাল থেকে লাইন দেওয়া দর্শকদের মন ভরাবার জন্য। ইংল্যাণ্ড সফর-কালে শারীরিক বা মানসিক

With Compliments from

J. V. GOKAL & CO.

International Buyers & Shippers

P. O. BOX 562
PHONE : 347623/9144
CABLES : 'AUSPICIOUS'
TELEX : 7553 A/B
GOKAL-CA

'WORLD TRADE CENTRE'
14/1-B, EZRA STREET,
CALCUTTA-700001.

An Export House Recognised By The Govt. Of India

Head Office :

"Kasturi Buildings" 171/2, J. Tata Road, Churchgate Recl,
Bombay-400020

অবসরের জন্য যদি সে জানাতো খেলবো না, তাহলে বহু কাউন্টি ক্লাব মেউলিয়া হবার দিকে আরও কিছুটা এগিয়ে যেত। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে খেলতে হয়েছে, পরিস্থিতি দাসে পরিণত করেছিল প্রভুকেই। এ যুগের আর কোন ক্রিকেটারই গাবি পূরণ করতে বিবেকের ডাকে এতটা সাড়া দিয়েছে কিনা সন্দেহ। শতরান করেও সে উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে আসতো না। দলকে জেতাবার মতো অবস্থায় পৌঁছে দেওয়ার বা পরাজয় থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন ছাড়াও ছেলে, বুড়ো, রসিক ও অরসিক সবরকমের দর্শককে মাতিয়ে রাখার কাজও তাকে করতে হতো।

ব্র্যাডম্যান কঠিনভাবে খেলেছে ঠিকই কিন্তু নীরসভাবে খেলে নি। আরাম এবং প্রচার বাদ দিয়ে সে ক্রিকেটকে ভাবতে পারে নি। প্রতিপক্ষকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে, কিন্তু দাক্ষিণ্যে রাজি হয় নি। প্রবল বিরোধিতার সে কদাচ অবমাননা করেছে বা তার থেকে দূরে সরে গেছে, কিন্তু নির্দয় হয়েছে অযোগ্য দুর্বলচিত্ততার প্রতি। ভালবাসা যত না পেয়েছে তার চেয়ে বেশি আদায় করেছে শ্রদ্ধা। সহজে সে বন্ধু করে না, বন্ধুত্ব রক্ষার জন্যও সে নিজের পথ ছেড়ে বেপথে যায় না। অসামাজিক আখ্যা সে পেয়েছে; তার কারণ যে কোন লোকের সঙ্গে মহরম মহরম করার তার রুচি কম। তার অ-জনপ্রিয়তার আংশিক কারণ তার প্রচণ্ড ক্ষমতা এবং ওজাদি। তার সাফল্য সহজেই মানুষের দুর্বল রিপু ঈর্ষাকে জাগিয়ে তুলেছিল। ব্র্যাডম্যান তার সেরা সময় নিঃসঙ্গ কাটিয়েছে। প্রতিভাই তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল অন্যদের থেকে।

ব্র্যাডম্যান ১৯৭৪-এ দীর্ঘ ১০ বছর পর লণ্ডনে যায়। সে সময় প্রশ্নোত্তরে জানায়, ইংল্যাণ্ডে তার সেরা সেরা ব্যাটিং নটিংহামে ম্যাকবেথের ২৩২, অস্ট্রেলিয়ার সেরা ব্যাটিং মেলবোর্নে বিশ্ব একাদশের পক্ষে সোবার্সের 'অবিস্মরণীয়' ২৫৪। তার জীবনে সেরা বোলার বিল তরিলী, ইংল্যাণ্ডের সেরা আলেক বেডসার। নিজের সেরা ব্যাটিং? ১২৩০-এ লর্ডসে ২৫৪ আর লীডসে একদিনে ৩০০ রান।

আজও এমন সুস্থায়ী বজায় আছে কি করে?—"গত ৪৩ বছর যাবৎ সু-জীবন যাপনে।" এক নৈশভোজে বক্তৃতায় ৪৯ বছরের ডন বলে, "আইনের অধীনে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নুরেমবুর্গে লর্ড বারকেট যা বলেছিলেন সেই সততা, আন্তরিকতা, বিশুদ্ধতা ও মানবিকতাই আমাদের চাই, নতুবা এই পিচ খেলার অযোগ্য হয়ে উঠবে।"

ডন সারাজীবন আইন মেনে ক্রিকেট খেলে গেছে। মাঠে এবং মাঠের বাইরে 'অযোগ্য পিচ' সে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই খেলার ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রে ডনের মতো সুদীর্ঘকাল এতখানি মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব কোন খেলার আর কেউ বজায় রাখতে পেরেছে বলে জানা নেই। ওর জীবনকথা ওর খেলার মতোই অভিভূতকারী এবং প্রেরণাদায়ক।

■

টেবল টেনিস স্কুল: একটি দিকচিহ্ন

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বছর দুয়েক আগে কলকাতায় বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসার আগে পর্যন্ত টেবল টেনিস খেলা কলকাতা তথা বাঙলার মানুষের কাছে তেমন কিছু আকর্ষণীয় বিষয় ছিল না। তখন একটি বিশেষ গোষ্ঠী, বিশেষ একটি সমাজ ছিল এই খেলাটির ধারক ও বাহক। কিন্তু বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার পর ব্যাপারটা পুরোপুরি বদলে গেছে।

টেবল টেনিস এখন যথেষ্ট জনপ্রিয়, যথেষ্ট আকর্ষণীয়। তা ছাড়া এই খেলাটির প্রচার ও প্রসারের জন্যে রাজ্য সংস্থার প্রচেষ্টা ও প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ফুটবল, ক্রিকেটের মতো আর্থিক সচ্ছলতা এই সংস্থাটির নেই ঠিকই—কিন্তু এদের আছে উদ্যম, আছে তৎপরতা, আছে কর্মকাণ্ডের জোয়ার বইয়ে দেবার ক্ষমতা।

তাই আর কোন সংস্থা যা পারে নি রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থা তাই করেছে। টেবল টেনিস খেলা শেখাবার স্কুল গড়েছে তারা। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ছ'মাসের পাঠক্রমে এক একটি পর্যায়ের জন্যে ভর্তি হয়। শারীর শিক্ষা এই স্কুলের একটি আবশ্যিক সূচী। রবীন্দ্র

With Best Compliments From

M/s. Inderchand Rajgarhia & Sons (Pvt.) Ltd.,

5, Hungerford Street,
Calcutta-700017.

Phone No. 44-7622.

Leading Suppliers of Mica
To World Markets.

সরোবর স্টেডিয়ামের মাঠে খালি হাতে ব্যায়ামের পর শুরু হয় খেলা শেখানোর ক্লাস। খেলা শেখান রাজ্যের নামী প্রাক্তন খেলোয়াড়রা। এই তালিকায় আছেন সমীর মুখার্জি, ডি. এন. লাহিড়ী, দীপক ঘোষ, শ্যামসুন্দর বসু প্রমুখরা। হাতে হাতে খেলা শেখাবার পর বসে কাগজে-কলমে খেলা বোঝার, আইন-কানুন জানার ক্লাস।

অর্থাৎ টেবল টেনিস স্কুলের কাজ সত্যিই একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো ঘড়ি বাঁধা সময়ে চলে। এবং ছেলে-মেয়েরা শুধু খেলাই শেখে না, মানসিক ও শারীরিক দিক দিয়েও তারা বেড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে। রবীন্দ্র সরোবরে রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার টেবল টেনিস স্কুলের সার্থকতা বোধহয় সেই-খানেই।

এবং আমাদের বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে এই স্কুলের ছেলে-মেয়েরা আসর মাত করে দেবেন। রাজ্য প্রতিযোগিতায় এঁরাই হবেন সেরা এবং জাতীয় আসর থেকে বাঙলার জন্যে হয়তো বয়ে আনবেন শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি।

সে অবশ্য অনেক দূরের কথা। তাই ও প্রসঙ্গ এখন থাক। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে টেবল টেনিস স্কুল গড়ে রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থা ভারতীয় খেলাধুলার জগতে এক নতুন পথের হদিশ দিয়েছেন। বিদেশে এ ধরনের ক্রীড়া-স্কুল অনেক আছে—কিন্তু আমাদের দেশে এ এক অভিনব প্রচেষ্টা। খেলাধুলার উন্নতির জন্যে রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থা সত্যিই একটি কার্যকরী পথ ধরেছেন।

দেখাদেখি যদি অন্য ক্রীড়া সংগঠন-গুলিও এগিয়ে আসতে পারে তাহলে খেলাধুলার জগতে সত্যিকারের বিপ্লব আনা সম্ভব হবে। কারণ গত তিরিশ বছর ধরে অনেক কাণ্ড চোড়া-চাঁড় হয়েছে, কিন্তু গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে সত্যিকারের কাজের কাজ শুরুতে আজও কেউ এগিয়ে আসেন নি। দুনিয়ার মানুষ ক্রীড়াঙ্গনকে মুঠোর মধ্যে পুরে পায়ের ওপর পা তুলে, নাকে সরষের তেল দিয়ে শুধু আয়েস করেই চলেছে। আর শি'পড়ের দুধবেশে লাভের গুড় খেয়ে চলেছেন যে তাঁরাই সে কথা জানতে বা বুঝতে আজ আর কারো বাকি নেই। খেলাধুলার জন্যে আমাদের দেশে বছরে কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়—কিন্তু তার বিনিময়ে অমুকবাবুর বাড়ি, অমুকের গাড়ি কিম্বা অমুক-বাবুর বিদেশ ভ্রমণ ছাড়া আখেরে কোন লাভই আমাদের হয় নি। এবং সরকারও এ ব্যাপারে বিশেষ কিছুই করে নি। ফলে খেলার মাঠের বাবুদের পোয়াবারো!

অথচ এই পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যেই রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থা একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তারা আর বাড়িয়ে এগিয়ে এসে পথ দেখিয়েছে। তাদের সেই আহ্বানে শুধু কলকাতার ছেলে-মেয়েরাই নয়, বিভিন্ন জেলার ছেলে-মেয়েরাও খেলা শিখতে হাজির হচ্ছেন রবীন্দ্র সরোবরের স্কুলে। সত্যি কথা বলতে কি এদের চেষ্টাতেই টেবল টেনিস খেলা আজ গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। টেবল টেনিস আজ কতোটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তার হিসেব সহজেই পাওয়া যাবে যদি আমরা বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আগের ও পরের চিত্রের দিকে একবার চোখ বুলোই।

একটা টেবল, দুটি ব্যাট আর একটি পিংপং বল হলেই যে খেলা চলে আমাদের এই গরিব দেশের ছেলে-মেয়েদের কাছে সেই টেবল টেনিস খেলা যে জনপ্রিয় হতে উঠবে এতে আর অবাক হবার কি আছে!

তবে এ কথা আজ মানতেই হবে যে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের টেবল টেনিস স্কুল আজ ভারতীয় খেলাধুলোর জগতে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। এখন অন্যরাও যদি এই পথের পথিক হন তাহলে আমাদের দেশের খেলাধুলার জগতে বিপ্লব আনা সম্পূর্ণ সফল হবে। তাই নয় কি···?

ফুটবল থেকে বুটবল লড়াইয়ে !

কৃপক সাহা

সম্প্রতি আমি একজন পরিসংখ্যানবিদের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রশ্ন ছিল : (এক) আমাদের একশো বছরের ফুটবল ফুটেজটিকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কতোজন খেলোয়াড় লাথালাথি করেছেন, ফুটবল সম্পর্কে কতো লক্ষ কোটি লক্ষ টমাটিক হয়েছে। (দুই) সেই লক্ষকোটি মহাকাশ থেকে ছিটকে গেলে পৃথিবী চৌচির হয়ে যাবে কি না (চার) ফুটবল নিয়ে বাঙালীর সবচেয়ে পছন্দটা উচ্চতায় করে হতে পারে পরিসংখ্যানবিদ আমার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারেন নি

আমার এই অনুসন্ধিৎসার উৎস মাত্রিটা ছিল ভারত সরকারের একটি ঘোষণাপত্র—যাতে পঁচাত্তর সালের অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বিভিন্ন খেলাধুলায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য মোট ১৯ জন স্পোর্টসম্যানকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার কোনো ফুটবলারের নাম খুঁজে পাই নি অর্জুন পুরস্কার কেন বা কাদের দেওয়া হয় প্রথমেই আলোচনার অবতারণা করি—ঐ পুরস্কার পাওয়ার জন্য খেলোয়াড়কে অন্তত তিন বছর উঁচু মানের ক্রীড়া-দক্ষতা দেখাতে হবে এবং সেই সঙ্গে ক্রীড়াঙ্গনে ও তার বাইরে শালীনতা ও খেলাধুলোসুলভ মনোভাবের পরিচয় দিতে হবে। সংক্ষেপে বিভিন্ন ভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে, তাদের সরকার ফুটবলারদের দেখা কাউকে পায় নি যে তিন বছর ধরে ভাল খেলছে এবং খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকে

কলকাতার ফুটবল মরশুম যখন বর্ষামুখর তখন ময়দানের পরিবেশটা দেখে কোনো জোড় মনে জাগে ফুটবল নিয়ে ঠিক ঠিক অর্থে এখনও উঠতে পারেনা

জনপ্রিয় এই খেলাটিকে যে হাল ছেড়ে হাজার হাজার খেলোয়াড় ফুটবল খেলেন, লক্ষ লক্ষ ও ফুটবল দেখেন, কোটি কোটি লোক

এই শরতে আকাশকে দেখে ঈর্ষা হয় আমাদের। সাদা মেঘের কোনোটা নৌকো, কোনোটা জাহাজ। ভরতরিয়ে ছুটে চলেছে নীল সমুদ্রে। কোথাও বাধা নেই। বিশৃঙ্খলা নেই। উন্মুক্ত, অবাধ। অথচ আমরা যারা এই কলকাতা শহরের মানুষ, তাদের চলার গতি প্রতি মুহূর্তে বিপর্যস্ত। এই দুরূহ সমস্যাটাকে মনে রেখেই ভূগর্ভ রেল তার

লক্ষ্যভেদে স্থির।

যানবাহনের জগতে ভূগর্ভ রেল গেঁথে চলেছে এমন এক সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ, যখন আমাদের চলার পথ হবে শরতের মেঘের মতই উন্মুক্ত, অবাধ আর বিঘ্নহীন।

ভূগর্ভ রেল মানেই গতির প্রগতি

কলকাতার নতুন যাতায়াত ব্যবস্থা—ভূগর্ভ রেল

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

ফুটবল নিয়ে আলোচনা করেন—তবুও কোনো বিশ্বকাপ বা অলিম্পিকে পাঠাবার মতো একটি ফুটবল দল গড়ার ক্ষমতা আমাদের বহু না:—কেন ?

একটা সময় ছিল যখন আমাদের দেশে ফুটবলাররা খালি পায়ে ফুটবল খেলতেন—মাঠে মাঝেমাঝে করতেন সাদা চামড়ার সাহেবদের। নাঙ্গা পায়ের তেজি দেখে আটত্রিশ সালে ভারত সফরকারী ইসলিংটন কমিন-খিয়াল ফুটবল দলের নেতা বলেছিলেন—'তোমরা সত্যিকারের ফুটবল খেল, আমরা খেলি রুটবল।' এ ঘটনার দশ বছর পর ফুটবল খেলতেই স্বাধীন ভারতের আঠার জন ফুটবল যোদ্ধা লণ্ডন অলিম্পিকের আসরে গেল নিজেদের সামর্থ যাচাইয়ের প্রতিজ্ঞা নিয়ে। চমক জাগাল প্রথম এবং একটি মাত্র খেলাতে শক্তিশালী ফ্রান্সের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করে। হারল ১-২ গোলে। ইওরোপীয়ানদের উন্নত সংবর্ধনা স্তিমিত হবার তিন বছর পর একান্ন সালে ভারত তার ফুটবলের স্বর্ণযুগটি শুরু করে দিল্লীতে প্রথম এশিয়ান গেমসে চ্যাম্পিয়ন হয়ে। যদিও সেই সাফল্যটিতে সামান্য চিড় ধরে পরের বছরই—হেলসিংকি অলিম্পিকে যুগোস্লাভিয়ার কাছে ১-১০ গোলের হারার সূত্রে। লণ্ডন অলিম্পিক ভারতীয়দের শিক্ষা দিয়েছিল খালি পায়ে ফুটবলে লড়া যায় না, হেলসিংকি চোখ খুলে দিল এশিয়ার অন্য দেশগুলোও নিজেদের তৈরি করছে। পরবর্তী অলিম্পিক মেলবোর্নে ভারত চতুর্থ স্থান পেল। অলিম্পিকে ভারতের সেরা সাফল্য।

পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি থেকে—আন্তর্জাতিক ফুটবলের আঙিনায় ভারতকে একটি সম্মানজনক ভিতে দাঁড় করিয়ে দেবার দায়িত্ব যিনি কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন—তিনি এম এ রহিম। দুর্লভ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই কোচ পঞ্চাশ সালে সোভিয়েত সফরে গিয়ে ইওরোপীয় ফুটবল সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে আসেন। মূলত ছিল নির্ভর ভারতীয় ফুটবলের কাঠামোটা তাঁরচোর করলেন উনি। বোঝালেন—ভালো মানের ফুটবলের জন্য তীব্র গতি, প্রচণ্ড শারীরিক সামর্থ দরকার। পঞ্চাশ সালে পাকাপাকি ভারতীয় দলের কোচ হবার পর রহিম সাহেব তৈরি করতে থাকলেন তাঁর মানস ফুটবলারদের।

পঞ্চাশ দশকে কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবলে ভারত ছিল একটি শক্তিশালী দল। ষাট সালে রোম অলিম্পিক থেকে ভারতীয়রা পদক আনতে না পারলেও অন্য সেরা দলগুলোর সঙ্গে এক পংক্তিতে বুক টান টান করে দাঁড়াবার মতো খেলা দেখিয়েছিল। বাষট্টিতে জাকার্তা এশিয়ান গেমসেই ভারত তার ফুটবলের স্বর্ণযুগটি শেষ করে, দ্বিতীয়বার এশিয়ান-সেরা হয়ে। এশিয়ান-সেরা সেই ভারতীয় দলটি অবশ্য সমৃদ্ধ ছিল চুনী-বলরাম-পি কে'র সহজাত সৃজনী শক্তির সম্পদে, যার অভাব এখন ভারতীয় ফুটবলের মান টেনে নামাচ্ছে।

বেষট্টি সালের সেপ্টেম্বরে রহিম সাহেবের মৃত্যুতে ভারতীয় ফুটবলের পিতৃবিয়োগ ঘটে। জাকার্তার সাফল্যে অতিরিক্ত আত্মতুষ্টি এবং প্রকৃত প্রস্তুতির অভাবে ভারতীয় ফুটবল যে পিছলে পড়তে শুরু করেছিল তা মালুম হয় টোকিও অলিম্পিকের ঠিক আগে। প্রি-অলিম্পিকের ছটো খেলায় চীনের কাছে মোট ১-৬ গোলে হারার সঙ্গে সঙ্গে অলিম্পিকে যাবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। চৌষট্টি থেকে সাতাত্তর—এই তেরো বছরের ফুটবলের ইতিহাসে ভারতীয় যুবদল তুরাবরে তেহেরান থেকে যুগ্মবিজয়ীর সম্মান এনেছিল মাত্র একবার। আর কিছু উল্লেখযোগ্য নেই। উদ্যম আর সাহসের অভাবে এখন ভারত আর অলিম্পিকে এবং বিশ্বকাপে যাওয়ার কথা ভাবে না।

এ দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলার এই হাল কেন তার উত্তর কিছু কিছু নিশ্চয়ই দিতে পারি। (এক) রহিম সাহেবের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোচের অভাব ; (দুই) ফুটবল কর্ম-কর্তাদের দূরদর্শিতার অভাব ও আলস্য ; (তিন) ক্রমীর প্রতি মোহ এবং গোষ্ঠী কোন্দল ; (চার) এশীয় এবং বিশ্ব ফুটবলের পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে ওদের অজ্ঞতা ; (পাঁচ) পরিকল্পনা-মাফিক এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের অভাব ; (ছয়) খেলোয়াড়দের মধ্যেও আন্তরিকতার এবং জাতীয়তাবোধের অভাব ; (সাত) নিয়মানের রেফারীং ; (আট) গত তিন দশকে সরকারী নিষ্ক্রিয়তা ; (নয়) ফুটবলারদের আন্তর্জাতিক ম্যাচের অনভিজ্ঞতা এবং (দশ) এখনও ফুটবলারদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আনার ব্যাপারে সরকারী উদাসীনতা। ■

- পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আইনের অগণতান্ত্রিক ধারাগুলির অবিলম্বে বিলুপ্তি ঘটানো হো'ক।

- আমলাতান্ত্রিক জটের জটিল আবর্ত থেকে মুক্তি পেয়ে সমবায় কর্মতৎপরতা সুস্থ, সরল ও স্বাভাবিক পথে নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে পরিচালিত হো'ক।

দি শিবপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থা: ১২২৯ সাল

১৭৩, ১৭৪ নং শিবপুর রোড

হাওড়া-৭১১১০২

ফোন ঃ ৬৭২০৫৮

সাঁতারে বাঙলার মান অস্তমিত প্রায়

বিশু শর্মা

পাশ্চাত্য দেশগুলি বিশেষ করে গণতান্ত্রিক জার্মানি, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া সাঁতারের মানকে যেভাবে দিনের পর দিন এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে চলেছে, এমন সময়ের মধ্যে বেঁধে দিচ্ছে, এরপর সেই সময়কে অতিক্রম করা একমাত্র অতিমানবের পক্ষে সম্ভব হবে। বিজ্ঞানের প্রভাবে, উপযুক্ত কোচিং এবং কঠোর অনুশীলনের দ্বারা তারা এক একটি দেশকে চ্যাম্পিয়ন তৈরি করছে এবং সেই সময়গুলি চ্যাম্পিয়ন করে তোলার দিচ্ছে। পুরুষ সাঁতারুরা ১০০ মিটার ফ্রেস্ট স্ট্রোক ছাড়া ১০০ মিঃ ফ্রি স্টাইল, বাটারফ্লাই এবং ব্যাক স্ট্রোক সব ইভেন্টেই এক মিনিটের নিচে সময় করে নিয়েছে। এ তো শুধু পুরুষদের ব্যাপার। ওই দেশের মেয়ে সাঁতারুরাও সাঁতারে চমক লাগিয়ে দিয়েছে। লজ্জার ব্যাপার যে ওই দেশের মেয়েরা সাঁতারে পাল্লা দিয়ে ভারতের পুরুষদের হারিয়ে দেবে। আমাদের পুরুষ সাঁতারুরা এ পর্যন্ত যা সময় করেছে তার থেকে অনেক কম সময় ওই দেশের মেয়েদের।

কিন্তু কেন? ভারত সাঁতারে পিছিয়ে কেন? গবেষণা করলে দেখা যাবে, পাশ্চাত্য দেশের সাঁতারুরা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অনুশীলন করে, কঠোর পরিশ্রম করে। কোচদের উচ্চ মানের কোচিং এবং সবশেষে কয়েকটি দেশের সরকারও প্রচুর নজর দেয় খেলাধুলার উন্নতির জন্য। আমাদের দেশে কোনটাই হয় না বলে মনে হয়। শুনতে অবাক লাগে, এমন কোচ নেই ভারতে, যারা সাঁতারুদের অনুপ্রেরণা দেবে, সময় কমাবার পদ্ধতি বলে দেবে।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তো আরো সঙ্গীন। একসময়ে ভারতে পশ্চিমবঙ্গের সাঁতারুদের দাপট ছিল বেশি। অবশ্য বিদেশের তুলনায় নগণ্য। আগে ভারতীয় দল যখন অলিম্পিকে সাঁতারে প্রতিনিধিত্ব করত তখন দলে বাঙলার সাঁতারুই বেশি থাকত। যদিও তাদের ফল দেখা যেত বড়ই হতাশজনক। বাঙলার তখনকার নামী সাঁতারুরা নিজ প্রচেষ্টায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ভাল কোচিং না পেয়েও। ধীরে ধীরে বাঙলা সাঁতারে নিজের অস্তিত্ব হারাতে থাকে পঞ্চাশ দশক থেকে। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায় বোম্বাই,

মন্‌ট্রিল অলিম্পিকে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছে সোভিয়েত কিশোরী মাশা ফিলাতোভা।

মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, সার্ভিসেস ও রেলওয়েজ।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সাঁতারের মান আরো নিম্নগামী। তার কারণ অনেক। প্রথমত বাঙলার উদীয়মান তরুণ সাঁতারুরা যখন নিজেদের সাঁতারে প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে তখনই রেলওয়েজ তাদের চাকরি দিয়ে নিজ দলে টেনে নিচ্ছে। রেলওয়েজ হচ্ছে শক্তিশালী আর বাঙলা হচ্ছে দুর্বল। ওই সাঁতারুরা চাকরি পাচ্ছে ভাল কথা। কিন্তু বাঙলার সাঁতারে সংকট সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারছে না। বাঙলার সাঁতার সংস্থার কর্মকর্তারা নিজেদের গণ্ডি আগলাতেই ব্যস্ত থাকে। সাঁতারের উন্নতির কোন ব্যবস্থা তারা নেয় না। সরকারের স্পোর্টস কাউন্সিল সাঁতা

মস্কো অলিম্পিক ঃ ১৯৮০

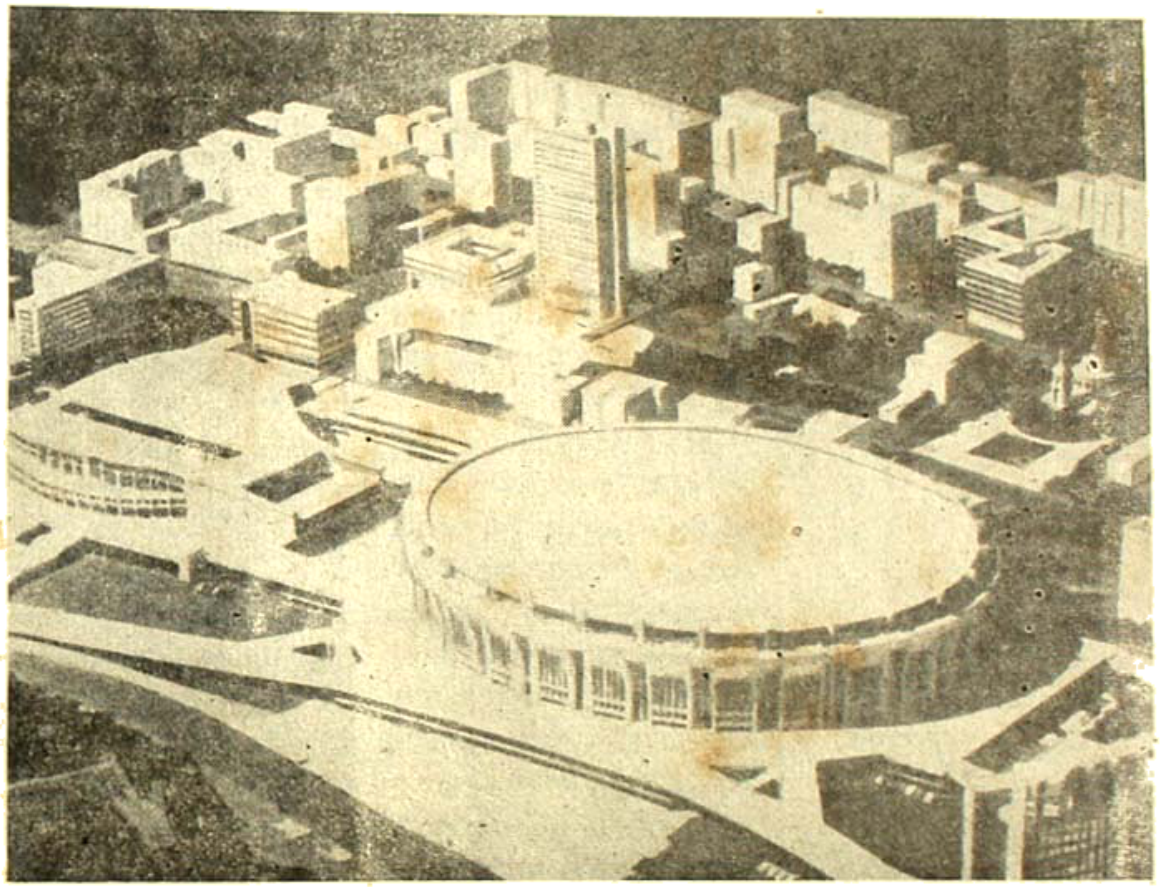

বিশ্বক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত স্বপতির। সৌকর্যের পরিচয় দেবেন।

২২-তম গ্রীষ্ম অলিম্পিক ক্রীড়ার আসর বসছে মস্কোয় ১৯৮০ সালে। অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর করতে জোর প্রস্তুতি চলছে। মস্কোর মধ্যভাগে প্রসপেক্ট মিরা এলাকার অদূরে ৪৫ হাজার দর্শক আসনবিশিষ্ট যে সুদৃশ্য বিশেষ ধরনের স্টেডিয়াম নির্মিত হবে এটি তার নক্সা। এছাড়া স্টেডিয়ামটির সঙ্গে যুক্ত থাকবে ১৫ হাজার দর্শক স্ট্যাণ্ডবিশিষ্ট একটি সুইমিং পুল।

সাহিত্য সংসদের বই

● **সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান**

প্রধান সম্পাদক : ডঃ সুবোধ-চন্দ্র সেনগুপ্ত। সম্পাদক অঞ্জলি বসু। বাঙালী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে গেছেন, এমন ৩,৪০০ বাঙালীর তথ্যসমৃদ্ধ জীবন-চরিত। পৃ: ৬৪৮, লাইনো হরফ। [৪০·০০]

● **স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন**

ডঃ শঙ্কর ঘোষ কর্তৃক তথ্যনিষ্ঠ বিশদ আলোচনা। বর্তমান কালের অবশ্য পাঠ্য বই। ১০·০০]

● **বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা**

সতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস আলোচিত ৮ রানচিত্র। [১৫·০০]

● **প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য**

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তথ্যসমৃদ্ধ, ভারতীয় সাহিত্য সবিশেষ আলোচিত। [২৫·০০]

● **বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া**

ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। তত্ত্ব, বিবর্তন ও বিশিষ্ট কীর্তনীয়াদের জীবন-কথা। ১০ আলোকচিত্র। [১০·০০]

● **তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ**

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। তারাশঙ্করের সমগ্র ছোট গল্প [প্রায় ২০০] তিন খণ্ডে সন্নিবিষ্ট। [প্রতি খণ্ড ৪০·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৯

উন্নতির জন্য অর্থসাহায্য করলেও তারা সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হয় না। কোন কোচিংয়ের ব্যবস্থা নেই। সম্প্রতি তারা বেলে-ঘাটায় সুইমিং পুলটি পেয়েছে সি আই টির কাছ থেকে। সেই পুলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাসে পাঁচ হাজার টাকা দরকার। এতই মেরু-দণ্ডহীন সংস্থা যে সেই পুলের খরচের টাকা জোগাতে পারবে কি না তাই নিয়ে এখন তাদের আলোচনা চলছে। পুল তো পাওয়া গেল। কিন্তু তরুণ সাঁতারুদের সাঁতার শেখাবে কে ওই পুলে?

ভাল কোচ নেই বাঙলাদেশে, শুনতে অবাক লাগে! এন আই এস কোচ মাত্র একজন। সে কোনদিক সামলাবে। আর যেসব কোচ আছেন তারা নিজেদের বিদ্যা দিয়ে কোচিং করেন। সাঁতারুরা তাদের কাছে কোচিং নেবার পর যখন একটি সময়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে যায় তখন সেই নির্দিষ্ট সময়কে ভেঙে আরো ভাল অর্থাৎ উন্নত সময়ে পৌঁছে দেবার বিদ্যা সেই কোচদের জানা নেই। ফলে সাঁতারুরা সেইখানেই শেষ হয়ে যায়। এখানে দরকার বিজ্ঞানের কোচ আনিয়ে আমাদের কোচদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। আমাদের সাঁতার সংস্থার সেই দৃষ্টিশক্তি নেই। আর্থিক অনটন, দারিদ্র্য এবং ভাল খাদ্যের অভাবও উঁচুমানের সাঁতারে পৌঁছে দিতে পারছে না। বেশিরভাগ সাঁতারুই দরিদ্র, পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। ফলে দৈহিক শক্তির অভাব দেখা যায়।

সবশেষে বলি বাঙলার সাঁতারের ভবিষ্যৎ আরো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে দলাদলি এবং মর্যাদার লড়াইয়ের জন্য। একই রাজ্য থেকে দুটি দল অংশ নিচ্ছে জাতীয় সাঁতারের আসরে গত তিন-চার বছর যাবৎ। বাঙলার সাঁতার সংস্থার মর্যাদাহানি হচ্ছে, এই কারণে হেঁদুয়ার স্থাশনাল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন ক্লাব রাজ্য সাঁতার সংস্থার অনুমতি না নিয়ে জাতীয় আসরে নামছে। স্থাশনাল দাবি জানাচ্ছে, "সুইমিং ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তারা একজন। আমাদের ওই ফেডা-রেশনে একটি সদস্য আসন আছে। আমরা পৃথক দল পাঠাব।"

একই রাজ্যে দুটি সাঁতার সংস্থা থাকতে পারে না—এই প্রতিবাদ জানিয়ে বাঙলা সাঁতার সংস্থা কোর্টে মামলা লড়ছে। গতবার তারা জাতীয় সাঁতার বয়কট করেছে। এবার মামলার রায় প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তারা ঠিক করতে পারছে না বাঙলা দল জাতীয় সাঁতারে অংশ নেবে কি না। অপরদিকে স্থাশনাল ক্লাব নিজ ক্লাবের সাঁতার প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারছে না। এই মর্যাদার লড়াইয়ের মাঝে পড়ে বাঙলার উদীয়মান সাঁতারুদের ভবিষ্যৎ কি পর্যায়ে এসে দাঁড়াচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং ভারতে সাঁতারের পথপ্রদর্শক পশ্চিমবঙ্গকে আবার শীর্ষস্থানে দেখতে পাব এমন আশা আপাতত করতে পারছি না।

★

ভলিবল গণক্রীড়া হতে পারে

প্রসাদ রায়

চলতি শতাব্দীর ত্রিশ দশকের গোড়ার দিকে বাঙলা তথা ভারতে ভলিবলের প্রচলন হয়। আজ থেকে ২৫ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৫২ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশীপে ভারত অংশ গ্রহণ করে ১৩টি দেশের মধ্যে অষ্টম স্থান পায়।

দেশীয় ভলিবলের উন্নতির ধারা ঠিক এমনিভাবে অব্যাহত ছিল কিছু দিনের জন্য। ১৯৫৫ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ভলিবলে ভারত স্বর্ণপদক লাভ করলেও ১৯৫৬ সালে তৃতীয় বিশ্ব আসরে ভারত অষ্টম স্থান থেকে ২১তম স্থানে নেমে আসে। এবং পরবর্তী ২২ বছরে (১৯৫৬-১৯৭৭) বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশীপের মূল আসরে যোগদানের মতো সামর্থ ভারতের পক্ষে অর্জন করা সম্ভবপর হয় নি। গত বছর প্রাক-বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপের এশীয় আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করায় বিশ্ব আসরে যাবার প্রশ্নই ওঠে নি।

আন্তর্জাতিক আসরে ভারতীয় ভলিবলের অবস্থান এই। বিশ্বের ১১১টি দেশ আজ আন্তর্জাতিক আসরে স্বীকৃত। উন্নতির সোপান রচনার ক্ষেত্রে ভারত আপাতত: পিছিয়ে থাকলেও দূর প্রাচ্যের বা পাশ্চাত্যের দেশগুলি কিন্তু পিছিয়ে নেই। বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশগুলিতে ভলিবল বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

সারা বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখলে বলা যায় যে দূর প্রাচ্যে শ্রেষ্ঠতম জাপান ভলিবলের প্রসারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমন কি পাশ্চাত্যে যেমন ফুটবল বা ক্রিকেটকে নিয়ে টেলিভিশনের পর্দা কাঁপে, জাপানী টেলিভিশনের পর্দায় তেমনি ভলিবল।

জাপানকে বাদ দিলে পৃথিবীর বুকে এখন সোভিয়েত, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, জেডারেল জার্মানী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ভলিবলের আসরে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করে আছে এমনকি ছোট ছোট রাষ্ট্র কিউবা, ব্রেজিল, হাঙ্গেরী, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ভলিবলের আসরে পিছিয়ে নেই। ১৯৭৬ এর মন্ট্রিল অলিম্পিকের আসরে ফলাফল লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়।

এতো সন্তায় দলগত খেলা আর কিছুই নেই। বাঙলার গ্রামে গ্রামে ভলিবলের কোর্ট তার বড় প্রমাণ। অথচ ভারত ভলিবলের প্রসার ঘটাতে পারে নি। প্রাথমিক পর্যায়ে কতিপয় উচ্চমানের খেলোয়াড়ের সন্ধান মেলায় সামান্য কৃতিত্ব দেখাতে পারলেও অচিরেই তা উবে গেছে।

প্রশ্ন থাকতে পারে কেন এই বিপর্যয়—একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে—আমরা রাজনীতির জালে জড়িয়ে আছি। কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই।

তাছাড়া সংগঠকদের দূর্নীতির জালেও জড়িয়ে পড়া একটা বিরাট কারণ। এছাড়া গোষ্ঠি কোন্দল আছে। প্রধান রূপ বলা যেতে পারে, বিগত তিন বছরের সর্বভারতীয় ভলিবল কেডারেশনে ত্রিপাঠী গ্রুপ বনাম কৃষ্ণ গ্রুপের লড়াই। সর্বভারতীয় ভলিবল সংস্থা পরিচালনার দায়িত্ব নিতে অনুৎসাহীদের গোষ্ঠি-কোন্দল, পান্টা সংগঠনের মাধ্যমে একাধিক জাতীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা, স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির বয়ান···এমন অনেক কিছু!

সৈহিক, মানসিক, সকল দিক দিয়ে আজও আমাদের খেলোয়াড়রা (অন্তত: যারা শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত) পাশ্চাত্যের খেলোয়াড়দের থেকে পিছিয়ে আছে পিছিয়ে আছে প্রশিক্ষণের দিক দিয়ে, খেলোয়াড় গড়ার প্রচেষ্টার দিক দিয়ে।

তাই আবার নতুন করে ভলিবলের সূচনা করা দরকার, দরকার শিশু বয়স থেকে খেলোয়াড় গড়ার প্রচেষ্টা। সেই প্রচেষ্টা সার্থক হলে তবে সংগঠকদের মতো থেকে দুর্নীতি দূর করতে পারলে আগামী এক দশকের মধ্যেই হয়তো ভারত বিশ্বের আসরে উচ্চ স্থান দখল করতে পারবে।

22-2446

P. MITRA & CO.

PAPER MERCHANTS

Authorised Dealer :

Titaghur Paper Mills Co. Ltd

P-7, O'd China Bazar Street,
Calcutta-700001

যাত্রাশিল্প

সত্য ঘোষাল

নিগ্রহো দুর্বিনীতানাং সতানাং
দমনক্রিয়া।
দুঃখার্তানাং শ্রমার্তানাং শোকার্তানাং
তপস্বিনাম্
বিশ্রান্তিজননং কালে নাট্যমেতন্ময়া
কৃতম্;
নানাভাবোপসম্পন্নং
নানাবস্থান্তরাত্মকম্
লোকবৃত্তানুকরণম্
নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্;

নাট্যাভিনয়ের উপযোগিতা বোঝাতে এই উক্তি ভরত মুনির। প্রায় তিন হাজার বছর ধরে ভারতে চলছে নাট্য প্রযোজনার এই কাজ। দু-হাজার বছর পরে সেক্সপীয়রও অনুরূপ উক্তি করেছেন, "to hold as it were the mirror upto Nature."

প্রথম অভিনয়ের উদ্যোক্তা দেবতারা। দেবাসুর যুদ্ধে জয়ী দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রের নেতৃত্বে এক ধ্বজ খাড়া করে তার নিচে দাঁড়িয়ে সেই যুদ্ধের নকল করেছিলেন। সেই প্রথম অভিনয়। বলা যেতে পারে মুকাভিনয়। এই ধারাই এসে ঠেকেছে যাত্রায়। অবশ্য বরাবরই মুকাভিনয় থাকে নি। দেবতাদের আমোদ পণ্ড করার জন্য অসুরেরা হানা দিয়েছে, ইন্দ্র বাণ নিয়ে তাদের হটিয়ে দিয়েছেন। তার ফলে বাণের ডগাটি ছিঁড়ে গেছে। তার নাম 'জর্জর'। 'জর্জর' সেই থেকে নাটকের নিশান। তার ছটি 'পাব' দু-রকম তাকড়া দিয়ে জড়ানো থাকত, তাতে অভিনীত হতেন দু-জন নাম করা দেবতা। নাটক আরম্ভ করার আগে তাদের পূজা দিতে হোত। কালক্রমে এটাই হয়ে দাঁড়াল সংস্কার, পুজো না দিলে নাটক পণ্ড হবে। পুজো দেওয়ার পর পুঁতে দিতে হোত 'জর্জর'টি। এরই জের চলে আসছে আজ পর্যন্ত। গ্রামের 'যাত্রায়' তো বটেই, অ্যাম্বেচার থিয়েটারেও এ রেওয়াজ প্রত্যক্ষ করা যায় আজও অনেক জায়গায়। এখন অবশ্য অসুরেরা তাড়া করে না, থিয়েটারি পরিভাষায় যাকে বলে 'মার খাওয়া' তাই হয়। নাটক 'মার খায়'। বারোয়ারি যাত্রার আসরে, সেনাপতির যাত্রার দলে 'ঘট তোলা', 'পুজো দেওয়া' প্রভৃতির সকলেই প্রত্যক্ষদর্শী।

'জর্জর'টি পুঁতে দিয়ে অভিনয় করার এই প্রথা থেকে কালক্রমে গড়ে উঠেছিল 'পেক্ষা ঘর অ' বা প্রেক্ষাগৃহ। এবং স্বভাবতই এইগুলি গড়ে উঠেছিল প্রধানতঃ দেবস্থানে, রাজগৃহে, আর অবস্থাপন্ন বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠীদের গৃহে। সে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। এখানে যা প্রাসঙ্গিক তা হল এই যে এর বাইরে মুকাভিনয়ের ধারাটিও প্রচলিত ছিল। এবং এই দুই নাট্যাভিনয়েরই বিষয়বস্তু ছিল দেবাসুরের দ্বন্দ্ব, প্রেরণা ছিল ন্যায় অন্যায়ের সংঘাত, আর অনিবার্য পরিণাম ছিল ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের অবক্ষয় ও সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের পতনের সঙ্গে সঙ্গে 'পেক্ষা ঘর অ' বা নাট্যশালারও লয় হয় কিন্তু উচ্চকোটির বাইরে সাধারণ মানুষদের মধ্যে মুকাভিনয় যা অভিনীত হোত তা মরে নি। সেই ধারাই চলে আসছে আজকের যাত্রা পর্যন্ত।

"মোরঙ্গি পুচ্ছ পহরিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী", ময়ূরপুচ্ছ-দিয়ে-বানানো গুঞ্জমালা গলায় দিয়ে বসে-থাকা ব্যাধের মেয়ে সেই 'সবরী বালী'—চর্যাপদের সেই কথা আর "আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন" কৃষ্ণকীর্তনের সেই কিশোরীর দীর্ঘশ্বাস, কানের ভিতর দিয়ে বাঙ্গালির মর্মে যা বরাবর প্রবেশ করে আসছে তা এই। আর এই দুইয়ে মিলেই গীতাভিনয়—বাঙ্গালির যাত্রাগান। বহু উত্থান পতনের মধ্যেও এ-জিনিস কখনোই মরে নি। 'গীত বাদ্যাদি সহকারে' রাসযাত্রা এবং কৃষ্ণযাত্রা বরাবরই প্রচলিত ছিল। এছাড়া ছিল 'দেবী মাহাত্ম্য গান'। যাত্রার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিশ্বকোষ বলছেন, "কৃষ্ণকে নায়ক করিয়া অপর সকলে আপনাদেরকে তাঁহাদের সখারূপে জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের লীলায় অংশভাগী হইবার নিমিত্ত উৎসবে যোগদান সমাধানকে যাত্রা বলে"। এরই প্রকাশ আজও দেখা যায় যখন গ্রাম বাঙলার লোক বলে 'যাত্রা শুনতে যাচ্ছি', কেউ বলে না 'যাত্রা দেখতে যাচ্ছি'। যেমন কেউ-ই বলে না, 'থিয়েটার শুনতে যাচ্ছি; সিনেমা শুনতে যাচ্ছি' সকলেই বলে, 'থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি, সিনেমা দেখতে যাচ্ছি'। বস্তুতঃ থিয়েটার, সিনেমা হল দেখার, যাত্রা হল শোনার, এই হল লোকমত।

ধীরে ধীরে যাত্রাগানের এই চলন

রূপের পরিবর্তন ঘটে এবং এক জায়গায় সমবেত হয়ে যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠানের রীতি প্রচলিত হয়। এমনি করেই চলতে চলতে যাত্রাগান পঞ্চচরিত্র পায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরে। বাঙলাদেশের জেলায় জেলায় বারোয়ারি মণ্ডপে মণ্ডপে যে পালাগান হোত শ্রীচৈতন্য তাকে নিয়ে গেলেন হাটে মাঠে পল্লীর পথে পথে। জয়দেবের সময় থেকে বাঙলার জীবন কাব্যের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের যে আকুতি ব্যক্ত করে আসছিল তাকে রসালো করে তুললেন ভক্তিবাদ আর মানবপ্রীতি দিয়ে। খাঁটি বাঙালি নাটক আর খাঁটি বাঙালির মাঝে তার সত্যিকার অভিনয়ের স্থান নির্দিষ্ট হল। হিন্দু, মুসলিম ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি মিলে তাকে উজ্জ্বলতা দিল। বাঙালির জীবনে, বাঙালির ধর্মে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যাত্রা একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। প্রসার ঘটল যাত্রাগানের। এই যাত্রার নাটকার হিসেবে উল্লেখযোগ্য নাম কবি লোচন দাস, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি। শ্রীরূপ গোস্বামীর 'ললিত মাধব', 'বিদগ্ধমাধব' প্রভৃতি নাটকের খ্যাতি সুদূর চিতোরে মীরাবাঈয়ের কাছেও যেয়ে পৌঁছেছিল।

এ এমনই একটি জোয়ার যে যাত্রাগান বৈষ্ণবদেরই পেশা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সুবিখ্যাত যাত্রা পালারচনাকারী ও যাত্রাওয়ালাদের অধিকাংশই ছিলেন বৈষ্ণব। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে যাঁর নাম করতে হয় তিনি পরমানন্দ অধিকারী। পালা থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশ বর্জন করে ইনি যাত্রাপালায় আনেন ভক্তি রসের প্লাবন। তারপর আসেন যদু অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি পালাকার ও গায়কগণ। এরই স্মৃতি সেদিনও বেঁচে ছিল, তাই যাত্রাদলের পরিচালককে বলা হোত 'অধিকারী', পরিচালক বা ম্যানেজার বলা হোত না। 'ম্যানেজার' এসেছে আধুনিক কালে, 'পরিচালক' একেবারে সাম্প্রতিক।

বৈষ্ণবদের হাত ধরে যাত্রাগান অতঃপর এসে পৌঁছাল কলকাতার নব্যবাবুদের আসরে। বাবুদের স্ব-পেশাদারী সখের যাত্রাই গড়ে তুলল চিৎপুরের যাত্রাপল্লী। তখনকার প্রসিদ্ধ যাত্রা হল প্যারীমোহনের যাত্রা। শ্যামবাজারের নবীনমাধব বসুর 'বিদ্যাসুন্দর' পালা তো রীতিমতো আলোড়ন তুলেছিল। "যখন আগুন জ্বলছে ছিগুণ, করল কি গুণ ঐ বিদেশী"—এই গানের কলি লোকের মুখে মুখে ঘুরত। গোপাল উড়ের খ্যাতিও কম ছিল না।

পেশাদারী যাত্রার পরিকৃত হলেন হুগলি জেলার মদন মাস্টার। পেশায় শিক্ষক ইনি ছিলেন একাধারে নাটকার, পরিচালক ও অভিনেতা। এঁর 'দক্ষযজ্ঞ', 'ধ্রুবচরিত্র', 'মদনভস্ম' প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিল। এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান তাঁর পুত্র নবীন এবং নবীনের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী 'বৌরাণী'। এঁর প্রতি শ্রদ্ধায় চন্দননগরের একটি রাস্তার নাম হয়েছিল 'বৌমাস্টার গলি'। এই সব যাত্রায় ছেলেরাই মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতেন, সখী ছিল রাশি রাশি, তাদের ক্রমাগত নাচতে হোত, গাইতে হোত। এ ছাড়াও ছিল যাত্রার একান্ত নিজস্ব 'গায়ক,' ও 'একালে ছেলে বা অপেরা ছেলে' বলে পরিচিত বালকের গান।

ইতোমধ্যে মঞ্চ হাঁকিয়ে বসেছে কলকাতায়। ইংরেজী লেখা শিক্ষিত মানুষের ভিড় জমেছে সেখানে। কিন্তু মরে নি যাত্রা। সুপ্রসিদ্ধ অতি রায়ের যাত্রার দল আর গিরিশচন্দ্রের থিয়েটার পাশাপাশি চলছে। দুইয়ের মেলামেশার ফলও ফলেছে ধীরে ধীরে। যাত্রার প্রভাব পড়ল মঞ্চে আর মঞ্চের অনুকরণে কাঠামো বদল হল যাত্রার। সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাব্যবসায়ী মধুর সাহা মহাশয় নিম্ন সম্প্রদায়ের নাম দিলেন 'থিয়েট্রিকাল যাত্রা পার্টি' যাত্রা থিয়েটারের নকল শুরু করল। সখীর দল ক্রমশ থেকে গেল, থেকে গেল 'অপেরা ছেলে' আর 'বিবেক' কিন্তু ঝুড়ি বিদায় নিল, সময় কিছুটা সংক্ষেপ হল।

যাত্রায় আধুনিকতা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে আর একটি স্মরণীয় নাম—সূর্যকুমার দত্ত। তাঁর আগে যাত্রার 'কম্পোজিশন' বলে কিছু ছিল না। সূর্যবাবু যাত্রায় আনলেন 'হোল ডায়মেনস্যানাল কম্পোজিশন'—'ডায়নামিক মুভমেন্ট কম্পোজিশন'। 'ডায় এ্যাকটিং' বা 'মাইম এ্যাকটিং'-ও যাত্রায় আনলেন সূর্যবাবু। মহীয়সী কৈকেয়ী' পালায় 'রাম বিদায়' অংশে দশ মিনিট ধরে নীরব থেকে আসরে অভিনয় করে গেছেন সকল শিল্পী। অনেক পরে থিয়েটার থেকে যাত্রায় এসে মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও এই রকম একটা দৃশ্য দেখিয়েছেন। এইভাবেই যাত্রা ক্রমশঃ আধুনিক রূপ নিতে নিতে বর্তমানের রূপ নিয়েছে।

পঞ্চাশের দশক থেকে এই আধুনিক থিয়েট্রিকাল যাত্রাই গ্রাম বাঙলাকে মাতিয়ে তুলেছে। থিয়েটারে নব-নাট্য আন্দোলনের জনক ভারতীয়

পদনাটা সংবৃত এই সময় যাত্রাতেও একটা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'রাহুমুক্ত' প্রযোজনা করে। অবশ্য পেশাদারী দল না হওয়ায় তার প্রভাব খুব একটা পরিলক্ষিত হয় নি। এই কালপর্বের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা ঘাটের দশকের গোড়ায় হল 'বাঙালি' যাত্রাভিনয়। এই অভিনয় স্পষ্টতঃই যাত্রাভিনয়কে একটি উন্নতমানে পৌঁছে দেয় এবং যাত্রা শিক্ষিত বাঙালির মনোযোগ আকর্ষণ করে। আজ যে যাত্রার দর্শক বা শ্রোতা ১ কোটিকেও ছাড়িয়ে গেছে তার সূচনা এই থেকেই।

কিন্তু যাত্রার নবজন্মের কথা বলতে গেলে শুরু করা উচিত ১৯৬১-তে কলকাতায় গোবরাড়িতে অনুষ্ঠিত পঞ্চকালীবাপি যাত্রাউৎসব থেকে। এই উৎসবের যাত্রার বিপুল সম্ভাবনার কথা স্পষ্ট করে আমার চোখে পড়ে এবং যাত্রার জনপ্রিয়তা ফুঙ্গে ওঠে। উৎসবের শেষে প্রযোজক অধিকারী মহাশয় আলোচনার আসর বসিয়ে যাত্রাকে নতুন করে ঢেলে সাজাবার প্রস্তাব করেন। পালা নির্বাচনে, মহড়াদলের পুনর্বিন্যাসে, প্রযোজনা, পরিকল্পনায় আধুনিক চিন্তা, ফিল্মের সিনেমার মতো চরিত্র সাজানো প্রভৃতি গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়। ১৯৬২-তে নবরঙ্গন অপেরার শিল্পীতে আমন্ত্রিত সকরে 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর সাফল্য যাত্রা-জগৎকে উৎসাহিত করে। এই ক্রান্তিকালের দুটি শ্রেষ্ঠ ফসল হল, 'সোনাইদীঘি' এবং 'মাইকেল'। নবরঙ্গনের শিল্পী সকরেও নায়িকা চরিত্রে ছল বিরেছিলেন পুরুষ অভিনেতা 'সতদল'। কিন্তু এই দুটিতে নায়িকারূপে খ্যাতিলাভ করল শ্রীমতী জ্যোৎস্না দত্ত। সোনাইদীঘিতে 'ভাবনাকান্দী' চরিত্রে দিলীপ চট্টোপাধ্যায় এবং 'মাইকেলে' নাম ভূমিকায় স্বপনকুমার খ্যাতির শিখরে ওঠে যাত্রাশিল্পের মনস্বী ও সর্বজন-মণ্ডিত বড় জনীবাবু, ছোট জনীবাবু এবং পরবর্তী কালের তোলা পাল (বড়), পঞ্চ সেন, মুক্তি পাঠক প্রভৃতির পাশেই নিজেদের স্থান করে নিলেন। কিন্তু সকল দিক দিয়েই একটি সম্পূর্ণ আধুনিক পালা উপস্থাপনার গৌরব শান্তিগোপালের ও তরুণ অপেরার। ১৯৬৭ সালে 'হিটলার' নিয়ে তাঁর অভ্যুদয়। সম্পূর্ণ নতুন যাদুর লন্ঠন হাতে নিয়ে লেখানো হয় পালা, প্রয়োগেও বৈচিত্র্য আনলেন অমর ঘোষ, 'এডিটিং' হয়, 'টেপ রেকর্ডারে' 'তোল' অংশ 'সিনক্রোনাইজ' করা হয়, আলো কোথায় 'ফোকাস' দেবে, কোথায় 'ফ্লাড' দেবে, 'এফেক্ট' আনবে কোথায়, কোথায় সৃষ্টি করবে 'ফ্লাডলিসেনস' সব নিখুঁতভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। 'টেপ' একটি ভয়াবহ যুদ্ধের অবস্থাকে শব্দে ধরা হয়, 'মিউজিক'কে করা হয় সম্পূর্ণ বিদেশী সংগীত নির্ভর। ফলশ্রুতি, আদব কায়দা পুরোপুরি নাৎসী জার্মানীর। নায়ক-ভূমিকায় শান্তিগোপালের অভিনয়ও এক নতুন দিকচিহ্ন বলে পরিগণিত হবার দাবি তুলে ধরে।

এরই পর পর আলোর চমৎকারিত্বে, টেপ রেকর্ডারের ব্যবহারে অভিনবত্ব আনেন নিউ প্রকাশ অপেরা তাঁদের 'রামকৃষ্ণ' পালায়, আসর থেকে 'চেয়ারের' অবসান ঘটিয়ে 'বক্স' বা 'বেদী'-র যে ব্যবহার 'মাইকেলে' শুরু হয়েছিল তা সর্বত্র প্রচলিত হয় শান্তিগোপালের পর থেকে। উৎপল দত্ত যাত্রার পরিচালকরূপে যোগ দিয়ে 'থিয়েট্রিকাল স্টাটিক কম্পোজিশন' থেকে শুরু করে অভিনয় ধারায় পুরো পুরি আধুনিকতার সঞ্চার ঘটিয়েছেন। এইভাবেই যাত্রা আজকের যাত্রায় এসে পৌঁছেছে। কিন্তু সত্যের প্রয়োজনে একথাও উল্লেখ করতে হবে যে এই আধুনিকতা একটা বিকারের ঘোরের মতো যাত্রাশিল্পকে গ্রাস করতে উদ্যত 'আলো', 'আবহ', 'টেপ', আর 'মাইক' যথেষ্ট বলে বিবেচিত না হয়ে যাত্রার আসরে 'ঘোড়া', 'উট', 'গরিলা' প্রভৃতির আমদানি ঘটানো হয়েছে। এবং এগুলি নিতান্তই বস্তু আঙ্গিকের দিকে লক্ষ্য রেখে। কোথাও 'মাউথপিস' একার সংলাপ বা ষড়যন্ত্র ইত্যাদির সংলাপকে চেঁচিয়ে বলার ধার থেকে অব্যাহতি দিয়েছে ঠিকই কিন্তু 'অতি-অভিনয়' আর 'লাউড-এ্যাকটিং' দূর করতে পারে নি। 'মাইকের' সামনে দাঁড়িয়ে আজও তারস্বরে চীৎকার করে চলেন অভিনেতা আর অভিনেত্রীরা। খল নায়ক তো বটেই অন্যান্যরাও কারণে অকারণে 'মাউথ পিসের' কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে এসে অট্টহাসি হেসে ওঠেন। আগেরই মতো ঘেমে ঘেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে (যাকে বলে 'পেট নেওয়া') এক কথা তিনবার বলে হাততালি কুড়িয়ে নিতে চান অনেক দু-তিন হাজারি অভিনেতা। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'ন্যাচারাল এ্যাকটিং' এর নামে সিনেমার অনুকরণে শ্বাসাঘাতরা সংলাপ উচ্চারণ, আর এক বিশেষ ঢংয়ে ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে কথাগুলি স্পষ্ট উচ্চারণ না করে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে যাওয়া। এ সবই ঘটছে যাত্রায় আধুনিকতার

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করুন

"ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে পশ্চিমবঙ্গের এক বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ও উৎকর্ষের জন্য আমরা গর্ববোধ করি। কিন্তু দেশের মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থ যেমন অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রগতিকে অবরুদ্ধ করতে চাইছেন, তেমনই সাংস্কৃতিক জগতকেও তাঁরা এক বিষাক্ত আবহাওয়ায় ভরিয়ে তুলতে চাইছেন। দেশের চিন্তাশীল নাগরিক মাত্রই সচেতন আছেন যে আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির সাহায্যে—যেমন চলচ্চিত্র, নাটক, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির মাধ্যমে—বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে কয়েকটি সাধারণ মঞ্চে নৃত্য প্রদর্শনের নামে যে কার্যাবলী সংগঠিত হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। খুন-জখম, অপরাধ প্রবণতা, অশ্লীলতা, বিকৃত মূল্যবোধ ও অবক্ষয়ের সুসংগঠিত প্রচার চলেছে। সমাজ-জীবনে এই বিকৃত সাংস্কৃতিক প্রচারের ফলাফল মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী—বিশেষ করে যুব সমাজের নৈতিক জীবনের ওপর

কোনো দায়িত্বশীল সরকার সাংস্কৃতিক জগতের এই বিষাক্ত আবহাওয়া সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না। আমরা পশ্চিমবাংলার শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে এবং এই রাজ্যের সচেতন গণতান্ত্রিক ও প্রগতিমুখী জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাই—আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করুন এবং সংস্কৃতির নামে এই সমাজবিরোধী প্রবণতাগুলিকে প্রতিহত করার জন্য উদ্যোগী হোন "

—মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন

ন. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) ১১৪১৭—আই পি আর/A

শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮৪

নামে। বলে রাখা ভালো এদের যাত্রায় হাতী, ঘোড়া, উট, পরিদা বা সম্পূর্ণ রঙীন ইত্যাদির কথা শোনা যায় নি। এটা সুস্থতার লক্ষণ। যদি গত বছরে এই নিয়ে যে-সব সমালোচনা করা হয়েছিল,—যার মধ্যে বর্তমান লেখকও একজন—তা এর কারণ হয় তা হলে তো আমারও।

কিন্তু এই সঙ্গেই একথাও বলা প্রয়োজন যে যাত্রার নিজস্ব অভিনয় ধারাটিও আজ লুপ্ত হবার মুখে। তার কারণও স্পষ্ট। ছোটো গ্রামবাজারী মঞ্চটাই প্রায় উঠে এসেছে যাত্রায়। মহেন্দ্র গুপ্ত, নিতীশ মুখার্জি, কমল মিত্র, বিশু ভাণ্ডারী, চন্দ্রশেখর দে, তাপু বন্দ্যোপাধ্যায়, অহর রায় থেকে শুরু করে নবনাট্য আন্দোলনের অসিত বসু, শ্যামল ঘোষ পর্যন্ত। মেহেদের মধ্যেও বেলা সরকার, আশু মণ্ডল, ফিরোজাবালা, কনকলতা প্রভৃতি থেকে শুরু করে ছন্দা চ্যাটার্জি, কল্যাণী ঘোষ, ললিতা চ্যাটার্জি, রুবী দত্ত, কেতকী দত্ত পর্যন্ত। পরিচালক হিসাবেও উৎপল দত্ত, জ্ঞানেশ মুখার্জি, অরুণ রায়, অসিত বসু, শৈলেন গুহ নিয়োগী, বীর সেন, শ্যামল ঘোষ, শেখর চ্যাটার্জি প্রভৃতি সকলেই এসে ভিড় জমিয়েছেন। সুধারোপেও মানবেন্দ্র, হেমন্ত, সন্ধ্যা, আরতি থেকে শুরু করে হেমাঙ্গ বিশ্বাস, রূপেন রাজবংশিকা পর্যন্ত সকলেই যাত্রার হাজির। এক দিক দিয়ে এ-সবই সুস্থ লক্ষণ। নিশ্চয়ই এতে মান উন্নয়নে সাহায্য হবে, কিন্তু কার মান? যাত্রার? না, থিয়েটারের? হৈমবতী গুঞ্জার কণ্ঠে ধনাবতার স্তোত্রের গান গত বছর যাত্রার 'জয়দেব' পালায় যাঁরা টেপে শুনেছেন তাঁরা আমার উক্তির তাৎপর্য বুঝতে পারবেন সহজেই, বিশেষত তাঁরা, যাঁরা আগেকার যাত্রার 'জয়দেব' পালায় বিনোদ ঘাড়া বা প্রবোধ ধাড়ার উদাত্ত কণ্ঠে ঐ গান শুনেছেন। তেমনি থিয়েটার-থেকে-আসা এই সব অভিনেতা অভিনেত্রীরা দু-একজন ছাড়া কী সফল হয়েছেন যাত্রায়? টাকার অঙ্কে বা খ্যাতির বিচারে যাত্রায় যাঁরা সর্বোচ্চে এঁরা কী কেউ তাঁদের সমান খ্যাতি বা স্বীকৃতি পেয়েছেন? এ-কথা ঠিকই যে যাত্রাপালায় বেশ কিছু অভিনবত্ব এসেছে। সম্প্রতি অনেকগুলি ভালো এবং নূতন ধরনের যাত্রাপালা অভিনীত হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত 'বাঙ্গালি' বা 'সোনাই-দীঘির' পরে 'একটি পয়সা', 'পদধ্বনি', 'রাইফেল', 'হো-চি-মিন', 'বিপ্লবী ভিয়েতনাম', 'রাহুমুক্ত রাশিয়া', 'ঋষি', 'সপ্তপদী', 'নটী বিনোদিনী', 'বিদ্যাসাগর', 'একদিন রাত্রে', 'লায়লামজনু', 'ওথেলো', 'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'হ্যামলেট' প্রভৃতি অনেকগুলি ভালো যাত্রাপালা ইদানীং শোনা গেছে। শান্তিগোপাল ও তাঁর তরুণ অপেরার তো প্রায় সবগুলিই ইতিহাস সৃষ্টিকারী। সেই 'হিটলার', 'লেনিন' থেকে শুরু করে 'কার্ল মার্কস', 'স্পার্টাকাস', এবং একেবারে সাম্প্রতিক 'রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা' পর্যন্ত তাঁর প্রত্যেকটা বই-ই সুন্দর। কিন্তু বাকি বইগুলি সম্বন্ধে কী বলা যাবে? সেনাধারী মঞ্চের 'বারবধূ', 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'বিষ', 'বাস্তিচার', 'রক্তনদীর ধারা', 'চৌরঙ্গী', 'আসামী হাজির', 'পরস্ত্রী' প্রভৃতির অনুকরণে ক্যাবারে নাচ ও নাইট ক্লাবের অশ্লীলতাযুক্ত বইগুলি কী যাত্রার ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করছে। 'সোনে'-র বাঙলা সংস্করণ 'আগুন' নামে যাত্রার মাত করতে পারে, কিন্তু তা কী লোকশিক্ষার বাহন হবে? চারটি দৃশ্যক ধরে যাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত শতাধিক যাত্রা-পালার রচয়িতা ব্রজেন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের একটি উক্তি এ-বিষয়ে খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। অপরিসীম ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে ব্রজেন্দ্র দে মহাশয় বলেছেন: "বলতে আমার লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে। এখনকার যাত্রা হচ্ছে খিস্তি, খেউড়, আর নগ্ন নৃত্যের আখড়া। মহানন্দে নায়িকার পোশাক আসরেই ষোল সতেরো বার ঘোলানো হচ্ছে। নায়িকার সম্বন্ধে পালাকার লিখছেন, 'যথাসম্ভব বস্ত্রহীন'। বিজ্ঞাপন পড়ছে, 'আসরে ধর্ষণ' আলো-আঁধারিতে পোশাক পাল্টানো। কিছু কিছু পালায় আবার বিপ্লবী (?) চরিত্র আসরে এসে পাশা পাশা খিস্তি দিচ্ছে, যার মধ্যে শুয়োরের বাচ্চা অজস্রবার। আমাদের কর্তব্য যে লোকশিক্ষা তা ভুলে গেছেন এঁরা"। ব্রজেনবাবুর এই আক্ষেপ একটি সৎ মনের অভিব্যক্তি। কারণ এই সব জিনিস থিয়েটারে তত্তো আশা করতে পারে না যতো পারে যাত্রায়। যেহেতু যাকে 'জন' বলা হয় যাত্রার প্রধান আবেদন সেই গ্রাম্য জনসমষ্টির কাছে। যাত্রার আসরে শুধু বড়রাই নয় কিশোর-কিশোরী থেকে বালকবালিকারা পর্যন্ত বসে বসে পালা দেখে। লোকনাট্যের আসর তুলে কচি ছেলেদের মনকে বিষিয়ে দেওয়া সামাজিক অপরাধ। তাছাড়া মনে রাখতে হবে ১৩০০ রজনী চলাতেও 'বারবধূ' রুচি বিকৃত করতে পারে

বড় জোর তিন লক্ষ নব্বই হাজার লোকের। কিন্তু বছরে ৭।৮ মাস চলে যাত্রার দলগুলি মিলে ক্ষতি করতে পারে কোটিরও বেশি মানুষের। তাই সাবধানতা ও দায়িত্ববোধ আরো বেশি করে প্রয়োজন।

অথচ ঘটছে তার বিপরীত। অন্ততঃ ঘটানোর চেষ্টা হচ্ছে। এ-ব্যাপারে 'বিজ্ঞ-প্রেস' বা বাজারী পত্রিকার ভূমিকা খুবই লক্ষণীয়। বিজ্ঞাপনে আর প্রচারে, 'যেখানে যাত্রা সেখানে যুগান্তর', এই সব বলে ভুলিয়ে ভাঁপিয়ে যাত্রাকে তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করেই একটি 'গণ-বিনোদিনী' তৈরি করা হচ্ছে। বাজারী কাগজের পাতা ওল্টালেই দেখা যাবে যাত্রাদলগুলির বিরাট বিরাট বিজ্ঞাপনের পাশে থিয়েটারের বিজ্ঞাপনগুলি যেন ধনীর দুয়ারে কাঙালিনী মেয়ের মতো, "ম্লান মুখ বিষাদে বিরস"। বিজ্ঞাপনগুলির ভাষা ও রুচিবোধও লক্ষণীয়। গত বছর রাজধানী যাত্রা ইউনিটের বিজ্ঞাপনে দেখেছি "মহান স্বাধীনতা দিবসের বলিষ্ঠ ঘোষণা চিত্রাভিনেত্রী গ্লোহট নায়িকা সুনীপা বানার্জি"। চৌরঙ্গী অপেরা বিজ্ঞাপনে তাঁদের নায়িকার বিশ্লেষণ দিয়েছেন, "চিত্রের চিত্রাণী মঞ্চের মঞ্চিরাণী মধু মুখার্জি"। নিউ প্রভাস অপেরা নিজেকে বললেন "প্রগতির অগ্রদূত", লিখলেন "প্রগতির অগ্রদূত" নিউ প্রভাস অপেরার চ্যালেঞ্জ চিত্র মঞ্চ ও বেতারের চন্দ্রশেখর দে ও সমীর লাহিড়ী। শিল্পীতীর্থ বললেন, "যাত্রার আসরে অম্লান হয়ে থাকবে শিল্পীতীর্থ" তাঁদের বইয়ের বিজ্ঞাপ্তি হল "সবার আরাধ্যা দেবী সন্তোষী মা", আর নায়িকা হলেন "ভারত-শ্রেষ্ঠা জ্যোৎস্না দত্ত"। গণনাট্য নিজেকে "প্রতিজ্ঞাত প্রতিষ্ঠান" বলে বিজ্ঞাপিত করতে ভালবাসেন, তাঁদের "সমাজের সবুজ অংসকারী ওয়াল পরপালে" আছেন "ভারতশ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব ৯টমূর্ত দিলীপ চ্যাটার্জি"। অন্যদিকে যাত্রা ইউনিটের নায়ক নটসূর্য হয়তো নয়, কিন্তু কমও নন, তিনি "নটসম্রাট দিলীপ কুমার" সম্প্রতি তিনিও ভারতশ্রেষ্ঠ বলে বিজ্ঞাপিত। "কিন্নরকণ্ঠী"-র দায়িত্বে দু-জন, সান্যাল বোস এবং কনকলতা। শক্তি ভট্টাচার্য হলেন "বাণীবিনোদ", পান্না চক্রবর্তী হলেন "মাতাকণ্ঠ"। তপন কুমার হলেন "মহানায়ক", তপন কুমার হলেন "নট সম্রাট"। শিখা বোস "মন ভরানো নাচে গানে", নির্মল মুখার্জি তো "যাত্রার শরৎচন্দ্র"। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যাত্রার দলের ছবি তুলেই অমর কীর্তি অর্জনের গুরু ঘোষণার কথা: "ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে মধু ঘোষের অমর কীর্তি পৃথিবীর এই প্রথম"। এই বিজ্ঞাপন "সরলা মজুমদার" সম্পর্কে। নায়িকা ছন্দাকে এঁরা "মর্তের উর্বশী" বলে প্রচার করতে ভালবাসেন। এইরকম অসংখ্য উদাহরণ খবরের কাগজের পাতায় খুঁজলেই পাওয়া যায়। যাত্রাদলগুলিরই উচিত এ-বিষয়ে সচেতন দৃষ্টিপাত করা। নিজেদের দলের অতি-সাধারণ অভিনেতা অভিনেত্রীদের সম্পর্কে নির্বিচার শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্লেষণ রুচির বিকারেরই লক্ষণ। নিজেরা নিজেদেরকে 'ভারতশ্রেষ্ঠ' 'ভারতশ্রেষ্ঠা' এ সব বলা রুচিহীন। তাছাড়া 'বাণীবিনোদ', 'মাতাকণ্ঠ', এ-সব শব্দের অর্থ কী? যে-কোনো নায়িকাকে 'উর্বশী' বলা কী শোভন, 'গ্লোহট নায়িকা' বলা কী মহিলাকে প্রশংসা না অপমান! অথচ বিশ পঞ্চাশ হাজারী বাজারী কাগজে এই সব ভুলে-ভরা, রুচিহীন, বিকৃত বিজ্ঞাপনের ভিড়ে আর কিছু চোখে পড়াই দুষ্কিল। এইসবের মধ্যে দিয়ে মোটা টাকার প্রাপ্তিযোগ ঘটে থাকে বলেই মাঝে মাঝে আনন্দবাজার, যুগান্তর প্রভৃতি কাগজ খুলে সন্দেহ হয় পৃথিবীতে ঐদিন যাত্রা ছাড়া বুঝি আর কোন কিছুই ঘটে নি, ঘটছে না, বা ঘটবে না। যেন 'যাত্রা'-ই শুধু আছে, আর সব মায়া। এবং এই সব কিছু করা হচ্ছে যাত্রার উন্নতি ও প্রসারের নামে, গণশিল্প প্রসারের নামে। সাধারণ মানুষের কাছে সংস্কৃতিকে পৌঁছে দেবার নামে। এই কারণেই এই সমস্ত কাগজে যাত্রার সত্যকার সমালোচনাও হয় না। বিজ্ঞাপনের প্রাপ্তিতে ঘাটতি পড়ার আশঙ্কা। এই সব সমালোচনা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন সমালোচক মহাশয় যেদিন যে দলের যে পালা নিয়ে আলোচনা করছেন সেদিন তাঁর লেখা পড়লে এই কথাটিই মনে হবে এই দল সর্বশ্রেষ্ঠ দল, এই পালা সর্বশ্রেষ্ঠ পালা, এই পরিচালক সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক, এবং এই অভিনেতা অভিনেত্রীরা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠা। এরই নাম কী সমালোচনা? এই সমালোচনা কী মান উন্নয়নের সহায়ক? এই প্রসঙ্গে আরো যা মনে রাখা দরকার তা হল এই সব পত্রিকার পাঠকগোষ্ঠীও মিশ্র। তাদের মধ্যে গৃহিণী ও কবি, কেরানী ও মালিক, বারবনিতা ও বিরহী যুবক সবই আছে। তাদের সবাইকার রুচি ও চাহিদার কথাও তাই এই সব

কাগজকে ভাবতে হয়। ফলে কী হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে, আর তা যে খুব ভালো হচ্ছে এইটে জানানোই এদের কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এরই মধ্যে নিহিত এদের ব্যবসায়িক সাফল্য। তাই দীর্ঘমেয়াদী কোনো মূল্যবোধ নিয়ে সমালোচনা এদের পক্ষে অসম্ভব। তা সম্ভব একমাত্র কৃত্তিবাস সাপ্তাহিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকায়। হ্যাজলিট, বার্নার্ড শ, আর্চার প্রভৃতিরাও 'স্যানডে প্রেসে'-র সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন "ডিল প্রেসে"-র সঙ্গে নয়। অবশ্যই সমালোচনাকেও পার্টিসিপেল হতে হবে। নিন্দা বা প্রশংসা নয়, বিশ্লেষণ বা বিচার। সকলের জন্য না হলেও রসগ্রাহীদের জন্য। তবেই যাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব অন্যথায় হিস্টিরিয়া সৃষ্টি করা যেতে পারে, হিস্ট্রি নয়।

এই সব কথা বললে যাত্রাদলগুলি-থেকেও প্রতিবাদ ওঠে। বলা হয় যাত্রার জনপ্রিয়তা বেড়েছে তাহলে কী করে? কী করে বেড়েছে যাত্রার দর্শক সংখ্যা। সে তো এই বিজ্ঞাপন, এই প্রচার আর এই আধুনিকীকরণের ফলেই! সুতরাং এই বিষয়ে একটু গভীরভাবে ভাবা দরকার। যাত্রা-দলের কর্তৃপক্ষদেরই ভাবা প্রয়োজন সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও থেকে নায়ক নায়িকা নিয়ে এসে যখন তাঁরা তাঁদের নামের পাশে 'চিত্র, মঞ্চ ও বেতার' বলে বিজ্ঞাপন দেন তখন কী এই কথাই পরোক্ষে মেনে নেন না যে যাত্রার চেয়ে তাঁরা শ্রেষ্ঠ শুধু ঐ চিত্র, মঞ্চ ও বেতারে অভিনয় করেছেন বলেই! তা না হলে কেনই বা মোটা টাকা দিয়ে তাঁদের আনবেন, কেনই বা ঐভাবে বিজ্ঞাপন দেবেন? সুতরাং দর্শক বাড়লো কার? অবশ্য এ-কথা তর্কাতীত যে থাটকের দর্শক সংখ্যা বেড়েছে। তা, সে যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা, যা-ই হোক না কেন। গত তিরিশ বছরে এক কলকাতা শহরেই দর্শক আসন সহ রঙ্গমঞ্চের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে হয়েছে ৫০টি, আর আসন সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সংখ্যা আরো বাড়বে। সুতরাং এই দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি দেখে উৎফুল্ল, অপকর্ম বিচার করা সম্ভব নয়। শ্রীরঙ্গমে স্বয়ং শিশিরকুমারের নাটক কয় রাত্রি চলেছে আর বিশ্বরূপায় 'আগামী হাজির' বা 'পরদেশী' কয় রাত্রি চলেছে এতো চোখের সামনেই দেখেছি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভূমিসংস্কার ও কৃষিসংস্কার (তা যতো অসম্পূর্ণই হোক না কেন) গ্রামের উদ্বাস্তু-ধনী যে এক কৃষকশ্রেণী সৃষ্টি করেছে, তারা সবাই আজ যাত্রার দর্শক বাড়িয়েছে। যোগাযোগের উন্নতি ও নতুন নতুন রাস্তাঘাট ইত্যাদির ফলে যাত্রা আজ দূর দূরান্তরে পৌঁছাচ্ছে, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'চ্যারিটি শো'র ব্যবস্থা, এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে যাত্রা-শিল্পের প্রতি সরকারের মনোযোগ ও দাক্ষিণ্য। যাত্রার শ্রোতা বৃদ্ধি এইসবের ও আরো অনেক কিছুর মোট ফল। সুতরাং যাত্রার প্রসার ঘটছে বলে যাত্রার সব ভালো এই জাতীয় আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নেই, বরং শ্রোতাবৃদ্ধিজনিত দায়িত্বভারের কথাই বেশি করে ভাবা উচিত। মনে রাখা ভালো দুধের চেয়ে তাড়ি সব সময়েই জনপ্রিয়। কারণ দুধকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেধে বিক্রি করতে হয়, আর তাঁড়ি দোকানে বসেই রহানন্দে তাড়ি বিক্রয় করে। পৃথিবীর নাট্য ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রজনী চলার খ্যাতি আগাথা ক্রিস্টির 'মাউস ট্র্যাপ' নাটকের কিন্তু তাই বলে সেক্সপীয়র, ইবসেন, শ্রেখ্‌টে প্রভৃতির চেয়ে তাঁর নাটক শ্রেষ্ঠও নয়, তিনি তাঁদের চেয়ে বড় নাট্যকারও নন। 'মাউস ট্র্যাপ'-এ অভিনয় করে যশ হয় নি কেউ, সেক্সপীয়র অমর করেছেন অসংখ্য অভিনেতাকে। "দেহদর্শন কী অপরাধ" বলে বিজ্ঞাপন দিয়ে 'বারবধূ' ১৬০০ রজনীর পথে এগিয়ে যেতে পারে, কারণ তার 'প্রতিটি দৃশ্যই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য', কিন্তু তাই বলে তা ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক, এমন কথা কেউ-ই বলবেন না, বা অসীম-কেতকীকে ভারতশ্রেষ্ঠ, ভারতশ্রেষ্ঠা বলে কেউ মনেও করেন না। 'ভালোমানুষ' যা চলেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি চলেছে 'আগামী হাজির' বা 'পরদেশী' সে কী এই জন্যে যে শ্রেখ্‌টের নাটকের চেয়ে এই সব নাটক শ্রেষ্ঠ বা অজিতেশ, কল্পপ্রসাদ কেয়া'-র চেয়ে এঁরা অনেক বড় অভিনেতা অভিনেত্রী? 'রক্তকরবী' কী 'বিষ' বা 'বাস্তিচার'-এর চেয়ে বেশি চলবে? তাহলে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কী এই সব নাটক শ্রেষ্ঠ? না, শম্ভু মিত্রের চেয়ে এই সব অভিনেতা অভিনেত্রী বড়? সুতরাং চলছে কোন যুক্তি নয়।

তাছাড়া যাত্রাই কী আগে চলে নি? মতি রায়ের যাত্রা চলে নি গিরিশচন্দ্রের থিয়েটারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে? গানে এবং অভিনয়ে হাজার হাজার মানুষকে উদ্দীপ্ত করে নি মুকুন্দ দাসের যাত্রা? চলে নি বড় ফণীবাবু, ছোট ফণীবাবু, পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু সেন প্রভৃতির অভিনয়সমৃদ্ধ অসংখ্য যাত্রা পালা? ৭।৮।১০ হাজার লোকের বারোয়ারি যাত্রার আসর তাঁদের

সত্তরের দশক
সাক্ষরতার দশক

জ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে সাক্ষরতা প্রকাশনের সাহসী উদ্যম

বিশ্বকোষ

২০ খণ্ডে সমাপ্য। মোট মূল্য : ৩১০ টাকা। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত।

আদ্যোপান্ত পরাশর

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র সৃষ্ট চরিত্র পরাশরকে নিয়ে লেখা উপন্যাস ও গল্পের একটি সংকলন।

১ খণ্ডে সম্পূর্ণ। দাম : ১৫ টাকা। প্রকাশিত

সুকুমার রচনাসংগ্রহ

দু-খণ্ডে সম্পূর্ণ। দাম : ২০ টাকা। দুটি খণ্ডই প্রকাশিত।

উপেন্দ্র রচনাসংগ্রহ

দ্বিতীয় সংস্করণের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

দাম : ২০ টাকা। দু-খণ্ডে সম্পূর্ণ।

শিবরাম রচনাবলী

৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ। দাম : ৫০ টাকা।

১০ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

শ্রীভগবদ্‌গীতা

৩রা অক্টোবর প্রকাশিত হবে। ১ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

গ্রাহক মূল্য : ৫ টাকা।

বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ

মোট মূল্য তিন খণ্ডে ৩৬ টাকা। প্রবন্ধ খণ্ড প্রথম অংশ ও উপন্যাস খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে।

শেষ সংস্করণের গ্রাহক করা হচ্ছে।

বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ

তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। দাম : ৩০ টাকা।

গ্রাহক চাঁদা ৬ টাকা।

সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে। দাম : ১৫ টাকা।

বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ

সাংবাদিক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় রচিত

১ খণ্ডে সম্পূর্ণ। দাম : ১২ টাকা।

নবজ্ঞান ভারতী

দেশিকোত্তম প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।

দু-খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য : ১৮ টাকা। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস

পনেরোই আগস্ট

১ খণ্ডে সম্পূর্ণ। দাম : ১৩ টাকা।

শেষ সংস্করণের গ্রাহক করা হচ্ছে

মহাভারত

৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ। দাম : ৭৫ টাকা।

একত্রে জমা দিলে ৬০ টাকা।

রামায়ণ

কৃত্তিবাস রচিত। ১ খণ্ডে সম্পূর্ণ। দাম : ১৫ টাকা।

কাশীরাম দাশ রচিত

মহাভারত

২ খণ্ডে সম্পূর্ণ। দাম : ২৫ টাকা।

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত।

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি

৬০ নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

অভিনয়ে, বিনোদ ঘাড়া, প্রবোধ ঘাড়া প্রভৃতির গানে জমে ওঠে নি? কী ছিল সেই যাত্রায়? ছেলে-ভোলানো জমকজমক নয়, লাল নীল আলোর চোখ ধাঁধানো মায়া নয়, দৃশ্যপট নয়, নয় এমন কি মাইক-ও। এক কথায় 'নকল নাটোর নৈপুণ্য' বলতে যা বোঝায় তার কিছুই নয়। তবুও যাত্রার আসরে চারপাশে সমবেত ৪।১০ হাজার লোকের মাঝখানে হাজার বাতি পোটাকেরোসিন পেট্রো-ম্যাক্সের তলায় দুর্যোধনকে দেখে আর তার ভাঙা গৈরিশি ছন্দে রচিত সংলাপ শুনে মনে হয়েছে যেন বৈশায়নের হ্রদে অন্ধকারে বসে ছটপট করছে এক অভিমানী মানবাত্মা। কল্পনাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন হয় কাব্যের। মনে পড়ছে রজেন দে'র 'উপেক্ষিতা' পালায় ছোট ঠাকুরঝির ভাই। পরশুরাম তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করছেন যখন সেই দৃশ্যে এক হাত উঁচু লাফিয়ে লাফিয়ে মঞ্চের চার পাশে ঘুরে ঘুরে তাঁর সেই উল্লাস। আমি যখন দেখেছি তখন তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি ঐ বয়সের একজন ভদ্র-লোককে ঐভাবে লাফাতে দেখলে হাসি পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সব হাসি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই অবিস্মরণীয় অভিনয় দেখে। ক্ষত্রিয়ের রণোল্লাস আর অদম্য রণপিপাসা মূর্ত হয়ে উঠেছিল সেই মহান অভিনয়ে। মুহূর্তে মনে পড়ে গিয়েছিল রঘুবীরের রঘুবার রূপান্তরের দৃশ্যে শিশির-কুমারের কথা। তাঁরও বয়স তখন ষাট। দু-পাশে মশাল ধরে, কানবালা দিয়ে সেই প্রখর নাক দেখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল এক দেবীপ্রতিমার উৎসব পরিবৃত্ত থেকে আমার সমস্ত সত্তাকে উদ্ধার নিয়ে চলেছে মহান ভবিতব্যের সঙ্গে আমাকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবার জন্য —পিছনে পড়ে রইল আমার সমস্ত তুচ্ছতা আর ক্ষুদ্রতা, 'দিন যাপনের আর প্রাণ ধারণের গ্লানি'। এ প্রকাশ হবে কোন মাইকে? কোন মঞ্চসজ্জায়? কোন অমন দৃশ্যপটে? এ হতে পারে একদমই কাব্যে, নাটকের কাব্যে, বা জীবনের কাব্যেও বটে। এই কাব্যের অভাবেই বাঙলা নাটক আজ মরতে বসেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল বলতেন, "নাটক, কাব্য ও উপন্যাসের মাঝামাঝি, তাতে কবিত্ব চাই, গল্পের মনোহারিত্ব চাই। কবিত্ব নাটকের একটি অঙ্গ। তা উপন্যাসে না থাকলেও চলে।" আর, এ কাব্য আরও গভীর, আরও সঙ্কট। কবিতার মতো দুটো মনের কারবার নয় নাটক। এখানে যতোগুলো চরিত্র ততোগুলো মন। তার ওপর আছে দর্শক। এই সমস্ত মনের সমস্ত আবেগ, সমস্ত বেদনা যে কাব্যে প্রকাশ পায় তাই নাটক। তাই আজও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই আমাদের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, শিশির কুমার, শম্ভু মিত্রই আমাদের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।

এই বাঙলা অভিনয় বেঁচে ছিল একমাত্র যাত্রায়। কিন্তু আজ সিনেমা ও আধুনিক থিয়েটারের হাঁ-করা মুখের বিবরে যাত্রার অভিনয় রিং মাস্টারের মতো বার বার মুখ ঢুকিয়ে আর বের করে বীরত্বের খেলা দেখাচ্ছে। অথচ থিয়েটারের সঙ্গে যাত্রার মিল কিন্তু থাকার কথা নয়। একটি একদমী অন্যটি লোকায়ত। একটি মার্গীয়, অন্যটি গ্রামীণ। তাই থিয়েটারের আদর্শে অন্ধ আবেগ-প্লাবিত কন্যাদিয়াল কার্যকলাপ যাত্রাকে পঙ্গু করেছে, অভিনয়ের ভারতীয় ধারাকে লুপ্ত করেছে। কারণ আর তো কোথাও এখন অভিনয় পদ্ধতি নেই যা অন্য দেশের পদ্ধতি থেকে পৃথক, অর্থাৎ একান্তভাবে ভারতীয় বা বাঙালি। যেমন 'নো', 'কাবুকী' প্রভৃতি। 'তরজ' বা 'কথাকলি' ছাড়া নেই।

মনে রাখতে হবে বাঙলার অভিনয় পদ্ধতি 'কথকতার' বংশধর। তাই কথা কইতে কইতে গান গেয়ে ওঠা ছিল এখানকার যাত্রার নিয়ম। সেই সব গান ব্যাখ্যা অথবা নীতি প্রচার। যাত্রাই আসলে ছিল নীতি প্রচারের গান। তাই এখানে রাজা, রাণী, মন্ত্রী, সেনাপতি, যুবরাজ, রাজকন্যা সবাই আসরে এসে নিজের নিজের কাজের সমর্থনে যুক্তি ও সারবত্তা প্রকাশ করার ও প্রমাণের চেষ্টা করে। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক-ই ধরুন (নিঃসন্দেহে এটি আমাদের শ্রেষ্ঠতম যাত্রা পালা)। এখানে পুরোহিত রঘুপতি দেবীর নামে মিথ্যাচরণ করছে এবং তার সমর্থনে তত্ত্ব কথা বলেই চলেছে। এই তত্ত্ব-কথা, তর্ক ও আলোচনা সবই বুদ্ধিমার্গের। দৈনন্দিন জীবনে যে-সব বিভিন্ন মানুষ ও মতবাদ দেখা যেত সেই সব তর্কের ক্ষেত্র ছিল এই অভিনয় শিল্প। তাই অত্যন্ত পুরানো, জানা, একঘেয়ে গল্প হওয়া সত্ত্বেও গ্রামের নিরক্ষর মানুষ সেই সব যাত্রাপালা উৎকর্ণ হয়ে শুনত, আনন্দ পেত; গুরুগম্ভীর অভিব্যক্তির অথবা গৈরিশিছন্দ তাতে বাধা হোত না। তাই দৃশ্যপট বা অন্য কোন সরঞ্জামের সাহায্য না নিয়েও নিছক অভিনয়ের ও তার

অন্তর্নিহিত কাব্যের দ্বারা এই সব ভাবপ্রকাশ করা সম্ভব হোত এই ঐতিহ্য একান্তভাবে ভারতীয়। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে বলা হোত "রাজা রথারোহণং নটয়তি"। রথেরও প্রয়োজন হোত না, ঘোড়ারও প্রয়োজন হোত না শুধুমাত্র 'নটয়তি' করেই রাজার রথারোহণ বোঝানো হোত। এখনো চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে এই অভিনয় ধারা লক্ষ্য করা যায়। এই সেদিনও এ্যাকাডেমি মঞ্চে বহুরূপীর 'টেরোড্যাকটিল' অভিনয়ের সঙ্গে পুরানো দিনের সেই "বিভাব" নাটকটি পুনরায় মঞ্চস্থ করে শম্ভু মিত্র এই অভিনয় ধারার বিপুল বিরাট সম্ভাবনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রচলিত এই অভিনয় ধারার সঙ্গে বন্ধন আজ ছিন্ন করার চেষ্টা চলেছে আসরে হাতি, ঘোড়া, উট প্রভৃতি আমদানি করে।

তেমনই গান। আধুনিকতার নামে গান তার স্থান হারিয়েছে, হারিয়েছে তার মর্যাদা। অথচ আমাদের ঐতিহ্য আছে আমাদের একান্তভাবে নিজস্ব দশপদ কীর্তন গানের। এই গানে প্রবল ভাবের মুহূর্তে গায়ক গানের কাঠামো ভেঙে 'আখরের' মধ্যে বিস্তার লাভ করেন। যাত্রাতেই তাই। প্রবল ভাবের মুহূর্তে অভিনয় গানে বিস্তৃত হোত। আনা হোত 'বিবেক' বা 'নির্বাতি' বা এই ধরনের কোন চরিত্র। প্রবল ভাবের বা বিপুল আবেগের শিখরে গত বা পদ হঠাৎ লাফ দিয়ে গানের মধ্যে কেটে পড়ছে এটি তুচ্ছ কথা? প্রত্যেক মহৎ নাটকে ও জিনিস আছে। রবীন্দ্রনাথে আছে, দেবদীপ্তরে আছে। যে 'লীজর' সমস্ত নাটকে ইংরেজীতে কথা বলছে মরবার আগের মুহূর্তের চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতায় সে চীৎকার করে উঠেছে "এট্ টু জ্রুটে"। এই লাফের প্রয়োজন হয় মহৎ কাব্যের ছোতনায়। মহৎ অভিনেতাই পারে একে অর্থবহ করে তুলতে। শুধু কী তাই? বাঙলা দেশের যাত্রায় এবং যাত্রাভ থিয়েটারে কর্ণের সঙ্গে নির্বাতি এসে কথা কয়ে যায়, রাজা বা শক্তিমদমত্ত কেউ অন্যায় করতে চাইলে 'বিবেক' এসে তাকে গান গেয়ে সাবধান করে যায়, নাদির শাহ দিল্লী ধ্বংস করলে লাল শাড়ি পরা আলুলায়িত কুন্তলা ভারত মাতা মৃত সন্তানের শোকে উন্মাদিনীর মতো কাঁদতে কাঁদতে তাকে অভিশাপ দিয়ে যায়। লৌকিক ও অলৌকিকের সংমিশ্রণের এই বৈশিষ্ট্য আধুনিক যুগের কোনো নাটকে নেই। এর ফলে নাটক প্রতীকী-ও হয় না, ফান্টাসি-ও হয় না, বরং সাধারণ গ্রামবাসীর খুব বাস্তবপ্রতিম সংলাপ থেকে প্রতীকী গভীরতা পর্যন্ত এর সহজ বিস্তার থাকে। একেই কডওয়েল বলেছেন জাতির অবচেতন স্তরে আবেদন পৌঁছানো। কারণ বহু যুগযুগান্তর ধরে যে শিল্পপদ্ধতি আমাদের পিতৃ-পুরুষের ভাব প্রকাশ করে আসছে তার প্রভাব আমাদের রক্তের মধ্যে থাকতে বাধ্য।

যাত্রার আসল জোর এইখানে। গ্রামের নিরক্ষর মানুষকে তাই যাত্রা টানে। থিয়েটার সিনেমার তুলনায় গ্রামে যাত্রার লোকসমাগম এই কথাই প্রমাণ করে। এই সব কিছুই আমরা হারাতে বসেছি। যারা যাত্রা বন্ধে অবিরত প্রচারে গণ হিস্টিরিয়া তৈরি হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু হিস্টিরিয়ার জোর আসল জোর নয়। এইভাবে চললে হিস্টিরিয়ার পরে যে ক্লান্তি তা দেখা দিতে বাধ্য। এবং তার ফলে অনিবার্য এই লোকসংস্কৃতিও অনুকরণের বন্ধ জলায় পড়ে শেষ হয়ে যাবে অদূর ভবিষ্যতে, যারা যাবে বাঙলার নিজস্ব অভিনয় পদ্ধতি আর লোক-শিক্ষার পক্ষপাতী। সেইজন্য এখন চাই তত্ত্বের আলোচনা। মন যুগিয়ে চলা নয়, মনন তৈরি করাই সমালোচকের কাজ। মন যুগিয়ে চলে তো মোসাহেবের বা ভাঁড়। এই ভাঁড়ের আবরণ খুলে ফেলে যাত্রার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং যাত্রাভিনয়ের নিজস্ব ধারাকে যুগ ও সমাজচেতনার সঙ্গে মিলিয়ে বিকশিত করতে পারলেই যাত্রার মুক্তি, অন্যথায় মাকের কিছুদিনের দাপাদাপি পরেও তার জন্য অপেক্ষা করে আছে বদ্ধ জলার মধ্যে করুণ মৃত্যু। এমনি করেই মরেছিল একদিন পেশাদারি থিয়েটার, আজও যা ক্যাবারে নাচ আর অশ্লীল কণ্ঠব্যায়ামের মাঝে বৃথা মাথা খুঁটে মরছে শ্যামবাজারী মঞ্চে 'বারবধূ' নিয়ে 'বিবরে'র মাঝখানে।

সকল যাত্রামোদী, যাত্রানুরাগী, এবং লোকসংস্কৃতি প্রেমীরা এখনও সচেতন হবেন পরিশেষে এই আশা ব্যক্ত করছি, কারণ যাত্রাশিল্পের সম্ভাবনা বিপুল। তার প্রভাবও সুনিশ্চিত।

■

বিবাহবার্ষিকী

(২৪ পৃষ্ঠার পর)

রাত্তিরে আপনি এসে লাইন দিয়েছেন, মণি এসেছে, আমি এসেছি—সে কি এইজন্য ?'

ক্ষুব্ধ স্বরে কনক বলল—'কি সাংঘাতিক ব্যাপার দেখুন ! পায়ের ব্যথার জন্য ক্যালশিলপিরিন ট্যাবলেট দিলেন—একবার জিজ্ঞেসও করলেন না। অথচ ওর প্যাসট্রিক ট্যাবলেট—একটা ট্যাবলেট পেটে পড়লে আর দেখতে হবে না। তাছাড়া হার্টও দুর্বল। আমরা জানি তাই।'

—'স্পেশিয়ালাইজেশন, বুঝলে কনক। ওই বুড়োর ব্যাপারটা দেখলে না? ডাক্তার সেন পরিষ্কার বলে দিলেন: হাড়ের অসুখ ছাড়া আর কিছু শুনবেন না ওঁর মাথার চিকিৎসাটা কোথায় হবে ?'

—'কেন ? কাল সকালে মেডিক্স নিউরোলজিতে লাইন দেবেন। চোখের জন্য পরশু···'

মণিমোহন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'দুর্ভাগ্য, সত্যিই দুর্ভাগ্য। ঘরের পাশেকেশন থাকে, মানুষের মনুষ্যত্ব। থানা হাসপাতাল অফিস আদালত···সর্বত্র দেখবে না-হয় না-মানুষ এক বিচিত্র ব্যাপার।'

—'যদি না তোমার টাকা অথবা মুরুব্বির জোর থাকে। বুঝলেন কনক, আজ সত্যিই মনুর জন্য আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কেন, কেন তুই টাকা রোজগার করিস নি ? কেন, কেন তুই মন্ত্রী এম. এল. এ. ধরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবি না ?'

কনক অবরুদ্ধ স্বরে বলল—'থাক অমিয়। আপনিও যদি এ-অভিযোগ করেন, তাহলে ও দাঁড়াবে কোথায় ?'

চমকে অমিয় কনকের মুখের দিকে তাকাল, তারপর মণিমোহনকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে তার পিঠে মুখ গুঁজে গলার কচকেমি এনে বলল—'শালা বুড়ো, দাঁড়াবে আবার কোথায় —চিরদিন যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেইখানে—আপনার কাছে। মণিমোহন নামে পাষাণটি কি কোনোদিন আমাদের বিন্দুমাত্র পরোয়া করেছে ?'

—'আসলে ওকে আপনি আমার থেকেও বেশি ভালোবাসেন।'

—'বলছেন ? চলুন তাহলে একটু চা খাওয়া যাক।'

—'এই শুরুর। তোর না পেপার কমপ্লিট করতে হবে !'

—'মারো গোলি। আমার অসুখ করতে পারে, অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। বাঙলা গল্পের আদিপর্বে হাতিচিহ্ন। ফ্যানটাসটিক। চলো বড়দাদু, ক্রফোর্ডে আজ সেরে আসা যাক।'

—'হল থেকে আমি কিন্তু অরূপবাবুকে ফোন করে দেবো।'

—'তা দেবে না ? সেই কিন্তুক ইয়ারে যাবার ভূমিকাও অভিষ্ঠান করেছ, চরিত্র পেরিয়ে গেছুম—চরিত্র সংশোধন করেই যাচ্ছ। মানি না, কিচ্ছু মানি না। আর্ট আমায় ডেকেছে—তুমি না যাও আমি একলাই যাব।'

—'বাজল কটা ?'

—'সাড়ে এগারো। তোর ঘড়ি কি হল ?'

—'সারাতে দিয়েছি।'

—'মানে ? রেজাল্ট দেখে ফাদারল্যাণ্ডে॥ ঘড়ি পর্যন্ত বিগড়োলো ?'

—'বিগড়োবে কেন ? বাবুরা হাত থেকে ফেলে ভেঙে দিয়েছে।'

—'শাবাশ ব্যাটা। কি টাইমসেন্স। তুই ভাঙলি চলমা, বাবুরা ভাঙল ঘড়ি। কি সিম্বলিক : তা চলমা তো যুগেছে, ঘড়িটা কবে আসবে ?'

—'আসবে আসবে। অত ব্যস্ত হোস কেন ?'

—'এই, বেগুনি খাবে ?'

মণিমোহন হেসে বলল—'ছাখ অমিয়, এইমাত্র বলল আমার প্যাসট্রিক ট্যাবল, আবার ভেলেভাজার লোভ দেখাচ্ছে।'

—'একটা খাও, কিচ্ছু হবে না। আমার খুব খেতে ইচ্ছে করছে।'

মণিমোহন আর অমিয় দুজনেই অবাক হয়ে কনকের দিকে তাকাল। গাছকোমর বেঁধে কনকের বয়েস যেন হঠাৎ কমে গেছে। মণিমোহন কানে ব্যাণ্ডেজ-চার্চের ঘণ্টা শুনতে পেল।

মুখ রাঙা করে কনক বলল—'কি দেখছ অমন হাঁ করে ? ছেলেমেয়েরা আমায় বেড়াতে নিয়ে গেলে কত কি খাওয়ায়—ফুচকা, কালমুড়ি, খাস্তুর চপ।'

অমিয় বলল—'ছেলেমেয়েরা মানে ? স্কুলের ?'

—'আজ্ঞে না, মোপাসাঁজিত। মিতু-বাবুরা।'

—'চোর ! তুমি না আগে কিন্তুতে ফুচকা খেতে না। বলতে নখগুলো হাতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে দেয়, তোমার ঘেন্না করে।'

—'করতাই তো। তোমার কপাটি যে এদিকে ফুচকা খাওয়ার যম। শ্রীমানকে জিজ্ঞেস করো—মিঠুও তাই। এখনকার মেয়েরা ওসব পরোয়া করে না। অগত্যা আমাকেও বাধ্য হতে—'

মিঠু যে অমিয়র ছায়ী ছিল তা

মণিমোহনের মনে থাকার কথা নয়। অপ্রতিভ সুহৃদের মুখের দিকে তাকিয়ে সে হা হা করে হেসে উঠল।

অমিত বলল—'শালা বুদ্ধো, এটা কি তোমার বিপ্লবের অফিস না ইউনিভার্সিটির করিডোর? আর আপনি, কনক, আপনি সঙ্গে থাকলে আমরা কোনোদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কালঘুড়ি পর্যন্ত খাই নি। ট্রাম কখি হাউসে। আপনি এখন হাজরাতে বেগুনি খেতে সাহস্রেন। ঠিক হ্যায়। এইসা দিন নেহি রহেগা।'

—'তাহলে বলি? প্রথম আমি ফুচকা খেয়েছি মিঠুর সঙ্গে। ইউথ ফেস্টিভ্যালে—ওর দাদা ছিল বলে আপনার বন্ধু আর আপনি সোমনাথ লাহিড়ীর বক্তৃতা শুনতে গেলেন। মিঠু, মিঠু আর আমি—'

—'কি কাণ্ড! লাহিড়ীদার বক্তৃতা ফেলে তোমরা—'

—'বা রে ওর মেয়েও তো তখন ফুচকা খাচ্ছিল।'

—'কিন্তু ফুচকা খাওয়াটা করল কে?'

—'ওবভিয়াসলি আপনার নাবালিকাটি।'

—'প্রি চীয়ার্স' ফর মিঠাই সুন্দরী। কিমুন, আজ ভরপেট বেগুনি খাব।'

—'তাহলে আপনারা এইখানটায় একটু দাঁড়ান। আমি নিয়ে আসছি।'

কনক ঘুরে ছেড়ে-আসা দোকানটার দিকে দ্রুত হাঁটতে লাগল।

—'তোর সোমনার কটায় বলালি?'

—'চারটেয়।'

—'অনেকখানি বাকি?'

স্কেচ: দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

—'আরে না পাতাখানেকের বাপী, মিনিট দশেক লাগবে। দাঁড়া আসছি।'

ঘুরে অমিতও পেছন দিকে দ্রুত হাঁটতে লাগল।

—মণিমোহন?

—বলো।

—মণি-মো-হো-ননন,

—ব-লো-ওও

—অতঃপর?

—কিসের?

—বেল ও মনের!

—চলছে চলবে!

—তোমার?

—ঐ, চলছে চলবে

—এইভাবে?

—হ্যাঁ, এইভাবে।

—এইভাবেই চলবে?

—আপাতত।

—তারপর?

—জানি, কিন্তু বলব না।

মণিমোহন নিজে নিজেই হেসে ফেলল। দেখল নিবিষ্ট মনে কি একটা আলোচনা করতে করতে ওরা ফিরছে। কনকের হাতে একটা ঠোঙা, সে তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে মাটির দিকে মুখ নামিয়ে হাঁটছে। অমিয়র ডান হাতে কিছু একটা খাদ্য, মাঝে মাঝে কামড় দিচ্ছে আর অত্যন্ত ভঙ্গিতে পাশের লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে বলতে এগোচ্ছে। কিছুটা দূরে থাকতেই অমিয় কথা বলা বন্ধ করে উত্তপ্ত হয়ে বেগুনি চিবোতে লাগল। কনকের মুখে চিন্তা। বিদ্ধ চোখে মণিমোহনের দিকে তাকিয়ে বলল—'চলো।'

লোকে যেমন সুর করে ট্যাক্সি ডাকে অমিয় সেইভাবে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—'ক-ফি-হ।'

—'আরে? এখানে আবার কফি-বার কবে হল?'

—'আছই। তুমি ওপন করবে।'

কুণ্ঠিত স্বরে কনক বলল—'একটু এগোলেই তো চায়ের দোকান পেতুম।'

—'পাতি বুর্জোয়া। চা যদি খেতেই হয় পেতলের কলসি চাই, ভাঁড় চাই—বেগুনির সঙ্গে জমবে। নইলে কফি।'

—'চ চ। মিছিমিছি একগাদা পয়সা খরচ হবে।'

—'পয়সা? ও কোন চীজ হ্যায়? কটা নোট ছেপে নিলেই চলবে।'

প্রশস্ত চৌকো ঘর, আগাগোড়া ডিসটেম্পার করা। তিন দেয়ালে রীতিমতো আধুনিক ফ্রেসকোর ফ্রেমে আয়নার টানা প্যানেল। উত্তর আর দক্ষিণ দেয়াল ঘেঁষে আড়াআড়ি ছুটো উঁচু লম্বা টেবিল পাতা। পালিশ ঝকঝক করছে। তদিকে কিচেনে যাতায়াতের দরজা, তার একপাশে ছোট্ট টেবিলে কাউন্টার—এক সাহেব সর্দারজী, প্রৌঢ়, বসে আছেন। এদিকে ঢাকা একটি চেয়ার। জমাট নৈঃশব্দ্যে ঠাসা সেই ঘরে চাপা আলো জ্বলছে।

ভেতরে ঢুকে তিনজনেই তারা হকচকিয়ে গেছে। মণিমোহন ঢাকা চেয়ারটায় বসে পড়ল। আয়নার স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরা এক তরুণী বিদেশিনীর চিবুক থেকে নাভিদেশ পর্যন্ত ছায়া। সে চোখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকাতে দেখল মিডুর বয়েসী দুটি ছেলেমেয়ের হাত ধরেক চওড়া টেবিলের দুপাশে, ঠিক মুখোমুখি, দাঁড়িয়ে কফি খাচ্ছে। ছেলেটি টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে একটু আড় হয়ে দাঁড়িয়েছে, পেছনের আয়নায় তার পিঠ, মেয়েটির মুখের বাঁ পাশ আর খোলো মেয়েলো চুল ছেলেটির পিঠ ছুঁয়ে আছে। প্রতিবিম্ব ছেলেটি দেখতে পাচ্ছে না, মেয়েটি তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে।

মণিমোহন ছেলেটির চোখ অনুসরণ করে দেখল উলটো দিকের আয়নায় তার মুখ পড়েছে বিদেশিনীর ঠিক বুকের ওপর। বিদেশিনী অন্যদিকে তাকিয়ে তার গলার তুলসীর মালাটা নাড়াচাড়া করছে—হয়তো সে জানেও না তার আঙুল আয়নায় ছেলেটিকে আদর করছে।

এমনকি অমিয়ও অপ্রতিভ হয়ে গেছে। প্রৌঢ় সর্দারজী চোখে সেলাদারি আত্মীয়তা আর নৈর্ব্যক্তিকতা নিয়ে অর্ডারের প্রত্যাশায় তাকাতে অমিয় বলল—'কফি। দুটো।'

কনক কিছুটা চোরের মতো তার ছেলেভাজার ঠোঙাটা আঁচল চাপা দিতে চাইছিল। মণিমোহন হেসে পরিষ্কার বাংলায় বলল—'সর্দারজী, আমাদের সঙ্গে কটা ছোলেভাজা আছে, হুকুম করেন তো খাই।'

প্রৌঢ় মুহূর্তেক ইতস্তত করে নৈর্ব্যক্তিক স্বরে উত্তর দিলেন—'কোই বাত নেহি।'

কনক আর অমিয় সেই টেবিলটায় দাঁড়াল যেটা বিদেশিনীর দখলে ছিল। কনক দাঁড়িয়েছে মণিমোহনের দিকে মুখ করে, পেছনের আয়নায় তার পিঠ ঘাড় খোঁপার একটা অংশ। মণিমোহন জানে দেয়ালের আয়না সম্পর্কে কনক সচেতন নয়, হয়তো লক্ষ্যই করে নি। কিন্তু অমিয় সতর্ক—সে এমনভাবে দাঁড়িয়েছে যাতে উলটো-দিকে তাকিয়েও বিদেশিনীকে দেখা যায়, এবং তার ছায়া অন্য কোনো ছায়াকে স্পর্শ না করে।

কনক ছেলের ছোপ-লাগা ঠোঙাটা টেবিলে রাখল। মণিমোহন স্পষ্টই দেখল কিশোরী মেয়েটির চোখদুটো লোভে চকচক করে উঠল। ছেলেটি ভুরু কুঁচকে তাকে নিঃশব্দে ধমক দিল। মেয়েটি লজ্জায় জিব কাটল। তারপর আবার আগের সেই অবস্থানে দাঁড়াল—এভাবে দাঁড়ালে তার ছায়া ছেলেটির পিঠ স্পর্শ করে।

এ-অঞ্চলে এমন একটা কফি-বার কল্পনা করা যায় না। কলকাতার ভূগোল দ্রুত পালটাচ্ছে—এ তো সকলেরই চোখে পড়ে। কিন্তু কলকাতার বাড়ি, জামাকাপড় আর ওষুধের দোকানই শুধু নয়—রেস্তোরাঁ ব্যবসাটাও যে সম্পূর্ণ উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয়দের হাতে চলে যাচ্ছে এবং ফলে আমাদের পোশাক ও খাদ্যাভ্যাস আমূল বদলাচ্ছে

প্রাচীন ভারতের রন্ধন প্রণালী আর আজকের ভারতীয় রন্ধন ও

INSTANT COOKING RECIPE

LICENCE FROM INDU P. MUKHERJI

P_3 Instant Cooking Recipe-র দ্বারা তরিতরকারি ১৫টি বিভিন্ন-প্রকারে —পলকে রন্ধনক্ষম করা যাচ্ছে। যে পদটি রাঁধতে চান তার P_3 Instant Cooking Recipe কিনে, পদ্ধতিমাফিক মাছ বা মাংস বা সবজি, খানিক ঘৃত বা তৈল ও জল দিয়ে, স্টোভ জ্বেলে দিন। যে পদ রাঁধতে ৪/৫ ঘণ্টা লাগত, সেটি রান্না হবে ১০/১৫ মিনিটে সাতরাজ্যের অন্বেষণ কিছুতে থাকতে নেই।

তৈল-না, ঘি-না, পলকে রান্না।

বাণিজ্যিক অনুসন্ধান

Spices & Condiments
41, Ballygunge Park
Calcutta 700 019

—অর্থাৎ আমাদের বিবেচিতার প্যাটার্ন'—এ সম্পর্কে, বুঝলি অমু, সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা করা দরকার। এর প্রভাব পড়ছে আমাদের পারিবারিক জীবনেও। গড়িয়াহাটার মোড়ের দিকে তাকাও, দেখবে

—'ধরো। এই!'

বেশ বড় একটা বেগুনি। এক বছর আগেও এক কাপ চা আর এমন একটা বেগুনি পেলে হুংকার হপুরের ডিনার হয়ে যেত। কত সময় তা-ও তো জোটে নি। আজ সেই বেগুনিটার দিকে তাকিয়ে মণিমোহন কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই ভয় পেল। লোভে পাপ, পাপের বেতন —বরাল সিস্টেমে অন্তত সাত দিন তার জের টানা। হঠাৎ একটু রাগও হল কনকের ওপর কথা তো ছিল সে কিনতে চাইবে আর ও বাধা দেবে! তার শরীর কতখানি ভেঙেছে কনক কি বুঝতে পারছে না? নাকি, ছেলেমানুষী জেদে পুরো ব্যাপারটাই চায় অস্বীকার করতে?

অমিয় দূর থেকেই বলল—'ঘুটো অ্যাসিডিটি খেয়ে নিস। কিছু হবে না।'

কনক বলল—'আসার সময় কটা ট্যাবলেট কিনে নিয়েছি। আমিও খাব।'

অমিয় বলল—'আমিও।'

হেসে ফেলে মণিমোহন বলল—'সে কি যুবক?' দু-পা এগিয়ে অমিয় বাও করে ইংরিজিতে বলল—'যৌবন দেহে নয় মনে ওল্ডম্যান।'

অন্যমনস্ক বিদেশিনী ইংরিজি শুনে সচকিত হয়ে অমিয়র দিকে তাকাল। তারপর মণিমোহন আর কনকের দিকে। তার চোখ দেখে মণিমোহন বুঝল মেয়েটি তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে এতক্ষণ সচেতন ছিল না।

বিদেশিনী তারপর অমিয়র দিকে চিবুক তুলে হাসিমুখে বলল—'হালোওও।'

আর, দরজার দিক থেকে অন্তত মেয়েলি গলায় কে যেন উত্তর দিল—'হালো হালো।'

প্রায় সন্তর গাম্ভীর মতো দেখতে—টাক, ঝুলফি, অল্প কোঁকড়ানো ব্যাকব্রাশ চুল—সাদা পাঞ্জাবি আর পাজামা, বয়েসের তুলনায় একটু বুড়োটে চেহারা। সঙ্গে অসম্ভব সুদর্শন এক তরুণ সাহেব—মিশু গ্রীকের মতো চুল দাড়ি, বুকের বোতাম খোলা শুভ্র পাঞ্জাবি, শর্টস, পায়ে হাওয়াই চপ্পল, পিঠে একটা 'হোয়াট নট'।

তাহলে অমিয় নয়, বিদেশিনী এদেরকেই সম্ভাষণ করেছিল; প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ লোকটাকে। উত্তরও তাই সে-ই দিয়েছে। কনক, অমিয় তাদের ঢুকতে দেখেছিল—তাই বিদেশিনীর সম্ভাষণ শুনেও অমিয় পেছন ফেরে নি। মণিমোহন মনে মনে লজ্জিত হল। মিছেই সে অমিয়র ওপর বিরক্ত হচ্ছিল। সব জায়গায় গালাগির শোর কী যে প্রবণতা। ভাগ্যিস এ দুজন এসে পড়ল।

সাদা উর্দি-পরা বেয়ারা ঐ সাহিবে তিন কাপ কফি নিয়ে এল। সেরামিকসের কাজ-করা চীনেমাটির মগ, ওপরে আর ইঞ্চি ফেনা।

অমিয় চুমুক দিতে যাবে, বিদেশিনী হঠাৎ তার সেলোসমুদ্ধ হাতটা সামনে প্রসারিত করে বলল—'চীয়ার্স'।'

অমিয় চমকে উঠে প্রায় অভ্যাস-বশেই যেন মণিমোহনের দিকে একবার তাকাল, তারপর শুকনো হেসে হাতের একটা ভঙ্গি করে অস্ফুটে বলল—'চীয়ার্স।'

মণিমোহন আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে কাপসুদ্ধ নিজের ডান হাতটা সামনের দিকে প্রসারিত করে বলল—'টু ডিস্টেন্স।'

কিছুক্ষণ বসে থাকলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে মিনিট খেড়-দুই সময় লাগে, এই সময়টুকু মণিমোহনকে ঈষৎ কুঁজো হয়ে দাঁড়াতে হয়, সে জানতেও পারে না সারাক্ষণ যন্ত্রণা সওয়ার চেষ্টাটা তার চোখেমুখে কি করুণভাবেই না ফুটে উঠেছে!

কনক আর অমিয় আন্তরিক বিস্ময়ে মণিমোহনকে দেখছে। ছাত্রজীবনে অসম্ভব সব পরিস্থিতিতে এইভাবেই সে লাফিয়ে উঠে বক্তৃতা করত, বা স্লোগান দিত। কিন্তু সে তো শত জন্মের কথা!

বিদেশিনী নাভাস অথচ মিষ্টি হেসে মণিমোহনকে বলল—'হাসলোও।' তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গী যুবকের সঙ্গে মিহু গলায় গল্প জুড়ে দিল। কনক আর অমিয় টেবিল ছেড়ে মণিমোহনের চেয়ার ঠেলে দাঁড়াল। অমিয়র চোখে তারিফ। আস্তে বলল—'দারুণ বড়বাবু।'

কনক বলল—'ছেলেমানুষি।'

অমিয় বলল—'না। ছেলেমানুষি আমরাই করেছি, মানে আমি। মেমসাহেব দেখেই মুখ দিয়ে ইংরিজি বেরিয়ে গেল।'

—'আপনি তো চিরকালের গাইয়া। দেখলুম এখনও তাই-ই আছেন। তুমি ওর জন্যে বৃথাই ভয় পাও।'

—'লিখে দিন, প্রীত লিখে দিন।

মনু আর মিঠু—দুজনকেই দরকারে দেখাতে পারব।'

কফির কাপে চুমুক দিয়ে কনক বলল—'বাক্যবীর মিং।'

অমিয় বলল—'মাচে মিং মিং। কেমন, হল তো?'

মণিমোহন কনককে দেখছিল। জাঁচলটা গাছকোমর করে সে যখন ভেলেভাজা কিনতে দৌড় দিল—তখন অনেক বছর আগের সেই কনককে দেখা গেল, চন্দননগরের নির্জন গির্জায় স্বভাবভীরু ধীর স্থির যে-কনক একদিন তরুণ মণিমোহনকে বিস্মিত করে হঠাৎ নিজের মনেই ছুটে ছুটে যেন লুকোচুরি খেলা শুরু করেছিল। পরিবেশ কনককে সেদিন মুক্তির স্বাদ দিয়েছিল।

তারপর, এত বছর আধমাড়াই কলে পিষ্ট হয়ে হয়ে কনক নিজেকে তার প্রকৃতিগত ধীরতার দুর্ভেদ্য দুর্গেই আটকে রাখতে অভ্যস্ত হয়েছে। কিন্তু হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কি হল তার, চড়া রোদে খোলা রাজপথে কোথায় সে আজ ছুটির খুশি খুঁজল?

আসলে, মণিমোহন বুঝল, কনক ভয় পাচ্ছে আমি পঙ্গু হয়ে যাব। তাই আমাদের প্রথম যৌবনের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরতে চায়, আমাকেও চায় তার আশ্রয় দিতে। অতীত ছাড়া বেচারার সম্বলই বা কি?

ঠিকই তো। কনককে তো পেট ভরে খেতে দিতেও পারি নি। পরিমিত বিশ্রাম। আমাদের বিবাহিত জীবনে প্রভু বা প্রকৃতির কোনো সঙ্গত নেই। আমাদের ছেলেমেয়ে দুর্গাপুর দেখে নি, ডিলাইরা। অথচ ট্রেনে কখনোই দুরপাল্লার টিকিট পাওয়া যায় না। কনক কনক! মিতু আর বাবুয়াকে নিয়ে মাঝে মাঝে পার্কে যাওয়া ছাড়া তোমার তো বেড়াবার সঙ্গী জোটে না, তাইনা।

আর, বয়েস হয়ে গেল। বয়েস হয়ে যায়। তখন হাসপাতাল থেকে ফেরার পথটাও মনে হয় অনন্তকাল মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। তাড়াতাড়ি করে নিষিদ্ধ ভেলেভাজা খাওয়াও ঘটনা হয়ে ওঠে। কনক তো বলেই আজকাল—জীবনের কাছে কোনো ঋণ রাখতে নেই।

—'আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো!'

মণিমোহন বিহ্বল দৃষ্টিতে সজল পাঞ্জাবীর মুখের দিকে তাকাল। এ কি বাঙালী, না বাঙলা জানে?

—'সুরেন চৌধুরী।' বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লোকটি মণিমোহনের দিকে তাকিয়ে রইল। ফলে যাহা হয় তাকে নিজের নাম বলতে হল।

—'আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি।'

লোকটিকে সে মোটেই সহ্য করতে পারছিল না। কিন্তু, সজল পাঞ্জাবীর মতো দেখতে শুধু এই কারণেই এক-জনের সঙ্গে অভদ্রতা করা যায় না। অবশ্য সন্দেহের অন্য কারণও আছে, দুজন হিপির সঙ্গে—কিন্তু সেসব তো এখন অবান্তর হয়ে গেছে। মণিমোহনের শুচিবায়ুগ্রস্ত মন তবু অভ্যাসবশেই টান টান হয়ে উঠল। সৌজন্য বজায় রেখে নিরুত্তাপ গলায় বলল—'দেখে থাকবেন কোথাও।'

—'ইরা বলছিল আপনারা নাকি ট্যাবলেট খোঁজ করছেন?'

—'ট্যাবলেট?'

চোখের ইশারায় মণিমোহনকে থামিয়ে দিয়ে অমিয় বলল—'হ্যাঁ, আমি করাচ্ছিলাম। আছে আপনার?'

—'ইরার আছে।'

—'ইরা কে?'

—'ঐ যে। ঈরিনা।'

মণিমোহন লক্ষ্য করল, অদূর আগ্রহে মেয়েটি তাদের কথা শুনছে। ট্যাবলেট, ইরা, ঈরিনা—চেনা এই শব্দগুলি উচ্চারিত হতে খুশি হয়ে মাথা নাড়ল। মণিমোহন এতক্ষণে বুঝল এ্যান্টাসিড ট্যাবলেটের আলোচনা কি বিপত্তি ঘটিয়েছে। আতঙ্কিত হয়ে পাশের টেবিলের সেই ছেলেমেয়েদুটির দিকে তাকাল। মিতু, বাবুয়া—তোদের আমি কোথায় লুকিয়ে রাখব? আর, কনককে দ্যাখো! কেমন শিশুর মতো শুনছে! ট্যাবলেট মানেও বোঝে না! ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস!

—'এসব ট্রান্সঅ্যাকশন তো হাইলি ইরেগুলার পুলিশের ভয় নেই?'

সুরেন চৌধুরী দার্শনিকের মতো উত্তর দিল—'আছেও বটে, নেইও বটে।' তারপর হস্তক্ষেপের ঢঙে হাতটা তুলে বলল—'এই যে এখানে নিশ্চিন্তে কাজ খাচ্ছেন, আপনার জীবনের আশঙ্কা নেই? হঠাৎ একটা হাইড্রোজেন বোমা ফাটতে পারে, পুরোনো ছাদটা হঠাৎ ভেঙে পড়তে পারে। আমার পকেটে বোমা রাখা ছিল—আপনি জানেনও না, চুটিয়ে গল্প করছেন—হঠাৎ সেটা বার্স্ট করতে পারে, হঠাৎ আপনার স্ট্রোক হতে পারে। কেমন, পারে না?'

অমিয় স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, কোনো জবাব দিল না। সুরেন চৌধুরী বলতে লাগল—'আবার, পারে নাও বটে। সব কিছুরই একটা আইন আছে, ব্যতিক্রমটা আইন নয়।'

—'অর্থাৎ আইন মানাটাই ব্যতিক্রম। আর না-মানাটাই আইন?'

—'ঠিক তাই। যেমন গণতন্ত্র সংরক্ষণের জন্য দেবীজীর হাতে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন, গণতন্ত্র সংরক্ষণের জন্যই ঐ সংশোধন ব্যতিলের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রে জনতা পার্টির জয়ের পর তারপর সেই ঘটি প্রদেশে অ্যাসেম্বলিরই ভোরে ন-টা রাজ্যে উপনির্বাচন থেকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের খবি দাও।'

অমিয় সচকিতভাবে প্রশ্ন করল—'কি করেন আপনি?'

—'খালাসি কিসের নয় তা বরং জিজ্ঞেস করুন। আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া সহজ হবে।'

—'থাকেন কোথায়?'

—'চাঁদে!'

—'কি নাম বললেন?'

—'অমিয় ভট্টাচার্য।'

অমিয়র মুখ ঘন ঘন করছে। কনক ছিটকে সরে এসে মণিমোহনের হাতদুটো ধরে ঝাঁকিয়েছে। মণিমোহন ওঠার উদ্যোগ করছে। ছিলটান সেই পরিবেশে অসময়ে নাম আর মিষ্টি গলায় লোকটি প্রশ্ন করল—'আপনার নাম?'

স্থিরচোখে চেয়ে থেকে অমিয় উত্তর দিল—'অমিয় ভট্টাচার্য।'

'হা-হা!' বাঁ হাতে নিজের উরুতে একটা চাপড় মেরে লোকটি বলল—'নেম সেম। এইজন্য আপনাকে দেখেই আমার সেন্স ইমপালস হচ্ছিল।'

মণিমোহন বলল—'অমা!'

শ্বাস নিতে উদ্যত বাঘ হঠাৎ ঘুমকে গেলে যেমন হয়, অমিয় তখন মণিমোহন বলল—'আপনাকে আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

—'ও শিওর।'

—'একটু আগে বললেন আপনার নাম সুরেন চৌধুরী।'

—'ঠিকই বলেছি।'

—'এখন বলছেন আপনার নাম অমিয় ভট্টাচার্য।'

—'ওটা আমার পেন-নেম। ওনামে লিখিটিখি।'

বিস্ময়ে কনক অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

ভাষা না বুঝলেও পরিস্থিতির টেনশন টেরিয়ে ও তার সঙ্গী অনুভব করছিল এবং সন্দিগ্ধ, কিছুটা ভয়ার্ত, চোখে এদিকে তাকিয়েছিল। কনকের অস্ফুট আর্তনাদ ওদের কানে পৌঁছেছে। কি বুঝে কে জানে মেয়েটি বা হাতের তেলো দিয়ে নিজের মুখ চাপা দিল।

অমিয়র চোখে এতক্ষণে হাসি ফুটেছে।

বলল—'আমায় খাবড়ে দেবার চেষ্টা করছেন কেন বলুন তো?'

যেন শিশুর বিস্ময়ে লোকটি বলল—'আপনাকে? খাবড়ে? বাই জোভ!' একটু থেমে একবার কনকের মুখে চোখ বুলিয়ে চঞ্চিতে মণিমোহনকে দেখিয়ে তারপর বলল—'বরং উনিই তো আমাদের খাবড়ে দিতে চাইছিলেন।'

মণিমোহন হাসিটা বুঝল বলেই কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু কনক বলে বলল—'কিভাবে?'

লোকটি কনককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মণিমোহনকে প্রশ্ন করল—'আমেরিকান দেখলেই আপনার ভিয়েতনামের কথা মনে পড়ে, তাই না?'

মণিমোহন বলল—'পড়ে।'

—'আচ্ছা, এবার আমি আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

—'করুন।'

লোকটি হেসে বলল—'মনে হচ্ছে আপনি একজন কমিউনিস্ট। অবশ্য ছিলেন একসময়। বলতে পারেন এলাহাবাদের সালে পাক মিলিটারি জুন্টা শেখ মুজিবকে অ্যারেস্ট করে গোটা পূর্ববঙ্গে হৈরলাসন চালাচ্ছে শুনে আপনি কি করেছিলেন?'

—'প্রতিবাদ করেছিলাম।'

—'মাতৃভূমে বড়দিনের দিন ক্রানবের ধনবসতি অঞ্চল আমেরিকা বোমা ফেলে উড়িয়ে দিয়েছে শুনে আপনি কি করেছিলেন?'

—'প্রতিবাদ করেছিলাম।'

—'তিয়াত্তরে পালেস্তাইনের মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ইজরাইলের বর্বরতার সংবাদ শুনে আপনি কি করেছিলেন?'

—'প্রতিবাদ করেছিলাম।'

—'চুয়াত্তরে প্রেসিডেন্ট আলেন্দে, শিল্পী ভিক্টর জারার চতুর, পাবলো নেরুদার অকাল মৃত্যুর সংবাদ শুনে আপনি কি করেছিলেন?'

—'প্রতিবাদ করেছিলাম।'

—'নিশ্চয়ই চায়ের টেবিলেই শুধু করেন নি। নিশ্চয়ই রাস্তায়ও নেমেছেন!'

—'হ্যাঁ।'

—'আপনি প্রকৃতই আন্তর্জাতিকতাবাদী। মণিমোহনবাবু, আজকের তারিখটা আপনার খেয়াল আছে?'

—'আছে।'

—'আচ্ছা, বলতে পারেন গত বছর আজকের তারিখে আপনি কোথায় ছিলেন, কি করেছেন?'

—'মনে নেই।'

—'তার আগের বছর?'

—'মনে নেই।'

—'ডায়রি রাখেন? এই দুটো তারিখে কোনো এন্ট্রি পান কিনা একটু দেখবেন!'

—'কেন বলুন তো?'

—'হয়তো তাহলে কিছু বারে "মু ভিভেতনাম" বলে খামোকা চেঁচিয়ে ওঠাটা আপনার নিজের কাছেই একটু বাড়াবাড়ি মনে হবে।'

—'আপনি আমার বন্ধু ও স্ত্রীর মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে চাইছেন। এমনকি আমার নিজের মনেও। কিন্তু যেখানেই থাকি, যা-ই করি—ভিয়েতনামের নাম উচ্চারণ করার অধিকার হারিয়েছি বলে তো মনে হয় না।'

—'একটু সভ্য ভব্য বলুন না মশাই, এখন তো আর জরুরী অবস্থা নেই দেশে।'

মণিমোহনের পিঠে একটা চাবুক পড়ল যেন। কনক, অমিয় তারিখের ব্যাপারটা ওরাও এতক্ষণে বুঝেছে।

মণিমোহনের ঠোঁটদুটি একবার কেঁপে উঠল। কিন্তু কিছু বলার আগেই বিরক্ত অমিয় বাধা দিয়ে বলে উঠল—'এটা কিন্তু আলোচনার আদপে নয়।'

লোকটি মুচকি হেসে বলল—'ঠিকই। ওটা পার্টি অফিস, আর অন্যদের জন্যই তোলা থাক। আপাতত নারকটিক ট্যাবলেট বিষয়ে আলোচনা হোক। চাই নাকি স্যার?'

মণিমোহন জোর করে মুখে হাসি টেনে বলল—'সামরা অ্যাক্টাসেড ট্যাবলেট কেনার কথা বলছিলাম। ভদ্রমহিলা ভুল বুঝেছেন।'

—'অ্যাক্টাসিড!' ভুরু কুঁচকে লোকটি মণিমোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন ঠাহর করছে। খিড়খিড় করে আবার বলল—'অ্যাক্টাসিড' তারপর বিরক্তভাবে অমিয়কে দেখিয়ে বলল—'কিন্তু উনি যে বললেন খোঁজ করছিলেন!'

মণিমোহন বলল—'আপনার সঙ্গে দুষ্টুমি করেছে।'

'দুষ্টুমি? হা হা হা। দুষ্টু খোকা, হা হা হা। তা যাই বলুন—দুষ্টুমি করলে ওর মেন্স অ্যাপিলটা আরো বাড়ে।'

—'আমি ওই ধরনের আলোচনায় অভ্যস্ত নই।'

—'হয়ে যান, হয়ে যান। নইলে পারে পারে হোঁচট খাবেন। আচ্ছা, গুড লাক।'

লোকটি কাউন্টারে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় সর্দারজীর সঙ্গে দু একটা কথা বলতে বলতে বিল মেটাল। ঈরিনা ও তার সঙ্গী ততক্ষণে মণিমোহনদের পাশ কাটিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঈরিনার মুখে এক ধরনের অনির্দিষ্ট হাসি। যেন কি একটা বলতে চায়, কিন্তু কথাটি পাছে উচ্চারণ করে ফেলে তাই মাঝে মধ্যে ঠোঁট কামড়ে ধরছে। তার সঙ্গীর মুখচোখ দেখে অবশ্য কিছুই বোঝা যায় না, যেন ঘুমের ঘোরে হাঁটছে।

—'আমার কার্ডটা।'

মণিমোহন হাত বাড়িয়ে নিল। লোকটি হঠাৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন গলায়, ভারী আর পরুষ কণ্ঠে, সকলকে প্রায় ভয় পাইয়ে দিয়ে বলল—'সামনের বছর, এই তারিখ—মনে রাখবেন।'

তারপর দ্রুত বেরিয়ে চলে গেল।

লোকটির কণ্ঠস্বরের এই আকস্মিক পরিবর্তন এতক্ষণের সমস্ত নাটককেই প্রায় জলীক করে তুলল।

স্কেচ : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

মণিমোহন অমিয় কনক—কেউ কারো দিকে তাকাতে সাহস পেল না।

বাসস্টপে দাঁড়িয়ে অমিয় বলল—'যাই। পেপারটাই শেষ করিয়ে।'

কনক বলল—'চলুন না।'

খেয়ে তারপর যাবেন

অনুনয়ের সুরে অমিয় বলল—'না কনক। তাহলে আর সেদিনকারই যাওয়া হবে না।'

—'ওই যে বললেন দুজনে সিনেমা যাবেন।'

—'দুষ্টুমি করে বলেছি।'

কনক চাপা হাসিতে মুখ আড়াল করে বলল—'দুষ্টু খোকা!' লোকটির পরবর্তী বাক্যাংশ মনে পড়ে যাওয়ায় অপ্রতিভ কনক তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল। অমিয়ও চোখ নিচু করল। এক অদ্ভুত মায়া বোধ করল মণিমোহন। দুখোড় অমিয় কনকের সামনে এই প্রথম লজ্জা পাচ্ছে। এইভাবে, এইভাবেই পরিপার্শ্ব থেকে সব শুদ্ধতা আস্তে আস্তে উবে যায়।

ক্ষুব্ধ স্বরে মণিমোহন বলল—'দেশটাকে পুরো আমেরিকা বানিয়ে ফেলছে।'

—'শোন। তোর চিউয়েন্টের ব্যাপারে কনকের সঙ্গে কথা বলছিলাম। একটু ভাবিস।'

—'আচ্ছা।'

—'কাল দেখা হবে।'

—'আচ্ছা।'

—'আমি এই ট্যাক্সিটা ধরি?'

—'ধর।'

—'আপনারা দাঁড়িয়ে থাকবেন, আমার খারাপ লাগবে।'

মণিমোহন বলল—'পাঁঠা। সেন্টারটা ভালোভাবে শেষ কর।'

অমিয় জানলা দিয়ে হাত বার করে যেমন অভ্যাসবশেই বলার ছটকেমির সুর এনে বলল—'টা টা।'

মণিমোহন আর কনক হাসিমুখে তাকিয়ে রইল। ট্যাক্সি চলে গেল।

দুই

—'এই, একটু ওঠো না।'

মণিমোহন রোববারের সকালে হাসিমুখে চা খেতে খেতে কাগজ খুলে দেখেছিল কণ্ঠে ফুলমালা মোরারজীর পাঁচ কলাম ছবি—টেলি লেন্সে দূর থেকে তোলা বলে জমায়েতের লক্ষ মানুষকে মনে হচ্ছে পিঁপড়ের সারি, দীর্ঘদেহী মোরারজীর ক্লোজ-আপ তাতে এমন কৌশলে বসানো যে মনে হবে গোটা আকাশই সে মুখের চালচিত্র। জনসভার কাব্যময় বিবরণ পড়তে পড়তে মণিমোহন দ্বিতীয় চুমুক দিয়ে পড়েছিল। কনকের ডাক তার চেতনায় তবে আঁচড়ও কাটল না।

—'এই, শুনছ? একটু ওঠো না যাব।' কনক মণিমোহনকে ঠেলতে শুরু করেছে।

কষ্টে চোখ মেলে মণিমোহন বলল—'কি হয়েছে? হ্যাঁ? কি?'

—'একটু ওঠো না। কাগজগুলো বেঁধে দাও।'

—'আজ থাক

কনক রাগ করে বলল—'না, থাকবে না। কতদিন ধরে বলছি তোমায়।'

—'চা করো।'

হেসে ফেলে কনক বলল—'ওঠো। দিচ্ছি।'

অগত্যা মণিমোহনকে উঠতেই হল। চোখেমুখে জল দিয়ে একটা ঢিল টেনে বসতে মিতু মাস হিসেবে পড়ি দিয়ে বাসি খবরের কাগজের বাণ্ডিল ধপ ধপ করে পায়ের কাছে ফেলল। নিচু হয়ে দুটো বাণ্ডিল রাখতে রাখতে কনক বলল—'কাজের ছিরি ছাখো।'

হাতে হাত ঘষতে ঘষতে নাকমুখ কুঁচকে মিতু বলল—'কি আরম্ভলা। ডিম পেড়েছে ছাখো।'

মণিমোহন বলল—'ভালো আচার হয়।'

—'তোমার বাহনকে দিও।' বলে মিতু মুখ ঘুরিয়ে হাত ধুতে চলে গেল।

—'এই, একটু জল বসা।'

—'আমি পারব না। নিজেরা খালি চা খাবে আর আমি জল বসাব।'

কোঁচড়ে হাত মুছতে মুছতে মিতু দূর থেকেই বলল—'তোমার জামাই চা তুমি বানাও।'

মণিমোহন আবদেরে নাবিকাগ্রার সুরে টেনে টেনে বলতে লাগল—'বৌ, আমি তোমার মিষ্টি হাতের চা খাব। কোনো বেড়ে ইঁদুরের গন্ধ যেন চায়ে না পাই।'

কনক হেসে ফেলে বলল—'থামো তো। সকালবেলাই শুরু করল।'

—'থাকো না মা। বেশ তো আমি খেতে ইঁদুর, তোমাদের পাতে তো পদ্মমুলের সু-বা-স!'

—'তোমাকেও হবে। একটু চা খাওয়া!'

—'আমার এখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর। আমি ভাইকে ডাকতে যাচ্ছি।'

—'তিনি কোথায়?'

—'যুথ্রতীকদের উঠোনে খেলছে।'

—'বাজার হয়েছে?'

—'ওবেলা যাব।'

—'আজ খুব মাংস খেতে ইচ্ছে করছে।'

কনক হাসিমুখে কিন্তু কিছুক্ষণ আর্ত চোখে মণিমোহনের দিকে তাকাল। পেছন থেকে বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে বাবুয়া মণিমোহনের মাংস খাওয়ার ইচ্ছেটা শুনতে পেয়ে গেছে। সে আক্ষরিক অর্থেই দুহাতে ভুলে নাচতে শুরু করল—'মাংস। মাংস। খো পৌঁয়াজ, মোরক মসল্লা। কষা।'

মিতু খিল খিল করে হাসতে হাসতে বলল—'মোরক মসল্লা। মোরক মসল্লা। কাগজের মোড়কে মসলা—তাই কষে, খো পৌঁয়াজ করে—'

কনক দুহাতে বাবুয়াকে জাপটে ধরে আঁচল দিয়ে ঘাম মোছাতে মোছাতে বলল—'না হয় আমার ছেলেটা জানেই না, তাই বলে ঠাট্টা? মোরক মসল্লাম। বুকলি বাবু? সেই যে এক মোরক ছিল...'

কনকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে

মিতু বলল—'বার ভিম থেকে একটা হাল্লারু...'

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাবুরা মিতুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চিপ চিপ করে ওর পিঠে কয়েকটা কিল মেরে বলল—'আজকে রাতে দেখবে কেমন মজার?'

হা হা করে হেসে উঠে মণিমোহন বলল—'শাবাশ বাহন, শাবাশ!'

মিতু মণিমোহনের চুলের মুঠি ধরে কেঁদে ফেলে বলল—'আমার লাগে না বুঝি? বা'!! আমার লাগে না বুঝি?'

বাবুরা মুহূর্তে পক্ষ বদলে মণিমোহনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল—মার মার, বাবুকে মার দিদিভাই।'

আচমকা ধাক্কায় মণিমোহন পড়েই যেত। মিতু দুহাতে তাকে ধরে ফেলে চিৎকার করে উঠল—'বাবু।'

কনক দৌড়ে এসে বাবুরাকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল—'জানো না বাবুর শরীর খারাপ?'

বাবুরা ভুরু কুঁচকে তোড়িয়া ভাষায় বলল—'বাবু যে আমায় মারে, তার বেলা?'

মণিমোহন অবাক হয়ে বলল—'কবে মারলুম তোকে?'

—'সেই যে ঝাকো বিয়ে দিয়েছিলে!'

মণিমোহন হেসে ফেলে বলল—'সে তো তিন বছর আগের কথা। তখন তুই ছোটো ছিলি, কৌত্তে হাত দিতে। তাই তো করেছিলাম। তারপর এত বছরে তো অনেক মেরেছিল বাবা-মোহন, তাতেও শোধ হয় নি?'

মিতু চোখ মুছতে মুছতে বলল—'দুরাত্তার ছলের অভাব হয় না।'

কনকের বাহুবন্ধন ছিঁড়ে বেরোবার চেষ্টা করতে করতে বাবুরা বলল—'দিদিভাই, আমার!'

মিতু বলল—'তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না। বাবুকে বাবা দিলে কেন?'

—'বাবু পচা, চাই না।'

—'তাহলে মরে যাই?'

—'যাও।'

—'বাবু পাবে কোথায়?'

—'চাই না।'

—'তাহলে তোমার মা যে মাছ খেতে পারবে না।',

প্রচণ্ড ভ্রূকুটি হেনে বাবুরা বলল—'কেন?'

—'দিদা মাছ খায়?'

শালে একটা আঙুল ঠেকিয়ে মুহূর্তের কি চিন্তা করে বাবুরা বলল—'মাকে আমি বিয়ে করে নেবো।'

মিতু ঠোঁট উলটে বলল—'মা-র তোমাকে বিয়ে করতে বয়ে গেছে।'

কনকের পেটে মুখ গুঁজে বাবুরা বলল—'ঠিক মা, সত্যি?'

কনক বলল—'তুমি আমার ছেলে- তুমি আমার বাবা, তুমিই তো সব। ঘাড়িওয়ালা আছে থাক।'

—'বটে! বটে! রোজ রাত্তিরে অফিস থেকে ফেরার সময় যখন মিষ্টি নিয়ে আসি—তখন গপাগপ খেতে খেতে ঠিক তো এর উলটো কথাই বলো।'

মিতু হাসি চেপে ঘরে চলে গেল। ছেলেবেলায় সে-ও ঠকেছে। গত রাতে কনককে কি কি মিষ্টি এনে খাইয়েছে দিনের বেলা মণিমোহন প্রায়ই তার ফিরিস্তি দিত। শুনে মিতু রাগে ফুঁসত। আর কনক বোঝাত—'তোকে না দিয়ে আমি কখনও খেতে পারি?' সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিতু একবার মা একবার বাবার দিকে তাকাত। একদিন মণিমোহন তাড়াতাড়ি ফিরল. মিতু স্কুলেই ছিল. বিজ্ঞানীর মতো হেসে বলল—'স্কট. মিষ্টি আনো নি তো?' মণিমোহন বলল—'আনব না কেন? তোমার গলা পেয়েই লুকিয়ে ফেলেছি। ঘুমিয়ে পড়লেই বের করে নেবো। আমার একটা মাত্র বৌ। তাকে ক-তো ভালোবাসি।' মিতু ছলছল চোখে কনকের দিকে তাকাতে সে বলল—'আমার একটামাত্র মেয়েকে না দিয়ে কিছু খেতে তারী বয়েই গেছে। তোকে ক্যাপাচ্ছে বুঝিস না বোকা?' একদিন মণিমোহন তিনটে রাজভোগ কিনে বাড়ি ফিরল কনককে বলল—'সোনাকে তোলো।' ঠেলাঠেলি করে কনক মিতুর ঘুম ভাঙাল। তখন মণিমোহন বলে বসল—'এই নাও। মিতু উঠে পড়েছে। তোমার মিষ্টি দেখে ফেলবে যে।' মিতু তাকিয়ে দেখল টেবিলের ওপর সত্যিই মাটির ভাঁড়, তাতে রাজভোগ। মায়ের দিকে একবার তাকিয়ে মিতু বালিশের ওপর আছড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কনক সেদিন সত্যিই মণিমোহনের ওপর রাগ করেছিল। অপ্রস্তুত মণিমোহন বহু আয়াসে তারপর মিতুর ফোকলা মুখে হাসি ফোটায়। মাত্র তিনটে রাজভোগের মূল্যে তাদের পরিবর্ত ঘরে শুরু হয় স্বর্গের নিমন্ত্রণ উৎসব। সেদিনের কান্নার কথা মনে করিয়ে দিলে মিতু আজও লজ্জা পায়।

বাবুরার কিন্তু ওসব সেন্টিমেন্ট একেবারে নেই। তার বিশ্বাস মণিমোহন মিষ্টি এনে সত্যিই কনককে খাওয়ায়, কারণ একদিন মায়ের সঙ্গে

বাবুর অফিসে গিয়ে নিশ্চয়ই একটা বড় মিষ্টির দোকান দেখে নিজের চোখে দেখেছে। রবিনকাকু পরেশকাকু দোকানে নিয়ে গিয়ে ওকে কত কি খাইয়েছে। বাবু যদি মাকে খাওয়াতে চায় খাওয়াক না। মা তো ওকে মাঝে মাঝেই গুছিয়ে কিনে দেয়। সব থেকে বেশি ওকেই তো ভালোবাসে।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মণিমোহন বলল—'একটা রাজভোগ খেয়ে ফেলেই তো বললে—'তোমাকেই সব থেকে বেশি ভালোবাসি, মিতুকেও না বাবুয়াকেও না, আরেকটা লাও ঈশ্বিতায়'

মণিমোহন হা হা করে হেসে উঠল। কাপ ছলকে চা পড়ল মেঝেয়। বাবুয়া বলল—'ছেড়ে ছোড়া বাচ্চাদের মেড়ো।'

ঘরের ভেতর থেকে মিতু চেঁচিয়ে উঠল—'আগে যদি জানতাম টিকি ধরে টানতাম। ভাই, চলে আয় রে।'

বাবুয়া মণিমোহনের থুতনি নেড়ে বলল—'টিকি সত শোক টানা ওত শক্ত।'

কনক বলল—'ছেলেটাকে একদম কাহিল করে দিলে। খালি কথা কথা আর কথা।'

মণিমোহন বলল—'খুব কম বাচ্চারই হাত আর মুখ একসঙ্গে চলে। তোমার শ্রীমানটি যেমন কথা তেমনই ওস্তাদি।'

কনক হাসল। ঘরে ট্রানজিস্টারটা বেজে উঠল। কেউ শ্যামাসঙ্গীত গাইছে।

—'কথায় উকিলের মতো প্যাঁচ। অথচ তোমায় বিয়ে করতে চায়। ইনোসেন্স আর দুর্বুদ্ধি কেমন মিলে-মিশে আছে। মিতুটা ছিল অনেক বেশি ইনটোভার্ট।'

—'সে তখন তুমি ভটা বছর বাড়িতেই থেকেছ। মিতুর মতো ফাটেলনস তো বাবুয়া পেল না।'

মণিমোহন বলল—'তাছাড়া মিতু জন্মেছে বাষট্টি সালে, বাবুয়া সত্তরে।'

কনক যেন নিজেকেই শুনিয়ে বলল—'সত্যি। দুটো ছেলেমেয়েকে জন্মাল কি অসম্ভব সময়ে। সেবার চীনের সঙ্গে গণ্ডগোল, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে অভিযান। এবার কমিউনিস্টদের নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি, পথেঘাটে বোমা-পিস্তল। বাবুয়া হওয়ার আগের দিন। আমার পেটন শুরু হয়েছে, এক-একটা বোমার শব্দে চমকে চমকে উঠছি। মিতু একবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, একবার খড়খড়ি ফাঁক করে রাস্তায় টহল মারছে, শেষে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। অশোক আর তার বাবা ঘরে ঢুকে তালা খুলিয়ে অফিস গেছে। তুমি বেরিয়েছ ট্যাক্সি ডাকতে। আশেপাশের সমস্ত বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ। খাঁ খাঁ শুধু মাঝে মাঝে কারা দৌড়াচ্ছে আর রাস্তায় বোমা ফাটছে।'

—'আর আমার অবস্থাটা ভাবো। বেরোবার সময় দেখে গেছি অল ক্লোয়ারেই অনবরত ওয়েটিং। ফ্লাট। ট্যাক্সি নিয়ে গলিতে ঢুকতে যাব—মুসলমানের ভর হয়ে গেল। ট্যাক্সি ঘুরিয়ে সর্দারজী আবার স্ট্যাণ্ডে ফিরে গেল। আবার ফোন পাগল আমল অবস্থা। বাড়িতে তোমরা একা। একটা বোমা যদি ভুল করেও আমাদের গিয়ে পড়ে।'

—'কি অপচয়। ভাই না। বাষট্টি থেকে সাতাত্তর পনেরটা বছর খালি উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটল।'

—'শুধু সাতষট্টি সালে একবার বাচার একটা স্বাদ পেয়েছিলাম। যেন সব বন্ধনে হাতে। কংগ্রেস হারল, কমলাপতীদের খুটো ফ্লাট হয়ে যাচ্ছিলতা পড়ল, ময়দানে যুক্তফ্রন্টের বিজয় উৎসব—তাদের পেছনে লরিতে বলগুলির পতাকা সার বেঁধে উড়ছে, লাল কাওয়ার পাশে বাংলা কংগ্রেসের তেরঙা ফ্ল্যাগ। অন্যদের চোখে আশ্চর্য লাগল—তোমাকেও। সেবার অফিসটার সুখ দুঃখে মোটা মিটিংয়ের পশ্চাদ্ভূমি জুড়ে যেন এহো-হ্যাঁদের সিঁদুরখেলা উৎসব। মুজফ্ফর ইসলামের ঘাতকরা বাংলা দেশটাকে বিধবা করতে চেয়েছিল—বেছলা তার লখিন্দরকে বাঁচিয়ে ফিরেছে। তারপর একজন পুরানো সেনসেবী ঝাঁঝা ঝাঁপা গলায় গান ধরলেন—"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার……", পেশাদার গাইয়ে নন, শুনতে শুনতে চোখে জল এল।'

মণিমোহনের ঘর রুদ্ধ হল। সে কনকের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল, কনক অবশ্য জানে মণিমোহন মোটেই তাকে দেখছে না।

—'কিন্তু দুখা হ্যাঁপিয়ারি। ইতিহাসের এতবড় সম্ভাবনা রক্তে ভেসে গেল।'

—'হুম।'

—'অনেকদিন বাঁচো।' কনক তাকে সেই পোলক সংযোজনে ডাকল।

মণিমোহন যেন ক্ষেপে উঠে বলল—'বলো।'

—'তোমার খুব কষ্ট, না?'

—'হ্যাঁগো, বড় কষ্ট।'

—'তবে আমিও সে কষ্ট পাই।'

—'কষ্ট আর ভারবহনের চাই—তোমার তো এইটুকুই দিতে পারিনুম।'

ক্লিষ্ট হেসে কনক বলল—'তুমি বড় ভুল সময়ে জন্মেছ মণিমোহন।' হাত বাড়িয়ে খালি কাপ নিতে নিতে বলল—'আমি যদি সত্যিই তোমার ভার বহন করতে পারিতুম।'

মণিমোহন বলল—'আসলে ভুল সময়ে তো তুমি জন্মেছ। ভাগ্যিস জন্মেছ, নাহলে দেখাই হত না।'

কনক হেসে বলল—'তুমি বড্ড চালাক।'

মণিমোহন বলল—'বোকা নই, অবশ্য অনেকেই তা ভাবে। কিন্তু কনক, সত্যি বলছি—কবে যে তোমার বোঝা হতে পারব।'

—'এখুনি।' কাপগুলো রেখে দাও। আজ তোমাদের সত্যিই মাংস খাওয়াব।'

—'এমাসে কিন্তু অ্যাডভান্স পাব না।'

—'দূর।'

—'এক তারিখে মাইনে কি পাব ঠিক নেই।'

—'জানি।'

—'তোমার ভয় করে না?'

—'করে।' বলে হেঁসেলেই কথা ঘুরিয়ে কনক হেসে উঠল—'আবার করেও না। ভাখো বুড়ো কত্তা, আমি যে তোমার মা নই, বৌ—এ তো মেয়াদ রাখো না। তিনটি নাবালক নিয়ে আমার ভয় করলে চলবে কেন?'

কি ছিল কনকের গলায়—হাহাকার, না সৌরভ? মণিমোহন উঠে দাঁড়াল। কনক চোখের পলকে কাপ হাতে রান্নাঘরে ঢুকে গেল, ঠোঁটে হাসি। মণিমোহন তার নিজস্ব প্রক্রিয়ায় শরীরের ভার ভেঙে রান্নাঘরে ঢুকল। উনুনে কড়াই বসানো। ঝুঁকের মতো সামনে ঝুঁকে কনক সরষের তেল ঢালছে। কি ওর যেন মণিমোহনের নিঃশ্বাস প্রবেশ টের পেয়ে গেছে, মিষ্টি গলায় বলে—'চোর! হাত সেঁকে গেলে সব তেল পড়ে যাবে কিন্তু। এখন তোমার টাকা কে. ডি.?'

—'উসস্স্। কি ছুরবস্থা। কোথায় গুনব এসো বসু এসো; আঁচ আঁচরে বোসো—ও নতুন ভেলের ঘর।'

—'ঐ তো, দান গুনছ না? অতিথি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় অমি ভাবণের পূর্ণিমাতে?'

—'হতেই হবে। আমাদের রেজিস্ট্রেশনের দিন রেডিওতে বিসমিল্লা খাঁ সানাই বাজিয়েছিলেন, এখন তোমার সঙ্গে আমি প্রেম করব—নেপথ্যে।'

কড়াইয়ে পাঁচফোড়ন দিয়ে কনক একটু সরে দাঁড়াল। বলল—'কি করবে?'

চিড়বিড় চিড়বিড় শব্দের মধ্যে মণিমোহন বলল—'প্রেম। শুনছ কনক, একার ম'। তুমি তো আমার ইংরিজির এম. এ.। বাঁকুড়া বোঝো না।'

চাপা কৌতুকে মুখ রাঙা করে ছুটে গুকনো লঙ্কা ছিঁড়ে কড়াইয়ে ফেলে কনক সরে এসে ঘুম ঘুরিয়ে বলল—'রান্নাঘরে প্রেম?'

—'যেমন কপাল।' বলেই মণিমোহন সশব্দে হেসে উঠল। কাঁকটা সোজা ভেতরে ঢুকে গেছে। ঝাঁক কুঁচকে চোখ বুজে সে দমকে দমকে কাশতে লাগল। কনক 'ইস, যেচারা' বলে হাসতে হাসতে আঁচলটা এগিয়ে দিয়ে বলল—'নাও, চোখ মোছো।'

মণিমোহন একটু সামলে নিয়ে যেন কিছুই হয় নি এমন একটা ভাব করে বলতে লাগল—'এত কেন? ছয়জীবনে বন্ধুদের ওড়াতে জানবাদুর চায়ের দোকান, বিয়ের পর মা-ভাই-বোনকে ওড়াতে কাঁচা হাসি, এখন দুটো বয়েসে ছেলেমেয়েদের ওড়াতে রান্নাঘর। আর চিরজীবন এই যত দেখলাম পাহাড়ের চূড়ায়, সমুদ্রের ধারে, জাদিপুর সবকে ফেলে বিনুনি দুলিয়ে ঘুম ছুটি—'

ঘুরে দিয়ে পাঁচফোড়ন আর গুকনো লঙ্কা নাড়তে নাড়তে কনক বলল—'আর তুমি?'

পুরোনো কনকের আঁচল চেপে রেখে মণিমোহন বলল—'না আমি দৌড়ুম না, একটা আরাম-চেয়ারে বসে তোমাকে অবজার্ভ করব।'

—'সত্যি। এক ঘরে জীবন কাটানো।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে দু-হাতে মুখ ঢেকে তাড়া দিয়ে দুই মাথা ঘেরে কনক ঝোঁপাটা খুলল, তারপর কাত করে তাপদুটু ওড়াইয়ে ফেলে দিল। হাই তুলে একটা শব্দের ওজন বয়ে গেল। কনক চাপাস্বরে বলল—'কই, এসো?'

—'হুঁ!?'

—'প্রেম করো?'

মণিমোহন কিছুটা আচ্ছন্নের মতো কনকের দিকে তাকিয়ে রইল। নুন-ওঠা বালি-খসা দেয়াল, এখানে ওখানে ঝুল, দিনের বেলা বাতি জ্বলছে। কড়াইয়ে তাল ফুটে উঠেছে। সেই ওতলানো উনুনের সামনে বুক চিতিয়ে কনক দাঁড়ানো।

নাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চোখে ছলনাময়ী হাসি, দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটি কামড়ে ধরা, একটু জোরে শ্বাস পড়ছে। কোমর থেকে তার আঁচলটা যেমন সরীর ঢাকা, তখনও মণিমোহনের হাতের মুঠোয়।

—'বর্বর।'

—'বলো।'

রানীর মতো আদেশ করল কনক —'উঁহু। ঠিক করে বলো।'

—'বৌ বৌ।'

—'পাচ্ছ মিলছ নাকি? মিষ্টি করে বলো।'

—'কনক।' মণিমোহন প্রায় আর্তনাদ করে বলল—'কনক। এই অরূপরূপে আমারই জন্য তিলে তিলে তুমি নিজেকে ক্ষয় করলে।'

—'না, যা কিছু করেছি সবই আমার জন্য। সে তুমি বুঝবে না হীরেন্দ্রাম। এ সাহিত্যও নয় রাজনীতিও নয়।'

মণিমোহন ঘাড় হেঁট করল কনক বাবুয়ার মতোই তাকে দুহাতে আপটে ধরে বলল—'এমনি মহারাজের রাগ হল। আর্যপুত্র হে, চারদিকে দুঃখের এত কারণ, মনমরা ভাবনায় তার বোঝা বাড়িও না।'

—'আমি যে কিছুই পারি না কনক।'

—'একটু আদর করতেও তো পারো আমায়।'

—'দু'ইচ্ছা।'

কনকের কপালে ঠোঁট ছোঁয়াতে সে আস্তে আঁচলটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল—'যাও। ওরা এসে পড়বে।'

মণিমোহন ঘরে এলো। জানলা ঘেঁষে তক্তপোষে—টানাজিলটানটা দুহাতে পেটের ওপর ধরে রেখে মিতু চিৎপাত শুয়ে আছে। চোখ কড়ি-বরগার দিকে। বাবুয়া পোষা বেড়ালের মতো কেমন একটা কুণ্ডলি পাকিয়ে মিতুর পায়ের কাছে শোয়া, চোখ বন্ধ, কিন্তু মনঃসংযোগের তীব্রতায় ভুরু দুটো কুঁচকে আছে।

'শিশুমহল'। আজকের গল্প বলছেন কেউ।

—'সর।'

মিতু চোখ বুজল। বাবুয়া একবার মণিমোহনের দিকে বিরক্ত-ভাবে তাকিয়ে আবার চোখ বন্ধ করল।

—'এই পেঁচী, একটু সর।'

মিতু গম্ভীরভাবে বলল—'ডিসটার্ব কোরো না।'

—'ওদিকে সর, আমায় একটু শুতে দে।'

—'কাপড় বাচ্চা হয়েছে?'

মণিমোহন হেসে বলল—'না।'

—'আহ্, চুপ কর তো।' বাবুয়া চেঁচিয়ে উঠল।

—'যাও কাপড় বেছে দিয়ে এসো। আরম্ভলার জ্বালায়—'

বাবুয়া চটাস করে মিতুর পায়ে একটা চড় মারল। মিতু খট করে রেডিওটা বন্ধ করে দিল। বাবুয়া লাফ দিয়ে উঠে মিতুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মিতু ঠাস করে বাবুয়ার গালে একটা চড় মারল। 'মা-আ-আ।' বলে বাবুয়া চিৎকার করে কেঁদে উঠল। কান্নার ব্যাপার থেকে রাগের মাত্রাই বেশি ছিল।

কনক ছুটে এল—'কি হল আবার, ঝাঁ? কি হয়েছে সোনা?'

বাবুয়ার চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে। কোঁপাতে কোঁপাতে বলল—'মিতি মেরেছে।'

—'কেন?' ভুরু কুঁচকে কনক বলল—'তাইকে মেরেছিস কেন?'

—'ও কেন আমায় মারল?'

—'তুই কেন বাবুকে শুতে দিলি না? তুই কেন বাবুর খাটে উঠেছিস?'

—'এ'-হু। তুইই তো বলিস এটা বাবুর খাট নয়, মা'র খাট। এখন খুব বাবু দেখাচ্ছে।'

—'আমার মায়ের খাটে কেন উঠেছিস, লজ্জা করে না?'

—'আমার মায়ের খাটে কেন উঠেছিস, লজ্জা করে না?'

—'আমার মা।'

—'আ-মার মা!'

মণিমোহন বলল—'আমার বৌ।'

মিতু মুখ ভেংচে বলল—'বৌ না ছাই।'

ফিক করে হেসে ফেলে বাবুয়া বলল—'ছাই-উ-উ।' তার চোখে তখনও জল টলটল করছে।

মণিমোহন বলল—'মিতু না ছাতু।'

বাবুয়া বলল—'ছিজ্জি কাতুকুতু।'

মণিমোহন খুশি হয়ে বলল—'যা, বেশ মিলিয়েছ। বলো—বাবুয়াগো বাবুয়া।'

ফস করে মিতু বলল—'মিচ্ছে সাড়া হচ্ছাহয়া।'

—'মিথিচাই।' বাবুয়া রাগে চিৎকার করে উঠে কেঁদে ফেলল।

ভালোমানুষের মতো মুখ করে মিতু বলল—'কি হল? জিভে কামড় লেগেছে?'

—'তুই আমায় শেয়াল বললি কেন?'

—'তুই মাকে কুকুর বললি কেন?'

—'মিথোবাদী।' বাবুয়া চিৎকার করে উঠল—'কখন বললুম?'

—'এই যে ছো ছো বললি।'

বাবুয়া মুহূর্তেক ঘরে গিয়ে তারপর

প্রবীণ চোখে বলল—'আমি কি বলেছি মা করে ডো ডো ? তুই তো বললি বাবুরা মিছে দাড়া হুকাচ্ছে।'

মণিমোহন বলল—'ছাখো, উকিলবাবুর আরগুমেন্ট শোনো। কোন ক্লাস হল ?'

—'ক্লাস ওয়ান'

মিতু বলল—'গ্রেস ফাইন্যাল।' বলেই হেসে লুটিয়ে পড়ল।

কাঁপ দিয়ে উঠত বাবুরাকে হুহাতে জাপটে ধরে কনক বলল—'দূর বোকা, তুই ফেলিস কেন ? মিমিডাই তো সবে ক্লাস টেন—মাধ্যমিক ফাইন্যাল এখনও পাস করে নি। আর তুমি ? তিন বছর প্রিপারেটরি ক্লাসে থেকে নার্সারি ডিঙিয়ে প্রাইমারিতে ভর্তি হয়েছ। একটা ফাইন্যাল তো দিয়েছ।'

মিতু হেসে লুটোপুটি খেতে খেতে বলল—'বোলো না মা, আর বোলো না প্লীজ। এখনও ছ-বছর পরে সেকেণ্ডারি, দশ বছর পরে ইলেভেনথ ক্লাস, বারো বছর পরে ডিগ্রি কোর্স, চোদ্দ বা পনেরো বছর বাদে পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস—তারও ছ-বছর পরে এম. এ. ফাইন্যাল। আমার আর মাত্র ছ-বছর বাকি, ডিগ্রি কোর্স ঠিক ইয়ার্স ধরি হয় তাহলে সাত বছর।'

লোভে বাবুরার চোখ চকচক করে উঠল। মিতুর হিসেব কিছুই তার মাথায় ঢুকল না, শুধু এইটুকু বুঝল সব পরীক্ষা পাস করতে তার অনেক বছর লাগবে—যিমির মাত্র ছয় কি সাত।

কিছুক্ষণ বরাভয়ের কনক ছেলে-মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। মণিমোহনও অবাক হয়ে ভাবছিল ছ-সাত বছর পরে মিতু ইউনিভার্সিটির করিডোর দিয়ে হাঁটবে। ভালোবাসবে কি কাউকে ? মিতু, তখন কি বুঝবি কোন হুওয়া না-হুওয়া সম্বন্ধে আমাদের ভালোবাসার দৃষ্টি তোরা ?

আর, তেষট্টির সেই দিনগুলো ? সমাজতান্ত্রিক দেশ—চীনের মতো মহান আত্মীয়—আক্রমণ যদি না ও শুরু করে থাকে, বর্মাডিলা পর্যন্ত এগিয়ে যে এসেছে—তা তো আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। অস্তিত্বের যে-ভিতকে মনে হত অবিনাশী, তাতে ঘাড়াঘাড়ি ফাটল ধরেছে।

এবং, সেই অভ্রাতপূর্ব সন্ত্রাসংকট-কালে আকাশ-বাতাস ছুড়ে হিংস্র জাতীয়তাবাদের সে কী উগ্র আস্ফালন ! আর ভারতরক্ষা আইন, গ্রেপ্তার, হামলা···। বঙ্গেশ্বর অতুল্য ঘোষ, রাজা, কংগ্রেস সভাপতি, কমিউনিস্টদের সামাজিক বয়কট করার আহ্বান জানিয়েছেন। পার্টি ভাঙ্গ হচ্ছে। সন্দেহ, অবিশ্বাস বাড়ি ছেড়ে অচেনা আলোয় ঘিরে সংসার পাততে হয়েছে। ভোর রাত্তিরে কনক ছুলে চলে যায়। বিরুদ্ধ বা উদাসীন পরিবেশে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো একা ঘরে আমি, সঙ্গী মিতুর কান্না। পড়লা হুধ দেয় না, হুকার খবরের কাগজ। আমার চাকরি নেই করবার কিছু নেই, অথচ দশ হাতে করেও কাজ কনকের ফুরোয় না। একদা লো না মিডল কোন ইনকাম গ্রুপের জন্য হবে স্থির করতে না পারায় ভিত খোঁড়ার পরও সামনের মাঠে সরকারি ফ্ল্যাট তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আজ সেখানে পাড়ার ছেলেরা প্যারেড করে লেফট··· রাইট···লেফট। জানলা দিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে থেকে আমার সকাল কাটে।

তেষট্টি থেকে সাতাত্তর পনেরো বছর ধরে মাঠে কুচকাওয়াজ চলেছেই। আর দিন যায়, নতুন দুখ আসে। আর ছোট হয়, সরকার বদলায়। আর পি পি এম ভাগ হয়, যুক্তফ্রন্ট ভাঙে, বহু কংগ্রেসে ফেরবার জোয়ার। তারপর ভাঙের পাড়াতেও নতুন নতুন মুক্তিসূর্যের আবির্ভাব ঘটে। নতুন টুকরো মণিমোহন বারবার শুরু করে, নতুন ছন্দ দেখে। সি. পি. এম. এফ., পি. ডি. এ. ভক্ত নাম, কত ফ্রন্ট। তারপর একদিন আবিষ্কার করে, খেলা যে জোটে শুরু হয়েছিল—শেষ হল সেখানে নয়, অন্য জোটে।

এই হওয়া না হওয়া পরিবেশেই মিতু বড় হয়, বাবুরা বড় হচ্ছে।

—'চা খাবে ?'

খুশি হয়ে মণিমোহন বলল—'দাও

—'কাগজগুলো বাছলে না ? বিকেলে পাঁচারের আসবে।'

—'চলো যাই।'

গত তিন মাসের রোজকার কাগজ মাস হিসেবে পড়ি দিয়ে বাঁধা আছে। আর আছে ভাগে ভাগে বাঁধা গত এক বছরের বাছাই করা কাগজ—যার একজনও মন্দ হবে না। সব থেকে পাতলা একটা বাক্স মণিমোহন পায়ের ছুই আঙুলে রেখে মিতু না হতেই হাতে তুলে নেয়।

১১ নভেম্বর ১৯৭৬। ৮ কলাম পত্রিকার প্রথম পাতার ওপরে বাঁ দিকে ৩ কলাম ছবি : "বুধ—তিরবার সন্ত্রস্ত গান্ধী ও অধিকা সোনীকে দৌহাটি বিমান বন্দরে কংগ্রেস সেবাদল গার্ড অব অনার দেন।"

স্তব্ধ মণিমোহন ইউনিফর্ম পরা সেই বাহিনীর দিকে তাকিয়ে থাকে। ইতিহাসের সব থেকে কচি

ডিকটেটার—রাষ্ট্রীয় বা দলগত কোনো পদমর্যাদা যার নেই, অথচ যার হুকুমে আসমুদ্র হিমাচল নড়ছে—ভারতীয় রাজনীতিতে মাদিসো স্টাইলের প্রবর্তক যখন সেই ছোঁড়াটি কপালী অম্বিকা সোনীকে পাশে নিয়ে আউট কংগ্রেসের সেবাদল বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করছে।

গান্ধীজীর কোকলা মুখ হাসি আর নেহরুর মপ্রাঞ্জল চোখদুটি মনে পড়ে। এবং কি আশ্চর্য, মৌলানা আজাদের প্রোফাইল। বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের সে ছিল এক অভিজাত চেহারা—সাধারণ মানুষ দূর থেকে যাকে শ্রদ্ধা করেছে, আবার ভালোও বেসেছে। তিনের দশকে এমনকি ভারতের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত যৌবনের বড় এক অংশ নেহরুর মধ্যেই নিজের আইডেন্টিটি খুঁজে পেয়েছে।

কাগজটা ভালো করে খুলে ধরল।

ছবির ডান দিকে বড় বড় হরফে ছাপা—"জনস্বার্থে নেতৃত্ব বদল কাম্য : সঞ্জয়"। রাজ্যে রাজ্যে সঞ্জয়ের পছন্দসই লোককে মুখ্যমন্ত্রী করার পালা শুরু হয়েছে। উত্তর প্রদেশে বহুগুণাকে অনেক আগেই যেতে হয়েছে। এবার লিস্টে ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, হয়তো বা আসাম।

ধীরে সেই সংবাদে এলোমেলো চোখ বোলাতে বোলাতে এক জায়গায় তার দৃষ্টি আটকে গেল : "দেশে সাধারণ নির্বাচনের আশু সম্ভাবনা আছে কিনা—এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে সঞ্জয় বলেন : নির্বাচনটা কোনও বড় কথা নয়। আজ হচ্ছে না কিন্তু আগামীকালও নির্বাচন হতে পারে যদি সরকার এই 'প্যারাটি' পায় যে এই ছোট দেশে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাবে না, (গ্রাখো কাণ্ড, এমন পত্রিকারও ছাপার ভুল!) অর্থনৈতিক প্রগতি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করবে না (শিশুর মতো মুখ ভেংচিয়ে মণিমোহন বলল—না)। বিরোধী দলগুলি ওঁত পেতে আছে নির্বাচনের জন্য। ওরা নির্বাচনে জয়লাভের আশায় দেশের জুড়ে ভয়ংকর গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করবে।

"সমাবেশে অম্বিকা বলেন : যুব কংগ্রেস এখন বড় পরিবার। সদস্য সংখ্যা ৪০ লক্ষ। সঞ্জয় গান্ধীর ডাকে দেশের বহু তরুণ-তরুণী এই সংস্থায় যোগ দিয়েছে, দিচ্ছে।"

ডিকটেটারে কোন নাটক চলবে থেকে শুরু করে পাড়ায় বাস করার অধিকার কার আছে কার নেই, কি কি বাবদ কবে কত টাকা দিতে হবে, স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে কে ভর্তি হবে কে পাস করবে কে চাকরি পাবে, অফিস-কাছারিতে কাজ কার থাকবে কার নতুন হবে, কারখানায় কারা ইউনিয়ন করতে পারবে, গ্রামাঞ্চলে কোথায় কাকে রিলিফ দেওয়া হবে, বি. ডি. ও কিভাবে কাজ করবে, থানা কি দেখবে কি দেখবে না, কারা সমাজবিরোধী হয়ে গেল তার তালিকা—এমনকি মন্ত্রীর প্রোগ্রাম পর্যন্ত···সবই ঠিক করে দিচ্ছে যুব কংগ্রেস। সঞ্জয় গান্ধীর ডাকে ৪০ লক্ষ তরুণ তরুণী যার সদস্য হয়েছে!

মণিমোহন চমকে গেল আটম কলামে ছাপা ইন্দিরা গান্ধীর ছোট একটি ছবির ক্যাপশানটুকু পড়ে। আজ প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন, ৪-এর পাতায় বিশেষ নিবন্ধ বেরিয়েছে—তার বিজ্ঞপ্তি।

যখন বলা হচ্ছে "ইন্দিরাই ভারত", বলা হচ্ছে তিনি "এশিয়ার মুক্তসূর্য"—তখন, তাঁর জন্মদিনে, কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে 'সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতাকেন্দ্র'র কাপান সঞ্জয় গান্ধীর এ কি প্রচার! মহাপ্রলয়! ধ্বনিতেলগণ! সত্য ও স্বাধীনতার মহান ধারক এবং বাহকগণ! জরুরী অবস্থায় অনেক কিছু ছাপার স্বাধীনতা ছিল না একথা ঠিক। কিন্তু না-ছাপার স্বাধীনতা তো কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

৪-এর পাতা খুলল। সম্পাদকীয়র পাশেই তিন কলাম জুড়ে হেড লাইন : "ইন্দিরা গান্ধীর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব।" প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপিত এই বিশেষ নিবন্ধটি লিখেছেন পার্লামেন্টে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত, সঞ্জয় গান্ধীর স্নেহধন্য, দিল্লীর ব্যাঙ্ক মন্ত্রী। এবারের নির্বাচনে স্বয়ং ইন্দিরা যাঁর কেন্দ্রে গিয়ে বক্তৃতা করেছেন।

মণিমোহন পড়তে লাগল : "বামপন্থী দলগুলির অনুসৃত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণার চাঞ্চল্যকর সিদ্ধান্ত সময়োচিত হয়েছে।···

"২০ দফা আর্থনীতিক কর্মসূচীর বহুমুখী প্রয়োগের ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব প্রাণ-স্পন্দনের সাড়া জেগেছে।"···

সাবাস! ইন্দিরা গান্ধীর ষাট বছরে পদার্পণ উপলক্ষে কি অর্থহীন ভাষায় জরুরী অবস্থা ও কুড়ি দফা কর্মসূচীকে সাপোর্ট দেওয়া হল!

এই যে—"সি পি আই অন্তের ব্যাপারে 'নাক না গলালেই ভালো'" ···সঞ্জয় গান্ধী তথা 'সংবিধান-বহির্ভূত

ক্ষমতাকেন্দ্র' সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করায় কংগ্রেসের ভেতর কমিউনিস্ট বিরোধী হুঙ্কার। বিরাট আশা নিয়ে বড় হেডিংয়ে খবর 'নির্যাতিত সংবাদপত্র' হওয়া সত্ত্বেও 'নির্যাতনকারী কংগ্রেস' দলের সততা রক্ষার কি দায়ে পড়া তৎপরতা!

এই যে কুটি নভেম্বর ১৯৭৬। প্রথম পৃষ্ঠায় বাঁ দিকের টপে প্রকাণ্ড ছবি. ক্যাপশান—"শুক্রবার জওহর নগরে যুব কংগ্রেস সম্মেলনে সঞ্জয় গান্ধী, অম্বিকা সোনী ও পঙ্কজ ব্যানার্জি।" যুব কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট আর জেনারেল সেক্রেটারিকে কি অবাধ্যর দেখাচ্ছে উপরেওলা সঞ্জয় গান্ধীর উপস্থিতিতে! পাতার মাঝখানে কুটির কার্টুন। চিড়িয়াখানায় একটি নিঃসঙ্গ গণ্ডার—গায়ে লেখা সি পি আই। আকাশে হেলিকপটার. বাতাসে কাঁকে কাঁকে ইস্তেহার উড়ছে. লেখা—"সঞ্জয় জিন্দাবাদ" "জয় জয় সঞ্জয়" "জয় সঞ্জয়"। বড় হরফে প্রথম পৃষ্ঠারই একটি খবরের হেডিং—"যুব কংগ্রেস আর কংগ্রেসের লেজুড় থাকবে না: সঞ্জয়"।

জাতির ভাগ্য নিয়ে এই সর্বনেশে লাট্টু খেলার বিরুদ্ধে 'অনুশাসন পর্ব'র সেই অন্ধকার দিনে একলা কমিউনিস্ট পার্টি বেরিয়ে হলেও তার সাধ্যমতো প্রতিবাদ জানিয়েছিল—তাই সে গণ্ডার। আর ৪০ লক্ষ তরুণ-তরুণীর সংগঠন যুব কংগ্রেস তাতে কান না পেতে মাফিয়া সর্দারের বাজে জয়ধ্বনি করেছে—ফলে কুটির উল্লাস।

বটেই তো বটেই তো, আজ সব থেকে বড় 'সঞ্জয়বিরোধী' 'কংগ্রেস-বিরোধী' হওয়া যে আপনাদেরই সাজে। জরুরী অবস্থায় সরকারি বিজ্ঞাপনের—জওহাটা বুঝলেন স্যার? টাকার—লেনদেনটা সন্তোষজনক হওয়া সত্ত্বেও, ইন্দিরা অপশাসনের শরিক তো আপনাদেরই বলতে হবে। আপনাদের দুজন সহকর্মী যে জেলে গিয়েছেন। ৭৮-৭৯ সালে কমিউনিস্ট লেখক ও সাংবাদিক অনেককে জেলে ভরা হয়—অবশ্য সে ঘটনা আপনাদের প্রতিবাদ-যোগ্য মনে হয় নি। এই সেদিনও সাংবাদিকপ্রবর সন্তোষ মজুমদারের শিশু নকশালপন্থী বুদ্ধ সরোজ দত্তকে পিটিয়ে মার' হয়েছে। আপনাদের গণতন্ত্র তাতেও ঠেকে নি। এইসব লেখা খবর ছবি কার্টুন ছাপার পরও সি পি আইকে লেজুড় বলা তো আপনাদেরই সাজে।

এই যে ২১ নভেম্বর ১৯৭৬। প্রথম পৃষ্ঠায় মোটা ফলে বক্স করে লেখা হচ্ছে: "এ দেশে এত বড় যুব সম্মেলন এর আগে আর হয় নি এই সম্মেলনে যে ঘোষণা করা হয়, সম্ভবত ভবিষ্যতে তার নাম দেওয়া হবে দিশপুর ঘোষণা। এই ঘোষণায় বলা হয়, সঞ্জয় গান্ধীর ৫-দফা কর্মসূচী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পাকা নক্সা।" আণ্ড ক্রটাস ইজ আন অনারেবল ম্যান।

আর এই সম্মেলন দেখেই তো প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন "আমাদের পালের হাওয়া তোমরা ছিনিয়ে নিয়েছ।" ঐ দিনের কাগজেই এই ঐতিহাসিক ঘোষণাকে ক্যাপশান করে মুগ্ধ কুটির আরেকটি কার্টুন বেরোয়। 'বিশেষ সংবাদদাতা' হেড লাইন করেন: "এই যুব কংগ্রেস সম্মেলন আসলে সঞ্জয়েরই।" তিনি আরও লেখেন—"যুব কংগ্রেসের যুব সম্মাবেশ প্রধানমন্ত্রীকে এতটা মুগ্ধ করেছে যে, প্রধানমন্ত্রী বলে ওঠেন, 'এই সম্মেলন এ আই সি সির অধিবেশনের মতই বড়: হয়ত বা তার চেয়েও বড়।'"

আর ঐ সঙ্গেই বেরোয়—"সঞ্জয় দৃষ্টি ও দৃষ্টান্ত"। তাতে লেখা হয় —"সঞ্জয় গান্ধী দৃষ্টিহীনদের জন্য তাঁর চোখ দান করেছেন তাঁর সঙ্গে যুব কংগ্রেসের আরো ১০০ জন সদস্যও এই চমকপ্রদ দানটি উৎসর্গ করা হয়েছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ৫২তম জন্মদিবসের উদ্দেশ্যে (মৃত্যু হবে— উদ্দেশে)। আজ যুব কংগ্রেসের সম্মেলনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে স্বাগত জানানোর সময়ে শ্রীমতী অম্বিকা সোনী এই চক্ষুদানের কথা ঘোষণা করেন।...বলেন, এই উপহার অন্ধ শিশুদের জন্য। শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে দেশ কতখানি অগ্রগতি করেছে তা যাতে তারা দু চোখ ভরে দেখতে পারে।"

—'চা নাও।'

—'হ্যাঁ?'

—'চা।

কি পড়ছিলে?'

—'দাঁড়াও। আসছি।' কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মণিমোহন উঠে দাঁড়াল। বাথরুমে ঢুকে চোখেমুখে জল দিয়ে ঘরে ফিরে নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল। কনক বলল—'কি ব্যাপার? চা খেতে ইচ্ছে করছে না?'

—'ভীষণ ইচ্ছে করছে।' ছেলে-মেয়ের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে বলল—'খাইয়ে দাও।'

মিতু চোখের ইশারায় বাবুয়াকে ডেকে কানে কানে কি বলল। বাবুয়া দৌড়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

বালিশে বুক চেপে উপুড় হয়ে

শুনে মণিমোহন চায়ে চুমুক দিয়ে বলে উঠল—'ইসসস।'

—'কি হল?'

—'একদো দিন বলেছি তুমি চা করলে এক চামচে চিনি দেবে, আর কোনো বাড়িটাড়ি হাঁদ করে তাহলে লাগবে তিন চামচে। তোমাল ছাত মিতি না?'

মিতু যেন কিছুই শোনে নি, অন্যমনস্কভাবে জানলার দিকে মুখ করে বসল। কনক হেসে বলল—'কেন আমার একটামাত্র মেয়েকে জ্বালাচ্ছ? ভিরে, চা খাবি?'

যেন দৈববাণী শুনছে এমনভাবে মিতু মায়ের দিকে তাকাল। কনক বলল—'মা এক কাপ চা আছে, তুজাপ করে নিচ্ছাব।'

মিতু লাফ দিয়ে উঠে দুহাতে কনকের গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়ল।

—'পড়ে যাস, ছাড় ছাড। কি লক্ষাই হয়েছে মিতুটা।'

—'হেপে, হুযোও।' দুমদাম পা ফেলে মিতু বেরিয়ে গেল। পর মুহূর্তে রান্নাঘর থেকে তার চিৎকার শোনা গেল—'চাই। বাবুকে বলব?'

বাবুয়ার চাপা তর্জন শোনা গেল —'মারব। তোকে দেবো না।'

—'মা! দিদগির দেখে যাও তোমার আদুরে ছেলের কাণ্ড।'

রান্নাঘরে কিছু ছটোপাটি, টুকরো কথা, বাসন সরাবার শব্দ। তারপর মিতু এল—দু-হাতে দুটো কাপ। বাবুয়াকে সাপটে ধরে কনক। তার হাতে খানিকটা আচার।

—'বাবু। তোমার আদুরে মেয়েকে তুমি মারবে কি না বলো।'

—'কেন? কিকরেছে আমার সোনা?'

—'আমাকে চুরি করতে শেখাচ্ছে।'

—'তাই নাকি? তুমি খবর্দার শিখো না।'

—'বা রে। আমি তো ছোটটো। আমার তো না শেখাবে তাই শিখব।'

মণিমোহন হা হা করে হেসে উঠল। কনক মুখে আঁচল চাপা দিল। মিতু পা নাচাতে নাচাতে মেজে করে চা খাচ্ছিল, বলল—'তুমি খোকা, দুধ খাই। হাতের আচারটুকু দিয়ে খাও তো বাছাধন।'

কনক রাগ করে বলল—'ওকে তুই সব সময় দুষ্টুবুদ্ধি দিস, আর বাবুর সামনে সাধু সেজে থাকিস।'

বকুনি খেয়ে মিতু গোঁজ হয়ে বলল, তার পা নাচানো থেমে গেছে।

—'ছাখো না মা, মিলিজাই একটা সেলফিশ আছেটে। দুপ্রতীক কাল আমার ক্যাডবেরি খাইয়েছে। আজ টি ভি তে দেখাবে। ওর জন্য একটু আচার নিচ্ছিলুম। তাই তোমায় ডেকে আনল।'

কনকের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কিছু বা লজ্জায় সে মণিমোহনের দিকে তাকাল। মণিমোহন উঠে ভারি আর গম্ভীর গলায় ডাকল—'বাবা-মোহন।'

এই স্বর এই চেহারা সকলেই চেনে। বাবুয়া একটু আড়ষ্ট হয়ে তাকাল। মিতু তাড়াতাড়ি উঠে হাতের কাপ রেখে কনকের পা ঘেঁষে দাঁড়াল।

—'কাম হিয়ার। এইখানে।'

বাবুয়া আসতে সামনে এগিয়ে এল। তার বা হাতের মুঠিতে কনকের আঁচল।

দেখে মণিমোহনের হাসি পেয়ে গেল, কিন্তু আগের রান্নাঘর মনে পড়ল। দাঁতে দাঁত চেপে কষ্টে হাসি সামলাল। ফলে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। দুর্দান্ত আর অবাধ্য ছেলেটা বাঁশপাতার মতো একটু একটু কাঁপছে, চোখদুটোর মাঝা জানানো অবোধ খরগোসের চাউনি। মণিমোহনের মুখে হাসির বিন্দুমাত্র আভাস দেখলেই কিন্তু সোজা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

—'তুমি আবার দুপ্রতীকের কাছে ক্যাডবেরি চেয়েছ?'

—'প্রমিস বাবু। ও নিজে দিয়েছে।'

মণিমোহন মিতুর চোখ দেখে বুঝল বাবুয়া মিথ্যে বলছে। আবার ধপ করে রেগে উঠে বলল—'কের ভুল কথা? কের বাচ্চাদের সঙ্গে ইংরিজি মেশাচ্ছ? তোমায় না বলেছি দুপ্রতীক দিলেও তুমি নেবে না?'

ঠেলে ফেলে বাবুয়া বলল—'আমার বুকি খেতে ইচ্ছে করে না?'

মণিমোহন কনকের দিকে তাকাল, চোখে চোখ পড়ে যাওয়ায় ভয়ে সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। মিতুর দিকে তাকাল, তার চোখে অনুনয়। কথা বলতে গিয়ে মণিমোহনের গলা ভেঙে গেল, সে বলল—'তোমায় না বলেছি কমিউনিস্টরা ওসব খায় না।'

—'এখন? এখন যে তুমি মিথ্যে কথা বললে?'

মণিমোহন অবাক হয়ে বলল—'মিথ্যে কথা?'

—'অমিয় কাকু মিঠু মা-ও তো কমনিস্ট, আমায় যে ক্যাডবেরি দেয়? রতন কাকি তো যেদিনই আসে হাতে জেমস।'

মণিমোহন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। অনেক কমিউনিস্ট

পরিবারে শিশুরা ছোট্টাপার্থিব মতো রাজনীতির কথা বলে—সবাই উপভোগ করে, তাদের বাবা মার চোখে খুশি ফুটে ওঠে—প্রশ্রয় আত্মপ্রসাদে। মণিমোহন ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করে না কিন্তু আগে কি সে বাবুদাকে শান্তি ছোলটাইমার আর সবসময় তার সমর্থকের পার্থক্যটা বুঝিয়ে বলবে?

—'তুমি ভালোবাসো বলেই ও'কে শাসন। ছোটদের জন্য বড়দের কতকিছুই করতে হয়।' কনক শিক্ষয়িত্রীর ভূমিকা নিল।

—'কিন্তু মা অন্যায় তো অন্যায়।' বলে ফেলেই মণিমোহনের দিকে তাকিয়ে ভিতু ছোট বাবুদা বলল—'কীরে। বড়রা অন্যায় করলেও তো সেটা অন্যায়?'

মণিমোহন বলল—'হুঁ।'

—'তাহলে তোমাকে আমিও কাকু, মিঠু মা আর বহ্নি সবাইকেও শাস্তি দিতে হবে।'

—'কেন?'

কনক বলল—'কিন্তু ও'রা ছোটরা ভাবে বলে তাদের ক্যাডবেরি এনে দেন। নিজেরা খান না অতএব শাস্তি কম হবে।'

স্কেচ : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রদীপ্ত চোখে বাবুদা বলল—'তোমার মাথা। আমিও কাকু নিজে আমার সঙ্গে ক্যাডবেরি খেয়েছে। জানো বাবু, আমিও কাকু না সিগারেট খায়

—'জানি

—'তাহলে আমিও কাকুর তবল শাস্তি হবে।'?

—'কেন?'

—'কমিউনিস্টরা কি সিগারেট খায়?'

—'অনেকেই খায়

—'লেনিন সিগারেট খাওয়ার তো লেখা নি।'

মণিমোহন বুঝল বাবুদা প্রকৃতি বলে কথার পিঠে কথা বলতে বলতেও ঠীক দৃষ্টিতে তার মুখে হাসির সেই প্রার্থিত রেখাটি খুঁজছে। সাত বছরের বালক পিতার মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে এত মাথা খারাব—কে তা বিশ্বাস করবে?

কিন্তু মণিমোহনকে খুশি করার জন্য হাসিমুখে বলল—'বাবুদা বলেছে কমিউনিস্ট হবে।'

বাবুদা ক্ষেপে উঠে বলল—'বাবু কমনিস্ট নয় কক্ষনো কমনিস্ট হব না'

—'তুমি কি হবে?'

—'ইনসানি। ক্যাপেটেন হাডকের সঙ্গে জাহাজে চড়ব তোমরা এখানে বসে বসে চাঁচকল' ডাল খেয়ো। আর জাহাজে কেমন টুটুমি

মাংস খাবে, ক্যাপটেন হ্যাডক মদ খাবে, আমি—'

প্রায় আর্তনাদ করে উঠে মণিমোহন বলল—'কি খাবে?'

কনক হাত দিয়ে বাবুয়ার মুখ চেপে ধরল। মিতু আস্তে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মণিমোহন বলল—'এসব কি কনক?'

শুষ্ক স্বরে কনক উত্তর দিল—''ব্রেকফাস্ট''। কমিকস। তুমি কি দিয়ে কি ঠেকাবে?'

তুমি কি দিয়ে কি ঠেকাবে মণিমোহন? তোপাশবালবর্জিত জীবন বাচ্চাদেরও সেই ভাষে ভাষা হচ্ছে। আগুন একেবারে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেছে

ধরধরে গলায় মণিমোহন বলল—'শোনো বাবুয়া। কারোর থেকে থেকে থাকেও খাওয়াতে হয়। আমরা গরিব, খাওয়াতে পারি না। তাই, নিয়ে খেতেও পারি না।'

—'আমরা মোটেই গরিব না। মা তো ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা আনে। গরিব হল দাশুরা, সে তোমাদের অনেকেই সব টাকা রাখে।'

হেসে ফেলে মণিমোহন বলল—'আমি আরও গরিব, আমার অনেক নেই—মা দু এক টাকা পাই পকেটেই থাকে। রাখো না আমার জামা ছেঁড়া, ছুড়ো তাকি দেওয়া।'

—'মা তোমায় কিনে দিলেই পারে।'

—'টাকা কোথায় পাবে? তোমার মা-র চটিটা দেখেছ? ঐ যে শাড়িটা পরে আছে তাতে—'

—'টাকা তো ব্যাঙ্কে আছে। একশো-কোটি টাকা। বন্ধুক নিয়ে পাহারা দেয়। মা গিয়ে নিয়ে এলেই পারে।'

—'মা-র যত টাকা পাওনা তত-টাকাই আনে। সব কথা তুমি এখন বুঝবে না। শুধু জেনে রাখো—আমরা গরিব, আমাদের—'

বাধা দিয়ে কনক বলল—'কেন ওকে পরিবিদ্যে শেখাচ্ছ। আমরা গরিব হব কেন?'

মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে রাখলেও তার গলায় রীতিমতো ক্ষোভ। বাচ্চা মানুষ করার জন্য নিত মনস্তত্ত্বের বই পড়েছে কনক। সে জানে বাচ্চাদের এভাবে বলতে নেই।

মণিমোহন বলল—'শোনো দু-নৌকোয় পা দিয়ে বেশি দূর যাওয়া যায় না। চারদিকে তারই হাস্যকর চেষ্টা। একই ভুল তোমায় সাজে না।'

—'ভুল করলে শুধরে নিও, কিন্তু দোহাই তোমার, দারিদ্র্য নিয়ে ওদের অহংকার করতে শিখিও না। বড় হয়ে যখন দেখবে এই অহঙ্কারের জন্য সবাই ওদের বোকা ভাবে, বোকা মনে করে, এই বুঝি টাকা চেয়ে বসবে ভেবে এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায়—তখন ছেলেমেয়ে আমাদের অভিশাপ দেবে। আমি চাই ওরা যোগাভাবে বাচতে শিখুক, হেরে না যাক।'

—'কাকে বলে যোগ্যতার সঙ্গে বাঁচা? কাকে বলে হেরে যাওয়া?'

—'ওদের সামনে এভাবে জেরা কোরো না। তোমার দেশ আছে, পৃথিবী আছে, মানবসভ্যতা আছে। রাগ কোরো না লো। এই ছেলে-মেয়ে দুটো আর তুমি ছাড়া আমার যে কিছু নেই।'

—'তোমার দেশ নেই? পৃথিবী নেই? মানবসভ্যতার দায়ভাগ নেই? শুধু এই সংসার?'

—'একে কেন্দ্র করে সব, একে বাদ দিয়ে কিছু নয়। শোনো, জেরা কোরো না। কথায় সব বোঝানো যায় না। আমায় নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এই, কি হল? এই?'

স্থির দৃষ্টিতে কনকের দিকে তাকিয়ে মণিমোহন বলল—'আমি একটু বেরোলাম। তোমরা খেয়ে নিও।'

উঠতে যাবে, ঠিক তখনই দরজার কড়াটা শব্দ করে বেজে উঠল। দ্রুত চোখ মুছে কনক দোর খুলতে গেল। কটিতি বিছানাটা ঠিক করে মিতু এক হাতে চায়ের কাপ অন্য হাতে আচার মুখে বাবুয়ার হাত ধরে ঘর থেকে রান্নাঘরে বেরিয়ে এল। মণিমোহন গায়ে একটা জামা চড়াতে চড়াতে দরজার দিকে কান পাতল। না, কনকের চেনা কেউ আসে নি। তাহলে দুটো-একটা কথা এখান থেকেও শোনা যেত।

—'এই, একটু আসবে?'

বেতকলম স্লিপারটা পায়ে গলিয়ে মণিমোহন দোরগোড়ায় এসে দেখল তিন-চারটি যুবক, না পাঁচজন, ঠাঁয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ও-ছেলেটি আবার কার ওপর নজর রাখছে?

—'আপনি?'

বিস্ময় আর উত্তেজনা মেশানো গলায় কথাটি যে উচ্চারণ করল তার দিকে তাকিয়ে মণিমোহনের চেনা চেনা লাগল। মনটাকে শতধা বিভক্ত করে সে পরিচিতির সূত্র খুঁজতে খুঁজতে কণ্ঠস্বরকে নৈকট্য আর দূরত্বের সূক্ষ্ম সীমায় দাঁড় করিয়ে বলল—'কি হয়েছে?' বলতে বলতেই

তার মনে পড়ে গেল এবং দ্রুত 'ভাই' শব্দটি আপের বাক্যবন্ধে এমন ভাবে জুড়ে দিল যাতে মনে হয় ছেলের বিশেষ মাত্রা যোগ করার জন্যই মণিমোহন 'কি হয়েছে' বলে একটু সময় নিয়ে নিয়েছে।

—'কি আশ্চর্য। আপনি এখানে থাকেন?' ছেলেটির—হ্যাঁ, নামটাও মনে পড়েছে—অবশ্যি এতই প্রকট যে মণিমোহন বুঝল কিছু একটা গোলমাল আছে। তার সঙ্গীতের চোখেমুখে পরিচিতির কোনো সাড়া নেই, কিন্তু অবনের অস্বস্তি তাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে।

—'আপনি তাহলে যোগি? কি যি কিছু মনে করবেন না। কি ভাত বলুন তো?'

কনক অস্ফুটে 'না না ঠিক আছে' গোছের কিছু একটা বলল। তার মুখে হাসিটা সেভাবে ফুটল না সে কি এদের সঙ্গে মুহূর্ত আগের কথাবার্তার জন্য না কি তারও আগের ঘটনার জের?

কিছুটা উদ্বেগের সঙ্গেই মণিমোহন বলল—'কি হয়েছে অবন? তুমি কোথেকে?'

—'বলছি।' যুবক হাতের ইশারায় মণিমোহনকে থামিয়ে দিয়ে বলল—'এ পাড়ায় আপনি কতদিন আছেন মণিদা?'

—'অনেকদিন। কেন?'

—'অনেকদিন? গত বছরের আগের বছর? সেভেনটি ফাইভে এইদিন আপনি কোথায় ছিলেন মনে করতে পারেন?'

মণিমোহন অবনের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আস্তে আস্তে তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল।

মণিমোহন উত্তর দিল না দেখে কনক আঙ্গ ঝাড়িয়ে বলল—'আমি পারি। এইখানেই ছিলেন। কেন, কি হয়েছে?'

—'এক গ্লাস জল খাওয়াবেন বৌদি?'

কনক বলল—'আসুন না, ভেতরে এসে বসুন।'

—'না বৌদি। আজ থাক।'

একটু ইতস্তত করে একবার মণিমোহনের দিকে তাকিয়ে কনক ভেতরে চলে গেল। নিজের বাড়ির চৌরগোড়ায় কি কনক আমায় একলা রেখে যেতে ভয় পাচ্ছে? মিতুকেও ডেকে জল দিতে বলার তরসা পেল না? সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। মাগো তোমায় ভালো-বেসে। মাগো তোমায় ভালো-বেসে। মাগো···

—'বুবাইকে আপনি চেনেন?'

—'আহ্, পরে। মণিদা, শুনুন ঐ মোড়ে দাঁড়িয়ে আপনাকে দুটো কথা বলব।'

—'এখানেই বলো না।'

—'বৌদির সামনে বলা যাবে না।'

ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে নিল। মণিমোহন বলল—'এদের একটু এগিয়ে দিয়ে আসছি।'

—'জামাটা বদলে নেবেন না?'

—'ঘুরে যেতে চাও?'

—'না না, এই মোড়টায়। একটা চায়ের দোকান আছে না!'

—'আমি কিন্তু চা খাব না।'

—'কিছু একটা খাবেন।'

—'না।'

অবন হেসে বলল—'বেশ, এমনিই বসবেন আসি বৌদি।'

মণিমোহন কনককে আশ্বস্ত করার জন্য মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে বলল—'চটিটা নিয়ে এসো।'

বেরোবার মুখে মুখে হাসিয়ে হাল্কা গলায় বলল—'এখুনি আসছি তোমরা চায়টায় করে নিও।'

অবন আবার বলল—'আসি বৌদি।'

নিঃশব্দে ওরা রাস্তা হাঁটছিল. নিঃশব্দেই চায়ের দোকানটায় ঢুকল। কতগুলি ছেলে ওই কোণটায় বসে গুলতানি করছিল। একজন চেঁচিয়ে বলল—'ওর নাম চরণ সিং। সব কটাকে জেলে ঢুকিয়ে তবে ছাড়বে।'

আরেকজন বলল—'মেলাই চাঁচাস না, কটা মাস যাক, দেখে সবাইকে ট্রীপ পরিয়ে! সামনের বছর ওই সময় কোথায় থাকিস দেখব।'

মণিমোহনের বুকের ভেতরটা শির শির করে উঠল। একটা মেয়েলি গলা প্রশ্ন করছে—গত বছর এই দিন কোথায় ছিলেন? একটা ভারি গলা আঙুল উঁচিয়ে বলছে—মনে রাখবেন, সামনের বছর, এই তারিখ।

কোথায় ছিলেন, মণিমোহন? এই দিন—গত বছর, তার আগের বছর? একটু আগে অবন জানতে চেয়েছিল। এই ছেলেটিও বলল। দাও, কৈফিয়ৎ দাও। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র যখন মা আর ছেলের বংশগত জমিদারি হয়ে উঠল—মোটা দেশ জুড়ে সংশোধিত সংবিধান মাফিক স্বৈরাচার, যখন সংবিধানের লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র স্থান পেল আর দেশ জুড়ে পুঁজিবাদ কেন্দ্রীভূত হল, যখন কয়েকজন একচেটিয়াপতি জরুরী অবস্থার কটা মাসে কোটি কোটি টাকার সম্পদ বাড়াল আর মার্কিন মাল্টি-ন্যাশানাল নতুন উদ্যমে ভারতে প্রবেশ করল···তখন, কোথায় ছিলে মণিমোহন? কি করছিলে?

—'দূর্বাকে আপনি চেনেন?'

—'হ্যাঁ?'

—'দুবার বললাম, তবু প্রশ্নটা বুঝতে পারছেন না?'

যেন ক'ড়ুনি খেয়ে মণিমোহন জেগে উঠল। শান্ত গলায় বলল—'কাকে বলছেন?'

মণিমোহনের জিজ্ঞাসার ধরনে যে আভিজাত্য ছিল, তার সামনে যুবককে নত হতে হল। অবন ঢোক গিলে বলল—'আই টুবলা। আমি কথা বলছি।'

—'কি হয়েছে অবন?'

—'মণিদা, টুবলার বোন দূর্বাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা তার খোঁজে বেরিয়েছে।'

প্রায় হতভম্ব হয়ে মণিমোহন বলল—'এইজন্য আমায় ডেকে আনলে?'

অবনের তোতলা বলল—'হ্যাঁ, এই জন্যে

—'কিন্তু আমি তো তাকে চিনি বলে মনে হচ্ছে না? কে দূর্বা, কোথায় থাকে, বয়েস কত, করে কি?'

—'ওর ভালো নাম দূর্বা।'

মণিমোহনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—'চমৎকার নাম।' তারপর অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে বলল—'কিন্তু ও নামে কাউকে আমি তো···' বলতে বলতেই তার মনে হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। দূর্বা। কৃষ্ণচূড়া। 'চিনি না' এই দুটি শব্দ উচ্চারণ করা মণিমোহনের পক্ষে আর সম্ভব হল না।

পাঁচ জোড়া কৌতূহলী চোখ নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। মনে হল চৈতন্যের ভেতরটাও থামতে শুরু করেছে। কেন হঠাৎ ভূত দেখে ফেলেছে—একই সঙ্গে ভয় আর বিস্ময়। লজ্জাও। কিন্তু সে তো পঁচিশ বছর আগের কথা, উঁহু নাতাশ—ফিফটি ওভার। কোথায় আছে কেমন আছে দূর্বা? মনে তো হয় তখন এরা কেউ জন্মায়ই নি। নিশ্চয় অন্য কারোর কথা বলছে।

বহু বছরের আভাসে অর্জিত শিক্ষায় নিজের মুখভাব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রেখে মণিমোহন বলল—'একটু ভেঙে বলো।'

—'এই হাতের লেখাটা চেনেন?' এক তাড়া চিঠি অবনের হাতে, একটা এগিয়ে দিল।

হ্যাঁ, দূর্বাকে লেখা চিঠি, সন্দেহ নেই। সত্তর বছরের ভারিখ। মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে মণিমোহন বলল—'না।'

—'এইটা?'

ঠিকানার দিকটা মেলে ধরেছে—দূর্বা সরকার, তিনের এ বনমালী ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা। যাক, নিশ্চিন্ত। মণিমোহন অবনের চোখে চোখ রাখল। ওর ঠোঁটের কোণে হাসি কেন? টুবলার দিকে তাকাল কেন? টুবলার চোখে—না, হাসি নেই, একটা অন্ধ রাগ। মাই গড! ও কি ভেবেছে আমি সত্যিই ওর বোনকে ইলোপ করেছি?

মণিমোহন বলল—'না।'

—'এইটা?'

লাইন টানা ভারি নীলচে প্যাডের একটা পাতা অবন চোখের সামনে পেতে ধরল, তারপর মুহূর্তেক পরে আলগোছে সরিয়ে নিয়ে বলল—'স্যরি। এটা নয়।'

কিন্তু তার মধ্যেই মণিমোহন অত্যন্ত দেখে ফেলেছে কনকের হস্তাক্ষরে লেখা চিঠির এই অংশটুকু— "সুমন, আমার সুমন, কেন এত কষ্ট দিচ্ছ?"

নাড়িছুঁড়ি পাক দিয়ে প্রচণ্ড বমনের কান্না উঠে আসছে। পেটে হাত চেপে কাশতে কাশতে মণিমোহন সামনে ঝুঁকে পড়ল।

অবন দলবাবুকে বলল—'আপনার কি গ্যাসট্রিক আছে? নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। কিছু বলি?'

ঘাড় নেড়ে নিষেধ করে কষ্টে মণিমোহন বলল—'এক গ্লাস জল।'

কনক, আমার কনক। কাকে চিঠি লিখেছে, কবে? ক'পিসে পড়ে চিঠিটা কেড়ে নিতে ইচ্ছে করছে—পড়তে। অন্তত তারিখটুকু যদি দেখা যেত! তখন কি আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে? সুমন···আমার সুমন···কোথায় যেন···

জল খেয়ে জামার হাতায় মুখ মুছে সুস্থ হয়ে বসতে একটু কুণ্ঠিত স্বরে অবন বলল—'আরেকদিন আসব আমরা?'

—'বলো না। ঠিক আছে।'

—'এইটে দেখুন তো?'

নিজের লেখা একটা বড়সড় চিঠি হাতে নিয়ে মণিমোহন স্থির চোখে অবনের দিকে তাকাল। তোতলা দুটো শব্দ হতে চাইছে বুকে মুখে একটা নরম হাসি ফুটিয়ে বলল—'চেনা চেনা লাগছে। পড়ব?'

—'পড়ুন।'

বাড়ির ঠিকানা, তারিখ ছাব্বিশে জুন উনিশশো পঁচাত্তর। মাই গড, যেদিন জরুরী অবস্থা জারি হয়েছিল। রেডিওর খবরটা শুনে পার্টি অফিসে চলে গেলাম। মনে পড়ছে, দিনটা স্পষ্ট মনে পড়ছে। দ্রুত পাতা উল্টে স্বাক্ষরটি দেখে নিল। অবিকল তার হস্তাক্ষরে লেখা আছে—"ইতি। তোমারই চিরকালের মনীষী।"

আবার ঘোড়া থেকে পড়তে শুরু করল "দুর্বা" আমার রানী (মণিমোহনের গা দুলিয়ে উঠল। চিরকাল সে চিঠিতে কনককে কনক বলেই ডেকেছে) অবশেষে মরুভূমিতে বৃষ্টি নামল। আমার জীবনের আজকের তারিখটি সবুজ কালিতে লেখা থাকবে। এই প্রথম তোমার মুক্তমালার স্পর্শ পেলাম। সমস্ত বিকেল এক দণ্ডে গলার ধারে ঘুরেছি, কখনোই তোমার কাছে হারসেট প্রহরীর বেশি মর্যাদা দাবি করি নি। প্রত্যাশাবিহীন আমার ভালোবাসা কবচ-কুণ্ডলের মতো তোমাকে আগলে রেখেই তৃপ্ত ছিল। জানতুম না সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় চরাচর যখন অলীক, প্রায় মুহূর্তুর—কেমার বোবা কামান দুটোকে সাক্ষী রেখে আমার রাজেন্দ্রাণী ঠিক তখনই তার বিনামূল্যে কেনা দাসকে শুধু কামনার এমন স্বীকৃতি দেবে···

লজ্জায় মাথা তুলতেই অবনের চোখে চোখ পড়ে গেল। হাসছে! হ্যাঁ, কোনো ভুল নেই। বিনটু না কি যেন নাম ওই ছেলেটির, তথাকথিত দুর্বার ভাই—তারও গোয়ার চোখ দুটোতে, হ্যাঁ, হাসি।

চায়ের দোকানের কেবিন, পর্দা তোলা। প্রখর আলোয় চরাচর ভেসে যাচ্ছে। হলের দুটো-একটা টেবলে মানুষ—চায়ের কাপ, ব্যবহারে ব্যবহারে মলিন সংবাদপত্র। পাশের পর্দাফেলা কেবিনে একটি মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল—গলাটা আর-একটু হলেই মিষ্টুর হতে পারত। পথে মানুষ মোটর গাড়ি বাসের ভেঁপু সাইকেলের বেল। খোলা-মেলা চায়ের দোকানের এই আঁকাড়া প্রকাণ্ডতার মধ্যে বসে হঠাৎ লঙ সিনেমা হোলের উঁচার-চেয়ার আর জিজ্ঞাসাবাদ মনে পড়ছে কেন?

মিষ্টু নয়

মিষ্টুকে বাড়িতে দেখে এলাম। মনে পড়ছে, বিনটু নয়, টুবলো। মাই গড। 'দুরুখারা'—"তুমন আমার তুমন"। ছাত্রজীবনে কনক ডায়রি লিখত, ভালোবাসার কথা মুখ ফুটে বলতে পারে নি তাই সমস্ত ডায়রি খবরের কাগজে মুড়ে বাড়িতে মার কাছে রেখে গিয়েছিল, যেন ক্লাস নোট। হতে পারে 'দুরুখারা' পড়ে বা দেখে কনক কোনোদিন ডায়রি লিখেছিল বা. এই চিঠিটার মতো কেউ হয়তো কনকের লেখাও জাল করেছে। আমি তো জানি, জানি, দুইটাপা আমাকেই প্রথম ভালোবেসেছে।

কিন্তু মজা জাখো, প্রায় কোয়ার্টার সেঞ্চুরি পর নিরিবিলি মন-জানাজানির পর কাকে, নিজে কি ভাবতে বসেছ! এইভাবে, ঠিক এইভাবে একদিন নিজেকেও তুমি আর বিশ্বাস করবে না।

প্রবল আত্মধিক্কারে মণিমোহন নড়েচড়ে বসল। তারপর যেন কিছুই হয় নি এমন একটা ভাব দেখিয়ে হাই তুলতে তুলতে চিঠির পাতাটা ওলটাল।

একি? এসব কি লিখেছে? কে লিখেছে? ত্রিশ বছর আগে কিশোর মণিমোহন একটি কিশোরীকে, দুর্বাকে, মনে মনে যে কথা বলত—মুখ ফুটে যা কোনদিন উচ্চারণ করতে পারে নি—হ্যাঁ, মনে পড়ে যাচ্ছে, আহ্ আহ্ আহ্ ···কোন গহীনতলে লুকিয়ে ছিলে অমোঘ এই স্মৃতি-মালা···অন্যে জেনে যাবে ভয়ে কোনোদিন যা লিখতে সাহস পাও নি···কোনোদিন না ···আহ্ আহ্, আহতের মণিমোহন, কেন তুমি কনকের মুখটাও মনে করতে পারছ না?

—'পড়লেন?'

—'হুঁ।' মণিমোহন চিঠিটা শান্তভাবে ফেরৎ দিয়ে বলল—"হাতের লেখা অনেকটা আমার মতো, কিন্তু আমার নয়।'

—'ঠিকানা আপনার, নামটাও লেখেছেন—মনীষী, বেশ কাছাকাছি।'

—'দেখেছি।'

—'চিঠির তারিখটা দেখেছেন? বাড়িতে ঐ জন্যেই আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম পঁচাত্তর সালের এই সময়টা কোথায় ছিলেন।'

—'বুঝেছি।'

—'আপনি কিন্তু মনে করতে পারলেন না।'

—'মনে করার চেষ্টা করি নি।'

—'বৌদির কিন্তু মনে আছে।'

অবনের বৌদি সম্বোধন কানে ছ্যাঁকা ধরিয়ে দিল যেন। মনে মনে বলল—হায় হতভাগিনী! দুপুরে কনকের মুখটা মেঘের আড়াল ভাঙা চাঁদের মতো তার সমগ্র অস্তিত্বে মিষ্টি আলো ছড়িয়ে দিল। মণিমোহন নিজেকে সম্পূর্ণ ফিরে পেল।

—'চিঠিটা লিখেছেন বলেই মনে করতে চান না।'

যে তিনজন আগাগোড়া মূর্তির মতো নীরব ছিল, তাদের একজন অলক্ষ্যে মেয়েলি গলায় বলে উঠল। মণিমোহন বুঝল যাবার আগে এ-ই তাকে ভারি গলায় শুভ দেখাবে।

জিভে আক্ষেপের শব্দ তুলে অবন বলল—'ছি মণিদা। বয়েস হয়েছে, বাড়িতে এমন বৌ-বাচ্চা, সবাই আপনাকে শ্রদ্ধা করে। আপনার এই কাজ?'

এক ঝোরা শীতে মণিমোহনের ভেতরটা কাঁপতে লাগল। কনকের চোখ দুটো মনে পড়ছে, মিতুর নিষ্পাপ মুখ! হাতের লেখায় খুব মিল আছে। বিশেষজ্ঞ যে সত্যি কথা বলবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। তাছাড়া মুখে মুখে চান্স যা হবার সে তো আগেই হয়ে যাবে। স্নায়ুর শক্ত পাছে ওঠে, কেজার বেঁচে ওঠে আকাশে। হয়তো সে নিজেই একদিন বিশ্বাস করে বসবে চিঠিটা আসলে তারই লেখা। ভেনিসে তো দেখেইছে নাকউঁচু নুকাষের এক ঠাট্টার চোটে আচিনের জীবনে কতবড় বিপর্যয় ঘটে গেল। রাইট ব্রেদার্স ছিল, ব'লে কেউ কিরে অভিমানে লেখা ছেড়ে দিল। তাতে অবশ্য বিশ্ব ছুনিয়ার কিছুই আসে যায় নি। আমি লম্পট নই অথচ কনক আর মিতুকে তা বোঝাবার জন্য যদি চিঠি লিখে রেল লাইনে ফেলে দিই—এতবড় পৃথিবীর কি তাতে যাবে আসবে!

মাই গড। আত্মহত্যার কথা ভাবছি! আমি! সম্ভবতেলীদের মধ্যে চিরকাল দাগাঠ'ুরের ভূমিকায় অভিনয় করে আজ এই দুধের বাচ্চার ব্ল্যাকমেইলের সামনে দাঁড়িয়ে সুট-সাহিত করার চিন্তা!

মাইরি মণিমোহন, তুমিই বটে স্বার্থপর। এতদিন যা কিছু ত্যাগ করেছ সবই তাহলে নিজের সুনাম রক্ষা আর ইমেজ সৃষ্টির জন্য। আদর্শের তাগিদ কিছু ছিল না। একান্ত স্বার্থ-পরের মতোই তথাকথিত নিঃস্বার্থ জীবন কাটালে, নিজের ভাবমূর্তি অম্লান রাখতে- এমনকি বৌ-বাচ্চার ভবিষ্যত পর্যন্ত বলি দিলে। মেসের পার্টির সংলাপের এই ঘোর দুঃসময়ে তাই শুধু অনায়াসে সরে পড়ার কথা ভাবছ

আস্তে আস্তে চোয়াল শক্ত হল। নিজেকে এক ধিক্কার দিয়ে মণিমোহন বলল—বুড়ো ধাম! ঢের ফাকামি হয়েছে, এবার বাড়ি চলো।

—'কি হল? উঠছেন যে?'

একটুখানি হেসে মণিমোহন বলল—'যা, বাড়ি যেতে হবে না?'

—'দুর্বার কি হবে?

—'শোনো, এক কাজ করো। ঐ যে মোড়টা দেখছ—ওর বাঁদিকে গিয়ে ডানহাতি একটা ইউ সেপড রাস্তা পাবে, সেইখানে আমাদের থানা। সোজা চলে যাও।'

—'থানায় কি হবে?'

—'ডায়রি করো একটা মেয়েকে তো আর চাপিয়ে মেরে দেওয়া যায় না।

—'ঠাট্টা করছেন?. বাড়ির জেলেজারি থানায় জানাব? তার আগে বরং আপনার পার্টি অফিসে যাব

—'চলে যাও, ট্রি-বি বাসে একেবারে সামনে গিয়ে নামতে পারবে।'

—'কাল তো আপনাদের রিভিউ মিটিং আছে, তখন যাব?'

চমকটা সামলে নিয়ে মণিমোহন বলল—'আছে নাকি? যাওয়া না-যাওয়া তোমার ব্যাপার।'

মরিয়ার মতো অবনী বলল—'আপনাকে শ্রদ্ধা করতুম, তাই বলছি। ভুল আমাদেরও হতে পারে, কিন্তু আপনার হাতের লেখা জাল করে কে চিঠি লিখবে—কেনই বা লিখবে? আপনি ভাবুন। আমরাও আরেকবার খোঁজ নি। কাল দুটোর সময় ইউনিভার্সিটি গেটে দাঁড়াবেন। তারপর কোথাও গিয়ে বসা যাবে।'

—'সম্ভব হবে না।'

শুধু বলতে বলতে ওরা বাইরে এলো। বাসস্টপে ছাড়া ছাড়া মানুষ, পানের দোকানে বিবিধ ভারতী, সিগারেট ঠোঁটে এক ভারতীয় রমণী কনস্যালেটের নাম্বার প্লেট দাঁটা দামি গাড়ি চালিয়ে মুহূর্তে উধাও। রাস্তার ধুলো শুরু হচ্ছে। ফুটপাতের ঐ কোণে অস্থায়ী খোঁটায় বাঁধা খোলা ছাতার নিচে বসা টাকমাথা ছাতু-ওলাকে অর্ধবৃত্তের আকারে ঘিরে উবু হয়ে বসে মধ্যাহ্নভোজ সারছে কয়েকজন হামরে ঠেলাওলা। ফুটপাত ঘেঁষে কয়েকটা খালি ঠেলা-গাড়ি গায়ে গায়ে দাঁড় করানো, যেন কটা উর্ধ্বমুখ জিরাফ চড়া রোদে বসে এক পোঁটা ছায়ার জন্য ফাকাশে তালিমারা খোলা ছাতাটার দিকে সতৃষ্ণ তাকিয়ে আছে।

অবন হেসে বলল—'আমাকে শক্ত ভাবছেন, পরে বুঝবেন আমি ভালোর জন্যই এসেছিলাম।'

বড় রাস্তা থেকে তার বাড়ি যাওয়ার পথ যেখানে শুরু হয়েছে সেই মুখের আশপাশটা চকিতে দেখে নিয়ে মণিমোহন একটা জায়গা বাছল যেখানে ছায়া আছে লোক নেই, দাঁড়িয়ে কথা শেষ করা যায়। যেন বাড়ি যাচ্ছে এমন একটা ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করে যেন উত্তর দেওয়ার জন্যই সেই জায়গাটিতে পৌঁছে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—'ব্যস্ত হয়ো না।'

অবনও দাঁড়াল। তার সঙ্গীরা চোখের পলকে চারিদিকটা জরিপ করে একটু ছাড়া ছাড়া ভাবে দুজনকে

ঘিরে দাঁড়াল। অবন বলল—'আপনার শরীরের এই অবস্থা, তার ওপর শুনছি সি পি আই হোলটাইমারদের ওয়েজ—ঠিকমতো দেওয়া যাচ্ছে না, সংখ্যা কমানো হবে। নাইবা গেলেন কাল মিটিংয়ে, ফালতু ঝামেলা।...'

কঠোর স্বরে মণিমোহন বলল—'চুপ করো। তোমার স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত হচ্ছি।'

—'না, তাই বলছিলাম। এক বছর পরে আবার আমরাই তো ক্ষমতায় আসব। অ্যান্টি ক্যাসিস্ট কনফারেন্স করার জন্য আমাদের অফিসে গিয়ে তখন আপনারাই তো আবার ধরনা দেবেন।'

—'না, আসবে না। আমরা চাই না আবার কংগ্রেস একচেটিয়া ক্ষমতা দখল করুক। হ্যাঁ, কখনো-সখনো কারো কারো কাছে হয়তো যাব—তবে ধরনা দিতে নয়। কোনোদিনই যাই নি। যেতাম এবং যাব আন্দোলনে টেনে নামাতে···অবিশ্যি পার্টি যদি চায়। তোমাকে অবশ্য এসব বলা বৃথা। কিন্তু হ্যাঁ, অবন, ফিরে পড়লে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে তো? টাকাপয়সা সবই যে এখন জনতা পার্টি পাচ্ছে।' নিচুর হাসিতে মুখ ভরিয়ে মণিমোহন ফিরে ফিরে বলতে লাগল—'তোমার সেবাব্রত দাদা, বালিগঞ্জের মুক্তি-উল্কা, তো পার্লামেন্ট ইলেকশনের আগেই মহান জননায়ক আখ্যা দিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র সেন মশাইকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করতে চেয়েছিল। হাতে ধরে যে রাজনীতিতে এনেছে, নাকি প্রিয়তম দাদা—নিজেদের সেই যোগ্যতম প্রার্থীকে হারিয়ে দক্ষিণ কলকাতার অপরিচিত জনতা ক্যান্ডিডেটকে ভোটার সুযোগ করে ফিরে সেবাব্রত তো এরই সঙ্গে লড়ছ গান্ধীর নিমকের দাম দিয়েছে, আবার—'

অবন বাধা দিতে ভিক্ত স্বরে কিন্তু সে'জন্য বজায় রেখে বলল—'তাহলে কাল কমিউনিস্ট ঐক্যের পতাকা আপনি ওড়াচ্ছেনই। কিন্তু প্রমোদ দাশগুপ্ত তো আপনাদের বামপন্থী বলেই মনে করে না। বেচারা সি পি আই!'

মণিমোহন হেসে বলল—'কমিউনিস্টদের কারো সার্টিফিকেটের জন্য বসে থাকে না, ইতিহাসও। শাসক বামফ্রন্টের দুটি প্রধান শরিক দল ১৯৬২ সালে বামপন্থী তো দূরস্থান দেশদ্রোহী বলে সি পি এমের শাস্তি দাবি করেছিল ৬২-৭০ সালে যুক্তফ্রন্টের শরিক হিসেবে সি পি এমের বিরুদ্ধে প্রস্তাবের পর প্রস্তাব নিয়েছিল আজ কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট চালাচ্ছে, কমরেড জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে মিলে-মিশে মন্ত্রিত্ব করছে

—'আপনি আশাবাদী বটে!' বিদায়ের আগে করমর্দনের জন্য অবন ডান হাত বাড়িয়ে দিল। মণিমোহন তার দুই হাত জুড়ে নমস্কারের একটা ভঙ্গি করল। অবনের প্রত্যাখ্যাত হাত আস্তে ঝুলে পড়ল। কয়েক পা হেঁটে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই হাতটাই হঠাৎ শাসানির ভঙ্গিতে উদ্যত করে বলল—'সেবাব্রতদা? বুঝি ভেবেছেন এখনও তার চামচা আছি? মিনিস্টার বনে বড্ড হেলার হয়েছিল। ইলেকশনে দিয়েছি ফরসা করে। যে জন্যে দাদাকে মেরেছিল, সেই অস্ত্রেই ভাইও খতম। কিন্তু আপনার যোগ্যতম প্রার্থী সর্বজনশত্রুর ওই দাদাটি? বোনের বিয়ের দেড় লাখ খরচ করে নেতাজী সেজে বসে আছেন, সঞ্জয় গান্ধীর লাথি খেয়ে অ্যান্টি ফকাস হয়েছেন—ও'দার জন্যে ভিজে তো এখনও জল পড়ে দেখছি।' নিচুর হাসিতে মুখ ভরিয়ে অবন ফিরে ফিরে বলতে লাগল—'বেচারা সি পি আই! বলার মতো একটা প্রোগ্রেসিভ তো চাইই। কিন্তু এই বলে গেলুম—মনে রাখবেন আজকের তারিখ। এক বছরের মধ্যে রাজ্যে সি পি এম নকশাল জেগে যাবে, স্টেটসেন্টার কনফ্রন্টেশন শুরু হবে, কেন্দ্রে জনতা পার্টি ভাঙবে। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবেন··· আচ্ছা, সেকথা এখন থাক। কিন্তু আপনারা? নতুন এই শক্তিসমাবেশে (অবনের মুখে শব্দটা শুনে মণিমোহন বাস্তবিকই চমকিত হল) আপনারা কি করবেন? জনসংঘ একটা সেন্টার হবে, তিন কংগ্রেস মিলে হবে আরেক সেন্টার। ইন্দিরা গান্ধী একাই থাকবে একটি সেন্টার হয়ে—কিন্তু সেখানে নানা পরস্পরবিরোধী ব্যক্তি ও শক্তি জোট বাঁধবে। তিন কমিউনিস্ট পার্টি আপনারা কিন্তু ততদিনে আরও কয়েক ভাগ হবেন। নিজের নিজের সাইনবোর্ড টিকিয়ে রাখার জন্য বুর্জোয়াদের মধ্যেই সংগ্রামী বন্ধু—আমুন, কোনো বক্তৃতা করার চেষ্টা করবেন না, যা বলছি শুনুন চুপ করে—একবার এদের মধ্যে একবার ওদের মধ্যে, আপনারা ওদের মধ্যে তো ওরা এদের মধ্যে লড়াইয়ের সাধ মিটিয়ে বেড়াবেন।' তাদুতে জিভ ঠুকে আক্ষেপ সূচক শব্দ করে অবন তার শেষ তীর ছুঁড়ল—'চ্চু চ্চু চ্চু, ক্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর। তারপর? আবার সব ঠিকঠাক

চলবে। সি পি আই টেলিফোনে সমাজতন্ত্র আনবে, সি পি এম ওয়েস্ট বেঙ্গলে বরাই ধরুরকে হুকুম দিয়ে আর অন্য সব জায়গায় নরম-গরম বিবৃতি ছেড়ে গণতন্ত্র রক্ষা করে ফেলবে, নকশালরা শ্রেণীশত্রু হিসেবে এ ওকে দল থেকে তাড়িয়ে দেশে ঘাওয়ার ব্যবস্থা করবে। আচ্ছা, চলি। দেখা হবে।'

অবনের ইঙ্গিতে ওর সঙ্গীদের একজন বিচিত্র ভাষায় সিটি দিয়ে হাত নাড়ল, একটা দ্রুতগামী ট্যাক্সি একটু দূরে শব্দ করে দাঁড়িয়ে পড়ল দৌড়ে সবাই লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠল।

ট্যাক্সি চলে গেল।

কে অবন? পুরো নাম কি? প্রথম কোথায় দেখেছিলাম? কবে?

পঁচাত্তর সালে অ্যান্টি-ন্যাশনাল কনফারেন্স উপলক্ষে সেবাব্রতর সঙ্গে ঘন ঘন দেখা হয়। ফলে, অবনের সঙ্গেও। অবন সেবাব্রতর চামচা। কি অদ্ভুত এই শব্দ—বঙ্গের চিত্রজগৎ থেকে আমাদের রাজনৈতিক দুনিয়ায় বদলা-বদল করেছে। এখনকার নেতারাও তো এক-একটি কিন্নর্টার। বাড়িতে অবনকে প্রথমে চিনতে পারি নি, ভেবেছিলাম পাড়ার ছেলেরা চাঁদা চাইতে এসেছে। তারপর কিছুক্ষণের কথাবার্তায় দেখলাম-স্মিষ্ট বুদ্ধিমান এক যুবক। টি-শর্টে মনে হল মাস্তান। শেষে বোঝা গেল একেবারেই গভীর জলের মাছ।

আজো কি কংগ্রেস করে? কোন ফ্যাকশন? কার লোক ও? কে পাঠিয়েছে? স্পাই-টাই নয় তো? কিন্তু কেন? পার্টির আমি সাধারণ একজন হোলটাইমার। কেন চাইছে ভয় দেখিয়ে ভুল বুঝিয়ে আমার সব কিছু গুলিয়ে দিতে?

কিন্তু, তুমি তো জানতে মণিমোহন আজ সেই ঘুম যখন মানুষ চাঁদে হাঁটছে, গুরুত্ব সংকেত পাঠাচ্ছে। দারিদ্র্য আর নিরক্ষরতার পুরুষানুক্রমিক ঘোমটা টেনে রেখেই উন্নয়নশীল ভারত তার মাটিতে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে পেরেছে। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের মরোদ্ভিক ক্ষমতা যে শাসকশ্রেণীর করায়ত্ত—এ গূঢ় সমাচার তো তোমার অজানা ছিল না।

তুমি তো জানতে মণিমোহন কিছুই আর গোপন নেই, থাকতে পারে না। তোমার মস্তিষ্কেই আছে সেই শক্তিশালী ট্রান্সমিটার যা এমন কি তোমার চিন্তা তোমার ঘরকেও প্রকাশ করে দেয়। তুমি তো জানতে মণিমোহন সব চুরি হয়ে গেছে, হয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্র নামে এক সর্বগ্রাসী যন্ত্র প্রতিটি মুহূর্ত তোমাকে পাহারা দিচ্ছে। শুধু তুমি কিছু জানতে পাও না। জানতে পারো নি জরুরী অবস্থার উনিশ মাসে দেশজুড়ে সত্যিই কি হচ্ছিল। জানবে না কবে আর কিভাবে দেশটা বিদেশ হয়ে গেল।

মন্থর পায়ে, কিছুটা খুঁড়িয়ে, মণিমোহন বাড়ি ফিরছে।

অবন এই একটা উপকার করে গেল। আমার চিন্তাপ্রবাহকে যে সেই কিশোর বয়েস থেকেই পাহারা দেওয়া হচ্ছে—স্বপ্নেও তা ভাবি নি।

মণিমোহন বড় দুঃখে হাসল। অর্থাৎ, কলেজ পালিয়ে সেই যে আমি আর কনক মাঝে মাঝে একা হয়ে যেতাম—আমাদের সেই একান্ত আর গোপন মুহূর্তগুলিও তাহলে প্রকাশ্যই ছিল! যদি কোনোদিন এ গূঢ় সংবাদ কনক পায়, ও কি সহ্য করতে পারবে?

আস্তে আস্তে চোরাল শক্ত হল। অসম বিকাশের এই দেশে যেমন তেমন একটা ঘরের অভাবে খোলা ফুটপাতে রাস্তার কুকুরের মতো পুরুষ রমণী সংসার পাতে—তাড়া খেতে খেতে, নানা ধরনের চাউনির সামনে, হতমান জীবন কাটায়। তোমার একটা ঘর ছিল মণিমোহন—বৌ-বাচ্চা নিয়ে তোমাকেও সেখানে অকারণ হতমান জীবন যাপন করতে হয়েছে। ঐ ঘরে রাস্তার দিকে একটা জানলা ছিল—আকাশ দেখা যেত। পাল্লাটা খুললেই কিন্তু কারা এসে জানলার কাছেপিঠে দাঁড়িয়ে যা খুশি তাই বলে যেত। কেউ কেউ চমৎকার অঙ্গের গলা নকল করতে পারত। একদিন সে কেঁদে ফেলেছিল গোপালদার কণ্ঠস্বর শুনে—পরে অবশ্য জেনেছে ঐ সময় তিনি কলকাতায়ই ছিলেন না। বাজারের আলুজলার মুখে বিশদ বিবরণ শুনতে হবে ভয়ে রুদ্ধশ্বাস অন্ধকার শয্যায় এই জন্যই তো পাশাপাশি শুয়ে আকাঙ্ক্ষায় বুক ফেটে যাওয়া সত্ত্বেও একসময় তুমি কনকের হাতটুকুও স্পর্শ করো নি—দিনের পর দিন। হ্যাঁ দিনের পর দিন।

মন্থর পায়ে, কিছুটা খুঁড়িয়ে, মণিমোহন বাড়ি ফিরছে।

অথবা স্বীকার করো কনজিউমার গুডস ওরিয়েন্টেড প্রতিযোগিতা-মূলক জীবনাদর্শ, কাটাও আরেক ধরনের উর্ধ্বশ্বাস জীবন। তোমাকে এনে ফেলা হবে এমন এক কানা-গলিতে যেখানে চরম আত্ম-কেন্দ্রিকতায় বেঁচে থাকার ন্যূনতম শর্ত, অস্বীকার করা যায়। তারপর অযোধ্য

সব মুহূর্তে সেই ভুল সেই দুর্বলতাগুলিই তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে যাতে মানুষের মর্যাদায় কোনোদিন আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারো।

আর জীবনটা হয়ে যাবে হাস্য-উদ্রেক, রুচিবিহীন, শ্রী-শালীনতা বর্জিত গোদা একটা ব্যাপার—যেখানে সূক্ষ্ম কোমল অনুভূতির চির নির্বাসন দণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে।

—মণিমোহন?

—বলো!

—মোণিমো—হোওওনননন

—ব-লোওওওও

—যোকো কেমন?

—চলছে চলবে।

—এইভাবে?

—হ্যাঁ, আপাতত এইভাবেই। কিন্তু দিনও বদলায়।

—যেলে যা, এবার বুঝি আশা-বাদের নামতাপাঠ শুরু করবে?

—আজ্ঞে না, মার্কসবাদের বিজ্ঞানের কথা বলব। অ্যাসেম্বলি ইলেকশনে ছুটো সিট পেয়েছি বলে তো আর মার্কসবাদ মিথ্যে হয়ে যায় নি।

—কি বলছে বিজ্ঞান?

—বলছে ইতিহাসের সব কটা সফল বিপ্লবেই শাসক আর শোষকরা মনে মনে অস্ত্রে কারিগরি বিদ্যায় অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় থেকেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে। বলছে একই কারণে মানব-কল্পনা-পরাক্রান্তকারী শক্তির অধীশ্বর আমেরিকার নাকের ডগায় সমাজ-তান্ত্রিক কিউবার আবির্ভাব হয়। ছোট ভিয়েতনামের লাথি খেয়ে এত বছরের সর্বনাশা যুদ্ধ ছেড়ে মার্কিন সৈন্যরা ঘরে ফেরে। বলছে আড়াল থেকে যে-মেঘনাদ আজ এভাবে আমাদের মারছে—একদিন তাকে খতম করার জন্য এবেলেও রামলক্ষ্মণ জাগবেই।

—বলেছ ভালো। এবার তোমার কথা শুনি।

—আমার আবার আলাদা কথা কি! রামলক্ষ্মণের কাহিনীই—

—ওহ! তাহলে একটু আগে ছেলে হস্তাক্ষরে "সুমন, আমার সুমন" দেখে মুহূর্তের জন্য হলেও কেন ভেবেছিলে শুদ্ধ প্রেম কথাটা বিরাট প্রহসন। নিজের জাল চিঠি দেখে মুহূর্তের জন্যে হলেও কেন ভেবেছিলে সবই জাল করা যায়, যাচ্ছে; সব থেকে সহজ মানুষ জাল করা, নিজেও তুমি একদিন জাল হয়ে যেতে পারো?

—যন্ত্র তো নই, রক্তমাংসের মানুষ। ঈর্ষা, লোভ, ভয়···সবই আছে। ভুল হয়েও যায়। প্রায়শ্চিত্তে বুকে স্থৈর্য ফিরে পাই।

—এমন ভুল তো আবারও হতে পারে?

—পারে।

—মিটিংয়ে তাহলে না যাওয়াই ভালো।

—কেন হে?

—আকাশে কালো মেঘ

—জানি

—অমন সিগন্যাল দিয়ে গেল

—জানি

—"সৎ মানুষ"—এই পরিচয়টুকুই তো তোমার সম্বল মণিমোহন। তাও যদি যায় তো বাঁচবে কি নিয়ে?

—বেঁচেই নিজের কাছে একটার পর একটা পরীক্ষা দেব, তাঁর শেষ পরীক্ষা ছিল মনে মনে শহিদ হওয়ার প্রলোভনটুকু জয় করা। তারপরই তিনি নিহত হন।

—বাপরে, এতিহ্য? ইংরেজি-কচুরালি দিচ্ছ?

—শোনো, অমন আমার বহু উপকার করেছে। আমাকে প্রমাণ করতে হবে "সৎ মানুষ" বলে পাঁচজন বন্ধুর হাততালি কুড়োবার জন্য এ জীবন বেছে নিই নি। আমরা কমিটমেন্ট হতে চেয়েছি আরও অনেক বড় তাগিদে।

—হতে চেয়েছে? হও নি?

—না। বিশ্বস্ত পার্টি-সদস্য নিশ্চয়ই হয়েছি। কিন্তু কমিটমেন্ট? কবে যে হব!

—তোমার বিনয় ফুঁড়ে চাপা অহঙ্কার উঁকি মারছে যেন?

—বিনয় নয়, ও আমার দুর্ভাবনা আছে। আমি যে জ্ঞান কমিটমেন্ট তাকে বলে, দেখেছি আর অহঙ্কার? তা-ও আছে। কোন দুঃখে তা চাপা হতে যাবে? আমি এমন একটি পার্টির সদস্য যার পতাকা পৃথিবীর সব দেশে ওড়ে আমি এমন একটি পার্টির সদস্য যার দশন কাজ স্বপ্ন দুনিয়াটা বদলে দিচ্ছে। আমার এর অহঙ্কারটুকু নিয়ে যেন মরতে পারি।

—অর্থাৎ একই সঙ্গে আছি আর নেই?

—ঠিক তাই।

—ভালো ভালো। স্টাইল অফ লাইফ, ভাঁড়ামি—যার যা ইচ্ছে ভাবুক, ব্যাপারটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং। এখন একটু তাড়াতাড়ি হাঁটো প্রভু, আজ আবার বাজার পর্যন্ত হয় নি।

মণিমোহন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাড়িই ফিরছিল, কিন্তু বাড়ি ব্যাপারটা মাথায় ছিল না। সমস্ত পথ নিজের সঙ্গে তর্ক করতে করতে এসেছে। এখন তীব্র পরিহাসের মতো

মনে পড়ে গেল কেন তাকে হঠাৎ বেরোতে হয়েছিল। আহ্ অপচয়। অস্তিত্বের কি অকারণ রক্তপাত!

—'মেসোমশাই?'

চেতনার তটে সমুদ্রতরঙ্গের মতো একসঙ্গে আছড়ে পড়ল কনক মিত্র বাড়ুয্যা। কনক আজ কিছুতেই আগে খাবে না। সেজভাত—তাও ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে

—'কি হল মেসোমশাই?'

—'কিছু না মা।'

—'পাঁড়িয়ে পড়লেন? পায়ের ব্যথাটা বুঝি—'

—'সে তো আছেই রে।'

—'হাসপাতালে যাবার কথা বলছিলেন?'

—'গিয়েছিলুম বৌদি, আবার দেখাতে হবে।'

—'চিকিৎসার জন্ত কত লোক তো বিদেশ যায়। উত্পীর বাবা—আমাদের ক্লাস নাইনের কার্স্ট গার্ল, ওর বাবা তো আপনাদের পার্টির নাম করা লীডার—গত বছর রাশিয়া গিয়েছিলেন চিকিৎসা করতে. উত্পীর জন্ত কত কি এনেছিলেন। আপনি কেন যান না মেসোমশাই?'

—'আমিও যাব, অসুখটা আরেকটু পাকুক।'

—'মিতুর জন্ত জিনিস আনবেন?'

—'সে তো আনতেই হবে।'

—'ইস, আমার বাপি যে কেন কমিউনিস্ট হল না।'

বালিকার সরল নিষ্পাপ মুখ আর উৎসাহে উজ্জ্বল চোখ দুটির দিকে মণিমোহন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'আচ্ছা, আমি যদি কোনোদিন যাই তাহলে তোর জন্তেও কিছু আনব।'

—'থাক্ মেসোমশাই। খড় ছেল ইদ্দুর।'

—'ধ্যারে বাণ্টি, কমিউনিস্টরা তো শুধু সোভিয়েতেই যায় না, চেনেও যায়। তোর বাবা যদি কমি—'

বাবা দিয়ে বাণ্টি বলল—'যারে, ছেলে হাবে কেন? আপনারা তো সি পি আই। ছেলে তো সি পি এম হয়।'

কেউ যেন মণিমোহনের গালে চড় মারল। কিছুটা মরিয়ার মতোই বলল—'কেন্দ্রে জানিস তো জনতা সরকার। সি পি আইকে তারা এক নম্বর শত্রু মনে করে। বরং সি পি এম তাদের বন্ধু।' শেষ কথাটা বলে ফেলে মনে মনে লজ্জিত হল। এও ছিল কপালে? এই বালিকার কাছেও এভাবে নিজেকে ডিফেণ্ড করতে হচ্ছে?

বাণ্টি উচ্চাঙ্গের হেসে বলল—'দেখুন না ছটা মাস। বাপি বলেছে ইন্দিরা গান্ধী আবার ক্ষমতায় আসবে। তখন তো আপনাদেরই রাজত্ব হবে।'

মণিমোহন একটু উত্তেজিত হয়েই বলল—'ইন্দিরা গান্ধী যদি কোনো দিন ক্ষমতায় আসেন তাহলে সব থেকে আগে সি পি আইকে দেখে নেবেন।'

বাণ্টি স্তম্ভিত বিস্ময়ে বলল—'সত্যি মেসোমশাই?' একটু থেমে ছল ছল চোখে আবার বলল—'যাহ্। সত্যি?'

মণিমোহন তার স্বাভাবিক শান্ত গলায় হেসে বলল—'হ্যাঁ মা, সত্যি। কংগ্রেস জনতা দুই পার্টিই আমাদের বিরুদ্ধে, আমরাও চাই না পাল্লা ভারী হয়ে তারা দেশের ক্ষমতা দখল করুক।'

—'পারেনও বটে আপনি। দেখে বাণ্টিকেও পলিটিক্স বোঝাচ্ছেন? স্নান-খাওয়া তো হয় নি দেখছি।'

—'কই আর হল?'

—'এবারে একটু নিয়মে চলুন মশাই, বয়েস হচ্ছে না?'

হা হা করে হেসে উঠে মণিমোহন বলল—'হচ্ছে বৈ কি!'

হাসিমুখে বাড়ির দিকে এগোতে এগোতে মণিমোহন পেছন থেকে বাণ্টির ডাক শুনল—'মেসোমশাই?'

—'কি রে মা?'

ফরসা মুখটিতে ঘাড় অবধি কার্ল করা চুলের বড় একটা গুচ্ছি শক্ত করে ধরে ময়ূর পালকের পাখার মতো নরম ডগাটা গালে বোলাতে বোলাতে বাণ্টি বলল—'মিতুকে একবার পাঠিয়ে দেবেন? বলবেন ছুটোর সময় পূর্বা আসবে।'

প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে মণিমোহন বলল—'কোন পূর্বা?'

—'আহ্ মেসোমশাই। পূর্বা। পূর্বা। কুইজ কনটেস্টে আমাদের স্কুলে ফার্স্ট গার্ল।'

বৌদির চোখে কি হাসি? সে তো সব সময়ই থাকে। মিতু··· বাণ্টি···এরাও কি একদিন শুনবে? কিন্তু ঘটনাটা কি? কিশোর বয়েসে একটি মেয়েকে তোমার ভালো লেগেছিল—তাতে অপরাধ কি হল? এই ভাবে, এই ভাবে মণিমোহন, সমস্ত শুভতাকেই বিকৃত করে দেওয়া হবে। আর অনির্দেশ্য গ্লানিতে নিজেকেই তুমি লজ্জা পেতে থাকবে।

—'বলব। এ, তারি-ফার্স্ট হয় কুইজ কনটেস্টে। পারবে, আমার সঙ্গে, তুই পারবি?'

—'উঠে যাবেন মেসোমশাই, পূর্বাকে জাগবে না। মিতু আর

আমি, আপনি আর মা—হবে নাকি কাল ?'

—'কি বৌদি, রাজি ?'

—'আমি তো খুব রাজি।'

—কিন্তু আপনার কি কাল সময় হবে ?'

বাচ্চির মা 'কাল' শব্দটার ওপর এত জোর দিলেন কেন ? বাচ্চির বাবা কি চাকরি করে যেন ? বৌদির চোখে কি হাসি ! সে তো সব সময়ই থাকে। স্থির হও মণিমোহন, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার প্রতিমুহূর্তে প্রত্যাক্রান্ত হবার চেষ্টা হবে। হেরে যেও না। হেরে যেতে নেই। সাবধান। ঐ একটি জিনিসই তোমার আছে—মাথাটা। হঠকারীভাবে অন্যায় সন্দেহ করে সেটি খুইয়ো না। তবে সতর্ক থেকো। হ্যাঁ। মানুষকে ভালোবেসে যার শুরু—মানুষকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দিয়েই কি তা শেষ হবে !

—'ঠিক ঠিক, কাল যে আমার জরুরী মিটিং আছে বৌদি।'

বাচ্চির মা ভ-ভঙ্গি করে বললেন—'জানতুম।'

—'পণ্ড হোক ?'

বাচ্চি বলল—'ঠিকাছে।'

বাচ্চি আর বৌদিকে পেছনে রেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মণিমোহন বাড়ি ঢুকল।

ভেতরের দরজাও খোলাই ছিল। কাগজগুলো সেইভাবে ছড়ানো। চোখ বুজে চুল এলিয়ে কনক শুয়ে আছে। ঝুঁকে ঝুঁকে কুঁচকে মিতু পাকা চুল তুলছে। জানলায় তাকে খাতা রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একমনে বাবুরা ছবি আঁকছে।

বুক জুড়িয়ে গেল মণিমোহনের। বলল—স্বর্গ যদি কোথাও থেকে থাকে সে এইখানে সে এইখানে।

খুশি আর লজ্জায় কনক নড়েচড়ে উঠে বসল। মিতুর চোখও খুশিতে ঝকঝক করছে। শুধু বাবুরা একবার মণিমোহনের দিকে তাকিয়ে আপন মনে দ্রুত হাত চালাতে লাগল।

ঠোঁট টিপে হেসে কনক বলল—'বাবু আর মাকে প্রেজেন্ট করবে বলে তোমার ছেলে ছবি আঁকছে।'

—'বটে বটে ! বাহুন ?'

—'বাবু প্লীজ, ডিসটার্ব কোরো না।'

—'কারা এসেছিল ?

—'ও কিছু না। কাগজগুলো সব ছড়ানোই দেখলাম।'

—'তুমি যে বাড়লে না।'

কনকের মাথার কাছে আজকের কাগজটা ভাঁজ করা পড়েছিল। মণিমোহন হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। টান করে প্রথম পাতাটা খুলে ধরল। মোরারজি দেশাইয়ের সেই ছবি।

সযত্নে ভাঁজ করে কাগজটা বাইরের পুরানো কাগজের ভাঁইয়ে ছুঁড়ে দিয়ে মণিমোহন বলল—'শোনো, সব বেচে দাও কিন্তু রাখতে হবে না।'

—'সব ?'

—'হ্যাঁ। কোনো মানে হয় না। ইতিহাস ওখানে নেই।'

মিতু বলল—'বাঁচা গেল। আরশুলার উৎপাত কমবে।'

কনক বলল—'বেশ। তাহলে মাংসের সঙ্গে একটা করে চমচম।'

বাবুরা হঠাৎ কাগজে একটা লম্বা আঁচড় কেটে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছবি সুদ্ধ হাতটা বাড়িয়ে বলল—'এই নাও।'

তিন

হুইসিলের শব্দ শোনা যেতেই মণিমোহন বুঝল এইবার ছেলেদের প্যারেড শুরু হবে। অর্থাৎ, বিকেল হয়েছে। উনানটা চাপাটে ঠিক ঠিক মতো ভাঁজ করে হাতে মুখ আইনাল। ঠিকানাগুলো আরেকবার ভালো করে পড়ে নিল। তারপর ডাকল—'কনক ?'

—'উঁ ?'

—'বাচ্চাদেশের টাকাটা দাও তো !'

একটা খাম মণিমোহনের হাতে এগিয়ে দিতে দিতে কনক বলল—'তুমি কি এখন বেরোবার মতলব করছ ?'

—'যা-টাই, একটু ঘুরেই আসি।'

যেন মণিমোহনের অকপট উত্তরের জবাব দিলেরই চাপা গর্জনের মতো আকাশের নির্দেশ দূর থেকে ছিটকে এলো—'উনিশ।'

উত্তর দিকের খোলা জানলা দিয়ে রাস্তার ওপারে পোড়ো মাঠটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে কনক বলল—'আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরো।'

—'ফিরব।

জেমস ক্লিপে আইনানো মুখ খুলে মণিমোহন বিছানার ওপর খামটা উপুড় করে ধরল। অনেকগুলো নোট আর খুচরো কিন্তু পরপর করে পড়ল। একটা কাগজে মোটা হরফে দশজনের নাম লেখা ছিল। কয়েকটি নামের পাশে ভিন্ন ভিন্ন কালিতে তারিখ আর টাকার অঙ্ক বসানো. বোঝাই যায় ভিন্ন ভিন্ন কলমে লেখা হয়েছে। যোগ দিয়ে দেখল তিয়াত্তর টাকা। খুচরো আর নোট গুনে দেখল তিয়াত্তর টাকাই। অতিরিক্ত সাবধানতায় আবার গুনল। তারপর যত্ন করে নোটগুলো সাজাতে লাগল। প্রথমে দশ টাকার নোট, তারপর পাঁচ টাকার, একখানা দু-টাকার নোটও আছে। তারপর

তিন সাইজের নোটের অপোজিটস্থ হাতে বাঁধিয়ে পরে এমনভাবে নোট-গুলো নাড়াল। তারপর প্রতি গ্রুপে চকচকে নোটগুলো পেছনে আর মলিন নোটগুলো সামনে রেখে আরেকবার গুনল—বাহাত্তর টাকা, দুচরো এক টাকা একখানা দশ টাকার নোট একটু ছেঁড়া—কে দিয়েছে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না।

আর, কমাণ্ডার যেন ধমক দিয়ে বলল—'ফরোয়ার্ড মার্চ। লেফট রাইট লেফট রাইট লেফট রাইট লেফট।'

—'দুচরোগুলো নিয়ে একটা এক টাকার নোট দাও না।'

হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে বলল—'এই দশ টাকার নোটটা পালটানো দরকার, হবে তোমার কাছে?'

হেসে কনক বলল—'আজকের তারিখটা তো আর মনে রাখো নি, তাই বলছ।'

—'আসলে এই মুহূর্তে তুমিই ভুলে গিয়েছিলে, তাই ভাবলে আমিও মনে রাখি নি।'

খিক খিক করে হেসে কনক বলল—'তা ঠিক। আজকের তারিখটা তোমার কখনোই ভুল হয় নি।'

—'তাহলে প্রাইজ দাও।'

—'বলেছি তো রাত্তিরে মাংস খাওয়াব। মিষ্টি।'

—'সে তো পারিবারিক সেলিব্রেশন। আমার পুরস্কার কই?'

কনক মণিমোহনের পিঠে খুব একটা চাপড় মেরে বলল—'এই নাও।'

—'পুরস্কার হল চাপড়?'

—'না মহাশয়, পিঠ চাপড়ানি।'

—'লেফট, লেফট, লেফট রাইট লেফট…'

—'শুধু এইটুকু?'

—'হেংদু।' কনক এগিয়ে এসে বেড় দিয়ে মণিমোহনকে ধরল।

—'লেফট, লেফট, লেফট রাইট লেফট'

ফিস্ ফিস্ করে কনক বলল—'কি হয়েছে তোমার? সারাদিন কাছে কাছে ডাকছ আর আমার কেমন ভয় করছে।'

—'কাছে ডাকলে ভয়? এই অবস্থা?'

হাত দিয়ে মণিমোহনের মুখ চেপে কনক বলল—'লক্ষ্মীটি, সব সময় এড়িয়ে এড়িয়ে যেও না। কি হয়েছে তোমার?'

—'রাইট টার্ন, লেফট… লেফট… লেফট রাইট লেফট…'

—'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?'

—'ছাড়ো, জামা-কাপড় দাও।'

—'কোথায় যাচ্ছ?'

—'আর বোল না। বাঙলাদেশের কেউ কেউ কলকাতায় আছেন—সে তো শুনেইছ। সেবার মোটা দেশ শরণার্থীদের সঙ্গে ছিল, সরকারও। এবার অবস্থাটা অন্য রকম। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স তো একদল মুক্তিযোদ্ধাকে গ্রেপ্তার করে বাঙলাদেশ-সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে। প্রত্যেককে তারা তৎক্ষণাৎ গুলি করে মেরেছে। কি বিটেহাল! বহু কাণ্ডের পর এটা অবশ্য বন্ধ করা গেছে। কিন্তু যারা রইল—তারা থাকবে কোথায়, খাবে কি? ব্যবস্থা কে করবে?'

কনক জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল। বাইরে থেকে ভেসে এল চাপা গর্জন—'বাউন্ডারি টার্ন। লেফট রাইট লেফট…'

—'শক্রঘ্নদাকে তুমি চেনো না। একাত্তর সালে এসেছিলেন, আমার সঙ্গে তখন আলাপ হয়।'

—'নাম শুনেছি।'

—'শক্রঘ্নদা চলে এসেছেন, সত্তরের কাছাকাছি বয়েস, আবার বেছে নিলেন ফিউজিটিভ লাইফ। কী মানুষ কনক—দেখলেও পুণ্য হয়। সেই ত্রিশের দশকে কমিউনিস্ট হয়েছেন। দেশ বিভাগের আগে ইংরেজ আমলে, পাকিস্তান হওয়ার পর মুসলিম লীগ আমলে, মিলিটারি জুন্টার হাতে ক্ষমতা যাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খাঁ তারপর ইয়াহিয়ার আমলে কখনো জেলে কখনো আণ্ডারগ্রাউণ্ডে জীবন কাটিয়ে দিলেন।'

—'মার্চ টাইম। লেফট… রাইট…লেফট…।'

—'একাত্তর সালে এত যে ঘনিষ্ঠতা হল আমার সঙ্গে, এত গল্প, জানতেও পারি নি সোমেন চন্দের হত্যার এক বছর পরে ১৯৪২ সালে উগ্র জাতীয়তা-বাদীরা শক্রঘ্নদাকেও হত্যার চেষ্টা করেছিল। মেরে মাথা ফাটিয়ে মৃতজ্ঞানে ফেলে দিয়ে যায়। পঁচাত্তর সালে পুরানো 'জনযুদ্ধ' ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ চোখে পড়ল তারাশঙ্কর মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখের বিবৃতি। অবাক হয়ে ভাবলাম তারাশঙ্করের শবানুগমনের সময় দীর্ঘ পথ হাঁটতে হাঁটতে কতজন কত স্মৃতিচারণ করলেন, আমিও বাদ যাই নি। শক্রঘ্নদা তখন কলকাতায়, সমস্তটা পথ আমারই পাশে নীরবে হেঁটেছিলেন। পরের দিনই আবার মুক্তি-যুদ্ধের কাজে কোথায় চলে গেলেন।'

—'তারপর?'

—'পূর্ব-পাকিস্তান ইতিহাসের ফুটনোট হয়ে গেল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ। উনিশশো সাতচল্লিশের চোদ্দই আগস্টের পর এই প্রথমবার সীমান্তের ওপারে কমিউনিস্ট পার্টি একটা বৈধ পার্টি হিসেবে কাজ করতে পারল। মুসলিম লীগ আর মিলিটারি জুন্টার শাসনে থেকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড কমিউনিস্ট পার্টির কাজ মানে কি বোঝায় তা জানো কনক?'

মণিমোহনের প্রদীপ্ত চোখমুখের দিকে তাকিয়ে কনক নিঃশব্দে হাসল। নিজের আবেগে মণিমোহন বলতে লাগল—'অবশ্য শত্রুঘ্ন যখন শুরু করেন, তখনও কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনীই। 'জনযুদ্ধ'র আমলে একচল্লিশ সালে পার্টি বৈধ হয়। অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে দশটা বছরও প্রকাশ্যে বৈধভাবে কমিউনিস্ট পার্টি করতে পারেন নি অথচ জীবনে ঐ একটা কাজই করলেন। বিয়ে নয়, নিজের বলতে কিছু না—জেল আর আণ্ডারগ্রাউণ্ডে তরুণ থেকে যুবক তারপর প্রৌঢ় তারপর বৃদ্ধ হলেন।'

কনক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'সত্যি। প্রণম্য লোক।'

—'অথচ মানুষটা ওকো রাজনীতির ব্যাপারি নন। নিজের দশক থেকে সমগ্র পূর্ব বাঙলায় প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের পথিকৃৎ। সংগঠন করেছেন, পত্রিকা করেছেন, লিখেছেন, লিখিয়েছেন। আর, কী প্রেস্টিজ! তিন প্রজন্ম ওঁর লেখা পড়ে মার্কসীয় বিশ্লেষণের আলোয় সাহিত্য-সংস্কৃতির মানবসভ্যতার পাঠ নিয়েছে। চীনাপন্থী কমিউনিস্ট থেকে আওয়ামি লীগ পর্যন্ত এমন কোনো রাজনৈতিক দল নেই যেখানে শত্রুঘ্নদার ভক্ত পাওয়া যাবে না। শেখ মুজিবের শেষ জীবনে উনি তাঁর পার্সোনালিটি কাল্টের রীতিমতো সমালোচক হয়ে পড়েন। কিন্তু মুক্তির হুঙ্কার পর মুজিব যেন ছাড়েন এবং যে আওয়ামি লীগের কঠোর সমালোচক ছিলেন, গোপনে সেই দলেরই একাংশের সঙ্গে হাত মেলান যাতে বাঙলাদেশে মিলিটারি শাসনের বিরুদ্ধে আর বঙ্গবন্ধুর ধর্ম-নিরপেক্ষতার নীতির পক্ষে মানুষ জেগে ওঠে। এই হচ্ছে শত্রুঘ্নদা। সরকারি ছাতার নিরাপত্তায় লাখি মেরে আপন লক্ষ্যে অবিচল থাকা।'

—'কিন্তু এত জোর কোথায় পান?'

—'পান বিশ্বাস থেকে, জ্ঞান থেকে, মানুষ থেকে। আমাদের পার্টিতেও এমন অনেকে আছেন—কেউ কৈশোরে কেউ প্রথম যৌবনে শুরু করেছিলেন, আজও পতাকা ছাড়েন নি। শহরে গাঁয়ে কারখানায় বন্দরে আন্দামানে ভিটেনেমন ক্যাম্পে ইংরেজ আমলে কংগ্রেস আমলে কি বিপুল দুঃখবরণ, কি সীমাহীন ত্যাগ, কি দাঁতে দাঁত লড়াই আর নির্যাতন সওয়া! সাতষট্টির পর শাসন-ক্ষমতার কেন্দ্রে বা আশেপাশে থেকেও এঁরা চরিত্রে কোনো দাগ পড়তে দেন নি।'

—'লেফট···লেফট···লেফট রাইট লেফট···'

—'শত্রুঘ্নদার কথা বলো।'

—'প্রগতি পরিষদের অফিসে মাঝে মাঝে দেখা হত। সেই পায়জামা ফুল হাতা শার্ট হাতা দোহারা চেহারা, শান্ত দুটি চোখ, এক মুখ হাসি, মৃদু কণ্ঠে একটি-দুটি কথা। চারদিকে বিদ্যা গুপনা কিন্তু ত্যাগ দেশাত্মবোধের সোচ্চার একজিবিশান দেখতে অভ্যস্ত, আমরা, কাজের খুব চাপ থাকলে বা আড্ডা বেশি জমে গেলে শত্রুঘ্নদার উপস্থিতি সব সময় টের পেতাম বলে মনেও আসে না। তা অবশ্য যাওয়াই, তবুও বলি—কিন্তু তাতে অনেক সময় দাহসারা ভাবটা গোপন করার চেষ্টাটুকুও থাকে না। মাঝে মাঝে আমার মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যায়। কিন্তু শত্রুঘ্নদার চোখের হাসি যেন ইশারায় বলে—ঠিক আছে হে, সব ঠিক আছে। উনি আসেন মুক্তি-যোদ্ধাদের পত্রিকা বিক্রি করতে। সেই সঙ্গে কিছুক্ষণ আড্ডাও যেন। মানে এখানকার বুদ্ধিজীবীদের গল্প-গাছা শোনেন।'

—'রাইট টার্ন। লেফট···লেফট ···লেফট রাইট লেফট

—'এক সময় দেখলুম শত্রুঘ্নদা কিছুদিন আসছেন না। খোঁজ করে করে ওঁর আস্তানা বার করলুম। একটা মুসলিম বস্তিতে আছেন। সে বস্তির বর্ণনা আমি তোমার কাছে করতে চাই না। বুঝতে পারলুম শত্রুঘ্নদার খাওয়া জুটছে না। সস্তা হোটেলের খানা আর হজম হচ্ছে না। বয়েস হয়েছে তো! শরীরে নানা রকম কমপ্লিকেশন দেখা দিয়েছে।'

রুদ্ধ নিশ্বাসে কনক প্রশ্ন করল—'তারপর?'

—'ভাবলাম প্রতি মাসে ওঁকে একশো টাকা টানা তুলে দেবো। টাকা উনি হাতে পেতে নেবেন। এবং তৎক্ষণাৎ খাতে জমা করে দেবেন। তাই ঠিক করলাম টাকাটা ভাতৃড়ীদার মাধ্যমে দেওয়া হবে, তিনিই ওঁকে বলতে পারেন—এই টাকা শুধু নিজের জন্য খরচ করবে। বন্ধুজনের একটা

লিস্ট করলাম, প্রত্যেককে বলে দিলাম দশটা করে টাকা মাসের প্রথম সপ্তাহে কাজলের কাছে জমা দেবে। টাকাটা দেওয়া হবে সঞ্জয়দাকে। আমি কাজল আর সিদ্ধার্থ দুমাসে কুড়ি টাকা করে দিয়েছি, ব্যস। একদিন অত্যন্ত জোর প্রকাশ করায় অনিমেষ বাস ভাড়া রেখে তিনটে টাকা বার করে দিল আর বিজিত দশটা টাকা দিয়ে লজ্জিতভাবে বলল —'গত মাসের টাকাটা দিতে দেব, কিছুতেই মনে থাকে না।' দেয় নি অবশ্য। যে দশজনের তালিকা করা হয়েছিল আমি বাদে তাদের প্রত্যেকে কলেজে পড়ায় অথবা বড় চাকরি করে, মুক্ত মন উদার বুদ্ধি, বাড়ি বাড়ি সিনেমা থিয়েটার ক্লাবে হট হেলে ভালোমন্দ খায় এবং বন্ধুদের খাওয়ায়, তাছাড়া ট্যাক্সি তো চড়েই। আপদে-বিপদে অন্যকে যে সাহায্য করে না তাও নয় কিন্তু তখনই করে যখন ব্যাপারটা একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে। কোনো দায়বোধ বা ভালোবাসা আর ওদের খুঁটি ধরে কিছু করিয়ে নিতে পারে না। সেটি বুর্জোয়া আত্মকেন্দ্রিকতা এবং তাৎক্ষণিকভাবে বাঁচার বিলাস কীভাবে সকলকে গ্রাস করেছে।'

—'সিমেই অমিয়র নাম নেই?'

—'প্রথমে আমার নাম, তারপরেই অমিয়র। তুমি তো জানো ওর কত অসুবিধা যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও দেখা হলেই আমার মুখ দেখে বুঝে নেয় কিছু পেয়েছে কি পায় নি এবং পেয়েছে মনে হলে জোর করে খাওয়ায়। ট্রামে বাসে উঠতে কষ্ট হবে, ট্যাক্সি ভাকে। বলে—আমি তোমার মতো নির্ধন নই। বাজে খরচে সাধের ক্রীম নষ্ট করে সারাদিন পর কোড়া কাকের মতো বাড়ি ফিরবে যে—বেচারা বউয়ের সেন্স অফ বিউটি সফল হবে না? অমিয় আমার জন্য কি না পারে? অথচ, সঞ্জয়দার কথা ওর কিছুতেই মনে থাকে না।'

—'আহা, ভালোবাসা তো হয় নয়।'

—'হাঁ একমাত্র ভালোবাসাই হয় নয়। সঞ্জয়দাকে যারা ভালোবাসতে পারল না তারা দুর্ভাগা।'

কনক বিষণ্ণমুখে মণিমোহনের পায়জামাটা এগিয়ে দিল। বলল—'তোমার দুটো জামা এবার না করলেই নয়।'

—'তার আগে জুতোটা পাল্টানো দরকার। পায়ে বড্ড লাগে, আর চলে না।'

—'পায়জামার দর্জাও তো হয়ে এসেছে।'

—'অনেকদিন হল। তবু তো বাড়িতে কাচে ভাই।'

—'ইস্ত্রিটা আজ দেল।'

—'সর্বনাশ। কখন?'

—'সকালেই।'

—'সারাদিন খাও নি?'

—'দাঁড়াও বাপু।'

—'তোমার দিদিমণি-দাড়ি, মিতুর ইউনিফর্ম.....এসব?'

—'আছে আছে। এত ভাবো কেন? (তুমি তেমাকে জান...) আপের রাতে জল ছিটিয়ে ভাঁজ করে বিছানার নিচে রেখে দেবো, আপসে ইস্ত্রি হয়ে যাবে। তুমি যা ধোবা, বুঝতেই পারবে না।'

প্যারেডের পর লাইনে দাঁড়িয়ে গান হচ্ছে: "তুমি তেমাকে জান হে সবে আপনার সাথে আছে ভগবান হবে জয়....."

এরপর আকাশ কাঁপিয়ে এরা শপথ নেবে—দেশের জন্য, ঈশ্বরের নামে। আর, প্রার্থনার সেই ধ্বনিতরঙ্গে বিকেল ডুব দেয়। অপরাহ্নের ছায়া দীর্ঘতর হয়। তারপর রাত্রি।

তোমার দেশ কোথায় মণিমোহন? তোমার ঈশ্বর কে?

বেরোবার সময় আবার কনক বলল—'আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরো, বুঝলে?'

পোস্ট করার জন্য চিঠি চারটে পকেটে পুরে মণিমোহন বলল —'আচ্ছা।'

—'আরে? কি খবর? শরীর খারাপ শুনেছিলাম? কেমন আছ? বাচ্চারা কেমন? কনক? নিয়ে এলে না কেন? কি লোক বাবা! সেই যে ডুব দিলে। এসো এসো, জোন বায়েজের গান হচ্ছে—নতুন রেকর্ড, এখনও এদেশে আসে নি—পৃথ্বীশ ফিরেছে তো ক্যানাডা থেকে, ওই। সেবার বড়দিনে বসিংহের সময় জোন ছানয় ছিল্—ব্রেন ওড়া মোমা ফেপা, আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেলটারে বাচ্চার কান্না বুড়ির হাসি···সব টেপ করে নেয়—নিজের গানের ফাঁকে ফাঁকে ব্যবহার করেছে। শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। একটা এক্সপীরিয়েন্স। ব্যাই, মুখচোখ এরকম কেন? নিশ্চয়ই সকালে বেরোনো হয়েছে, নিশ্চয়ই সারাদিন কিছু জোটে নি?'

—'আপনি না ঘুঁইদি একটা ইমপসিবল। দুপুরবেলা ঘুমিয়ে বিকেলে চা-রুটি খেয়ে সোজা বাড়ি থেকে আসছি।'

—'তাতেই এই অবস্থা? শরীরের

বারোটা তালোই বাজিয়েছ দেখছি। যাও গিয়ে বোসো। আমি চা করছি।'

ঘরের দিকে এগোতে এগোতেই রেকর্ড শুরু হয়ে গেল। সাইরেন—দূর বিলম্বিত বিপদজ্ঞাপক সেই ধ্বনি ক্রমেই তীব্র আর দ্রুত হচ্ছে। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতে ইন্দ্রদা চোখমুখের নিঃশব্দ হাসিতে মণিমোহনকে স্বাগত জানালেন। উঠে হাতে ধরে তাকে এনে নিজের পাশে বসালেন।

সমর। পার্থ। আরে, প্রসন্ন—সর্বনাশ, না না ছি, খুব ভালো হল দেখা হয়ে। মীনা, একি, মীনার চুলে পাক ধরেছে?

মেঘমাছির গুঞ্জনের মতো দূর আর অস্পষ্ট একটা ধ্বনি। দূর থেকে এক ঝাঁক প্লেন ক্রমেই এগিয়ে আসছে। শব্দটা চড়া হচ্ছে, ক্রুদ্ধ গর্জন যেন। একদম কোণের ঐ ভদ্রলোককে চিনলাম না, ভদ্রমহিলাকেও না। ছুটলিটা কোথায়? মজা ছাখো, রেকর্ড শুনতে শুনতেই পালাক্রমে সকলের সঙ্গে চোখে চোখে কুশল বিনিময় হয়ে গেল। বা, রবীন্দ্রনাথের এই ত্রিপদীটা তো ইন্দ্রদার ঘরে আগে দেখি নি···

বোমা পড়ছে। দেয়ালটাও কেঁপে কেঁপে উঠছে যেন। তারপর প্লেনের হিংস্র গর্জন আর বোমা ফাটার আরব শব্দ ছাপিয়ে চরাচরে ব্যাপ্ত হল এক মায়ের সেই আর্ত জিজ্ঞাসা: Where are you my son?

কি যে হল, মুহূর্তে কি হল···জোর বাজেজের গানের একটি কলি···জেট প্লেনের শব্দ বোমা পড়ার আওয়াজ যা পারে নি···ডিঙেতনাম···মণিমোহন দেখতে পাচ্ছে···বহু দিনে চার্চে যখন উৎসবের ঘণ্টা বাজছিল আর বাচ্চাদের হাতে ক্রীসমাসের বাতি···কাঁকে কাঁকে উড়োজাহাজ এসে বোমা ফেলল ছুলে হাসপাতালে বাঁধে মহুরের ঘনবসতি এলাকায়।

চিৎকার করে একটি শিশু কেঁদে উঠল। গুন্‌গুন্‌ করে কে যেন, তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। আর বোমা পড়ছে। বাড়িগুলো ভেঙে পড়ার শব্দ···

মণিমোহন মুখে আগুনের আঁচ পাচ্ছে। মাইলের পর মাইল শস্যক্ষেত্রে আগুন, মাইলের পর মাইল জঙ্গলে আগুন। নাপাম বোমা পুড়িয়ে দিচ্ছে প্রকৃতি, মাটি, মানুষ। সারি সারি অর্ধনগ্ন রমণী দাঁড়ানো—পিঠে বাহুতে ঝলসানো ফোস্কা। মার্কিন সেনারা স্টেনগান উঁচিয়ে আছে। একটি শিশু—ছেলে না মেয়ে বোঝা যাচ্ছে না—আকাশে দুহাত তুলে টলে টলে কাঁদতে কাঁদতে সেই রমণীদের দিকে ছোটে আসছে—তার পেছনে বিশদ বিস্তৃত শূন্য পোড়া মাঠ

Where are you my son?

কখনো বুকফাটা কান্নায়, কখনো আর্ত জিজ্ঞাসায়, কখনো প্রার্থনার সুরে, কখনো তীব্র অভিশাপের মতো ঘুরে ঘুরে আসছে অমোঘ সেই পংক্তি—কোথায় তুই আমার সোনা।

আর্কি-এয়ারক্রাফট গান গর্জে উঠল, যেন পড়ছে মাথিতে, এক বুড়ি ভিয়েতনামী ছেলে কি বলল যেন, আবার কামানের শব্দ, আবার বোমা

Where are you my son.

মণিমোহন বুঝতে পারে নি কখন তার চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করেছে। ভিয়েতনাম তারত বাঙলাদেশ সব কেমন মিলেমিশে যাচ্ছে। উদ্বেগে আশঙ্কায় বেরে বুক কাঁপছে। একটা দুষ্টু আর দুরন্ত মুখ···কি আসছে সামনে···কোথায় তোমার দেশ মণিমোহন? রেকর্ড থেমে গেছে। স্তব্ধ ঘর। ইন্দ্রদা ওর পিঠে হাত রেখে বললেন—'মহীন, আলাপ করিয়ে দি। মণিমোহন। দি পি আই করে। আমার চেয়ে বয়েসে বছর দশেকের ছোটো। কিন্তু, মাইত, প্রচণ্ড বন্ধু। আর মহীন, ওঁর বান্ধবী।'

অপ্রস্তুত মণিমোহন ইতিমধ্যে চোখ মুছে স্বাভাবিক হয়েছে।

নমস্কার বিনিময় শেষ হতেই প্রসন্ন বলল—'কেমন আছিস রে মণি?'

—'ভালো রে। তোরা কেমন আছিস?'

মীনা বলল—'ভালো। জনকবি, বাচ্চারা সব কেমন? আপনাকে তো মণিদা ঠিক দেখাচ্ছে না।'

—'বাড়ির সব ভালো আছে। আমিই একটু—। হ্যাঁ মীনা, মাথার চুল পাকিয়ে ফেললে? ছাখো তো আমার মাথাটা।'

—'আপনি হলেন চিরকালের ইয়ংম্যান। আপনার বন্ধুটিও কম যান না। দেখুন তাকিয়ে। অথচ সেই যে ওকে পাড়াছাড়া করল, সেই-দিনই—'

মণিমোহন স্পষ্ট দেখল প্রসন্ন মীনাকে ইশারা করছে, হঠাৎ মীনা চুপ করে অপ্রতিভ হেসে বলল—'তা বয়েস হচ্ছে না?'

—'বুঝলি প্র,' মণিমোহন বুড়ি বছর আগের সম্বোধনে প্রসন্নকে ডেকে বলল—'জনকেরও চুল পেকেছে। আসলে আমাদের বৌদ্ধেরা নিজেদের সাবালক প্রমাণ করার জন্য চুলে সাদা রঙটঙ লাগাচ্ছে না তো?'

—'ইউ মীন হেরার—ইন্দিরা স্টাইল ?' মহীনবাবু মন্তব্য করলেন।

তাঁর বান্ধবী বললেন—'প্লীজ মহী প্লীজ। এই সলেম ভারগায় ঐ নাম উচ্চারণ কোরো না।'

—'বাট হোয়াট ডু য়ু মীন ডিয়ার। এইমাত্র আমরা বলেছি মণিমোহনবাবু সি পি আই করেন

—'কিন্তু আমি শুনেছি অবেস্ট বেঙ্গলে সি পি আইর অধিকাংশ মেম্বার আর্কি-ইন্দিরা। দিস ইজ নট কেরালা বাবা। ইজনেট ইট মণিমোহনবাবু ?'

মণিমোহন হেসে বলল—'পশ্চিমবঙ্গ তো কেরালা নয়ই। সেখানে আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে লড়ে আছি, একসঙ্গে মন্ত্রিত্ব করছি। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি। এক যে নয় তা অন্তরোধ থেকে। আর এস পি কেরালায় এই ফ্রন্টের শরিক হিসেবে সি পি এমের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিত্ব করছে, আবার পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের শরিক হিসেবে সি পি এম মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছে।'

প্রসন্ন হেসে বলল—'কেরালা আর অবেস্ট বেঙ্গলের আর এস পি এক নয়।'

মণিমোহন বলল—'আসলে কেরালা আর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসও এক নয়। আপনার কথায় মনে হল আপনি বলতে চান কেরালার কংগ্রেস আর কমিউনিস্ট পার্টি ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থক। কিন্তু পার্লামেন্ট ইলেকশনের পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রথম স্পষ্ট প্রতিবাদ জানান কেরালার তরুণ অ্যান্টনি। কন্ডলাকরণকে পাশ্চে কেরালার কংগ্রেস দল অ্যান্টনিকে মুখ্যমন্ত্রী করে। কেরালার কংগ্রেস ইন্দিরাপন্থী হলে কি অ্যান্টনি মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন ? আর কেরালার কমিউনিস্ট পার্টি ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থক এমন অদ্ভুত কথা আপনি কিভাবে বললেন ?'

মহীন বলল—'বাট হোয়াট অ্যাবাউট ইজির ওউন স্টেট ?'

মণিমোহন হেসে করে বলল—'আজ্ঞে ?'

মহীন আধখানা উঠে ডিপ পকেট থেকে সোনার সিগারেট কেস বের করে মীনা বাদে জনে জনে সিগারেট অফার করল। ইন্দ্রজা আর মহীনের বান্ধবী ছাড়া কেউই নিল না। প্রসন্ন বলল—'আমি চারমিনার ছাড়া কিছু খেতে পারি না' ফ্যানের নিচে বসে মহীনের বান্ধবী এক কাঠিতে দেশলাই জ্বালিয়ে হাতের ঠোঙচে আগুন ভরে প্রসন্নর মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ল। প্রসন্ন চারমিনার ধরাল, তারপর সেই আগুনেই তিনি নিজের সিগারেট ধরিয়ে মৌজ করে নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন—'মহীন বলছে এই রাজ্যে সি পি আই মেম্বারসদের কত পার্সেন্ট প্রো-ইন্দিরা ?'

মণিমোহন হাসল : 'প্রো-ইন্দিরা মানে ইন্দিরাপন্থী। অনেকে যেমন গান্ধীবাদী, নেহরুপন্থী, সেই অর্থে যদি ধরেন—তাহলে একজনও নয়। কমিউনিস্টরা লেনিনবাদী, কোনো ব্যক্তিগত নেতার অনুগামী হবে কি করে ?'

মহীন তীক্ষ্ণ হেসে বলল—'তাহলে আপনারা এতদিন মিসেস গান্ধীকে যে আনকোয়ালিফায়েড সাপোর্ট দিয়ে এলেন—সেটা কি ?'

—'এতদিন বলতে কতদিন ? কবে শুরু হয়েছে সমর্থন ? তা কি একদিনক্রমে করা হয়েছে, নাকি মাঝে মাঝে ছেদ পড়েছে ? আর, সমর্থন কি সত্যিই আনকোয়ালিফায়েড, মানে নিঃশর্ত, ছিল ? এখনও কি চলছে সেই সমর্থন পর্ব ? যদি না চলে তবে কবে বন্ধ হল ? আপনার প্রশ্নের ভেতর এই এতগুলি উপ প্রশ্ন আছে।'

মহীন হেসে বলল—'মণিমোহনবাবুকে তোমাদের ডিবেটিং ক্লাবে, বুঝলে দুর্বা…'

বাকি কথাগুলো মণিমোহন আর শুনতে পেল না। মহীনের বান্ধবীর দিকে এই প্রথম স্পষ্ট চোখে তাকাল। কি করছ মণিমোহন, কোনো সম্ভ্রান্তপরিচিতাকে এমন মাস্টারের মতো দেখতে হয় ? মুখে হাসি ফুটিয়ে যেন মহীনের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়াটি দেখার জন্যই সে স্থির দৃষ্টিতে ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে রইল।

তাহলে, ইনিও দুর্বা। হাঁ, সুন্দরী, মডার্ন, পয়সাকড়ি আছে। কিন্তু, আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময় ইন্দ্রজা এঁর নামটা বললেন না কেন ? পরিচয়ও কিছু দিলেন না। ভেরি মাচ আনলাইক করা ইন্দ্রজা। মেরেছে, বুক ঢাঁড়, তুমি উত্তেজিত হয়েছ। নইলে ইংরেজিতে ভাববে কেন ? কিন্তু বাবু অন্যায় টন অন্যায়। স্যার। Where are you my son ? মনে রাখবেন—সামনের বছর, এই দিন। হবে জয়, হবে জয়, লেফট… রাইট…লেফট…হবে জয় হবে জয়, কাটা রেকর্ডের মতো ছুটো মাত্র শব্দ মাথায় কামড় দিচ্ছে। আপনার হাতের লেখা কে জাল করবে, কেনইবা জাল করবে ? আলাপ করিয়ে

দেওয়ার সময় ইন্দ্রদার মুখে কি কোনো বাড়তি হাসি ছিল? কে ভদ্রমহিলা? কি বলছেন আমার দিকে মুখ করে? এত বেশি হাসছেন কেন?

মীনা বলে উঠল—'এ কিন্তু আপনার অন্যায়। মণিদাকে একা পেয়ে কথা শোনাচ্ছেন। ত্রিপুরার জনতা পার্টির সঙ্গে ওরাও তো কোয়ালিশন মিনিস্ট্রি করছে। ওরেস্ট বেঙ্গলে স্টেট ইলেকশনে মোর্চা করার জন্য মোরারজী দেশাইর কাছে গিয়ে ধরনা পর্যন্ত দিয়েছে। একসঙ্গে মন্ত্রিত্ব করবে বলে ঘোষণাও করেছিল। অথচ মুখে বলে জনতাও কংগ্রেসের মতোই বুর্জোয়া পার্টি। এতকাল বলেছে কংগ্রেস বিপজ্জনক বেশি—কারণ তাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা। এখন? এখন তো বাবা স্টেট পাওয়ার জনতা দলেরই হাতে।'

ইন্দ্রদা হা হা করে হেসে উঠলেন। প্রসন্নর মুখ লাল হয়ে গেছে। তবু সে জোর করে হাসি ফুটিয়ে বলল—'বুর্জোয়াদের এক বা একাধিক পার্টির সঙ্গে কমিউনিস্টরা মোর্চা অতীতেও করেছে, ভবিষ্যতেও করবে। দেখতে হবে কখন আর কেন মোর্চা হল। তার অবদানই বা কি।'

মহীন বলল—'রাইট। স্তালিন হিটলারের সঙ্গে নন-অ্যাগ্রেশন প্যাক্ট করেছিলেন, তা নিয়ে নিন্দে-মন্দও কম হয় নি। কিন্তু ভবিষ্যতে বোকা গেল সেদিন ঐ সময়টুকু বাগাতে পেরেছিল বলেই রেড আর্মির পক্ষে ফ্যাসিজমকে পরাস্ত করা সম্ভব হল। চীনে মাও সে তুং কুয়োমিন টাংয়ের সঙ্গে মোর্চা করে জাপানকে তখলেন, তারপর সেই বন্দুকই ঘুরিয়ে ধরলেন চিয়াং কাইসেকের দিকে। পয়েন্টটা ওইখানে—কোন ফ্রন্ট, কার সঙ্গে ফ্রন্ট, কেন ফ্রন্ট আর তার আইটেম-কামই বা কি।'

দূর্বা হেসে বলল—'কংগ্রেস-সি পি আই বিবাহের সন্তানটি অবশ্য মোরিয়াস—কুড়ি দফা পরিবল্পনা।'

—'আর এমারজেন্সি?'

—'না। ওটা একেবারেই বাস্টার্ড ব্যাপার ছাড়া হোর অব এ লেডি—'

মণিমোহন শান্তভাবে গর্জন করে উঠল—'ছিঃ। নিজে মহিলা হয়ে একজন মহিলা সম্পর্কে এইসব বলছেন?'

মণিমোহনের স্বরের তীব্রতায় গোটা ঘরটা চমকে উঠেছিল। সোজা দূর্বার দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগল—'আমার জনাকয় বন্ধু আছে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া কোনো কিছুতেই যাদের বিশ্বাস নেই, অথচ বিপ্লবটাও করে না—কারণ পরিস্থিতি যথেষ্ট পাকে নি। ফলে তর্ক ছাড়া কিছুই তাদের করতে হয় না. দেশের হালটাও একই থাকে। ওদের আমি বলতাম কুড়ি দফা কর্মসূচী আজ মাঠ খারাপ কিছু নয়। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে সামন্ততন্ত্রের অবশেষ উচ্ছেদ করার কাজে এর অবদান ঐতিহাসিক হতে পারত। বণ্ডেড লেবারির অবসান, ভূমিহীন কৃষকের হাতে জমি, হত দরিদ্র-সংখ্যায়ই হোক ভূমিহীনকে যত সামান্য পরিমাণেই হোক জমি বিলি, ক্ষেতমজুরদের ওয়েজ ইনক্রীজ, নিম্ন হরিজনের মনে আত্মমর্যাদার বোধ জাগানো···সুযোগ ছিল অনেক। সরকার বা কংগ্রেস তাই তো ব্যাপারটা স্রেফ চেপে গেল। আর সঞ্জয় গান্ধী জাতিকে উপহার দিল তার ঐতিহাসিক পাঁচ দফা কর্মসূচী—আসলে তার উদ্দেশ্যই ছিল কুড়ি দফাকে হজম করে ফেলা। ক্রমে ইন্দিরা গান্ধী নিজেই তাঁর বক্তৃতায় কুড়ি দফার তুলনায় পাঁচ দফার কথা বেশি বলতে লাগলেন—নইলে গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস পাওয়ার ধরে রাখত। সি পি আই মিনোই টেচাল ইমপ্লিমেন্ট টুয়েন্টি পয়েন্ট প্রোগ্রাম। এই সময় যদি কমিউনিস্ট আর জাতীয়তাবাদী শক্তি—বামপন্থী আর গণতন্ত্রীরা—কংগ্রেস ও সরকারের ইনিসিয়েটিভ হাতে ধরে কুড়ি দফা কিছু পরিমাণেও কার্যকরী করতে পারত, তাহলে গ্রামাঞ্চলে নিঃশব্দ বিপ্লব হয়ে যেত। কিন্তু কি করে হবে? চারদিকে তখন অন্তর্ভাতের সম্পূর্ণ বিপ্লবের স্বপ্ন। আর ইন্দিরা গান্ধী দেখছেন রাজবংশ স্থাপনের খোয়াব। অ্যাচেতায় ভারতের পরিব মানুষ অনুপস্থিত।'

কেন দম নেওয়ার জন্যই মণিমোহন হাসল। ইন্দ্রদার দিকে চেয়ে বলল—'তুমি তো জানো ইন্দিরা গান্ধী সমাজতন্ত্র করবেন একথা কোনোদিন বিশ্বাস করি নি। ধুরন্ধর উচ্চাকাঙ্ক্ষী বুর্জোয়া নেতা তিনি—সাধ্য কি নিজের শ্রেণীস্বার্থের বিরুদ্ধে যান! পুঁজিবাদের সর্বাত্মক বিকাশের মধ্য দিয়েই তিনি ভারতকে অর্থনীতিতে স্বয়ম্ভর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় কুশলী আর কিছু পরিমাণে আধুনিক করতে চেয়েছিলেন—অবশ্যই তাঁর নিজের গর্তে। তিনিই আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি আমেরিকার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের হিম্মৎ দেখিয়েছেন, বছরের পর বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রীতিমতো ধেনতা করেছেন। শান্তি ও সহযোগিতার চুক্তি করেছেন

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মোরিয়াস তাঁর ভূমিকা।'

মণিমোহন আবার দূর্বার দিকে স্পষ্টচোখে তাকাল। গম্ভীর গলায় বলতে লাগল—'কিন্তু যুগটা যে পুঁজিবাদের সংকটের, আর দেশের চাবিকাঠি একচেটিয়াপতিদের হাতে। ফলে ক্রাইসিস বাড়ছিলই। ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যপন্থার এর সুরাহা নেই। তাই সঙ্কটের আবির্ভাব, নিজেও তিনি ক্রমেই আরো দক্ষিণে হেলছিলেন। অথচ মজা হল অবিভক্ত কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়েই ইন্দিরা জাতির মানসপ্রতিমা হয়েছিলেন। আমেরিকার ব্যাপারে তাঁর গলা নরম হচ্ছিল, মার্কিনিশনাল ছুটিয়ে বাংসা শুরু করেছিল, কয়েকটি একচেটিয়া পরিবার জরুরী অবস্থার উনিশ মাসে কোটি কোটি টাকার সম্পদ বাড়িয়েছিল। আর সেই সঙ্গে বাড়ছিল দেশবাসীর দরিদ্র, অসহায়ত্ব।'

মণিমোহন আবার ইন্দ্রাণীর দিকে তাকাল। ক্ষুব্ধস্বরে বলতে লাগল—'ইন্দিরা গান্ধীর পাপ কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। তাঁর কাছে আমার মাত্র একটাই প্রত্যাশা ছিল রাইট রিঅ্যাকশন ভারতের পার্লামেন্টারি ডেমক্রেসি ধ্বংস করতে চায়। আমি বিশ্বাস করতাম নেহরুর কন্যা জীবন দিয়ে তা ঠেকাবেন। নেহরুও বুর্জোয়া নেতা ছিলেন, অবশ্যই বড় মাপের নেতা। নানা দামী কথা বললেও আসলে নেহরুও পুঁজিবাদের ভিত্তিই তৈরি করে গেছেন। কিন্তু তিনি বুর্জোয়া ডেমক্রেসিতে তাঁর ভোটের ওপর আস্থার অভ্রান্ত প্রমাণ রাখতে পেরেছেন, তবে হ্যাঁ, ঐ যা বললুম—ভোটের ওপর। ইন্দিরা গান্ধী কিন্তু পার্লামেন্টের আধিপত্যের নামে ব্যক্তিগত, এমনকি বংশগত, স্বৈরশাসনের দিকে এগোলেন। পার্লামেন্ট, মন্ত্রিসভা, কংগ্রেস দল, গোটা দেশটাকেই তিনি জমিদারির বৈঠকখানায় পরিণত করলেন। আজ জানা যাচ্ছে ডিফেন্স মিনিস্ট্রির এক গুপ্ত অধিবেশনে রাজীব গান্ধী উপস্থিত ছিল। আর সঞ্জয়ের হুকুম ছাড়া তো কিছুই হতে পারে না। এইভাবে তিনি শুধু মোরারজিদের বিরুদ্ধে নিজের জেতা খেলাটাই নষ্ট করেন নি, ভারতীয় গণতন্ত্রেরও সর্বনাশ করেছেন। ফ মাদার অ্যাণ্ড পেট্রন অফ সঞ্জয় গান্ধী অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ইজ, আই মাস্ট সে, ইজ দ্য কীলার অফ ইণ্ডিয়ান পার্লামেন্টারি ডেমক্রেসি। সংসদ নির্বাচনের আগে বম্বের এক জনসভায় তাই স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন—'ইন্দিরা গান্ধীকে আমরা রাইট অফ করে দিয়েছি।'

মণিমোহন দূর্বাকে বলল—'আসলে জানেন, আধুনিক মেকিয়াভিলি এই রমণী প্রায় শেক্সপীরিয়ান ট্র্যাজেডির চরিত্র। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বলে বসলেন ইন্দিরাই ভারত। হুসেনের মতো শিল্পী ছবি আঁকলেন ইন্দিরা দশপ্রহরণধারিণী। নানা ভাষার কবিরা অসম্ভব সব কবিতা লিখলেন। ভাবকপরিবৃতা ইন্দিরা নিজেকে প্রায় অতি-মানবী ভাবতে শুরু করলেন। শুরু হল পতন। বহু যত্নে তৈরি তাঁর নিজের গোয়েন্দা বাহিনীই তাঁকে মিথ্যে খবর দিল। নেহরুর কন্যা তো, স্বৈরশাসন চালাবার জন্যই গণতন্ত্রের খোঁটাতিলকটুকু যে চাই। ডাকলেন নির্বাচন। হয়ে গেলেন সাধারণ এক নাগরিক। উচিত শাস্তিই হয়েছে। আসলে একটা মহান দেশের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে যিনি এইভাবে প্রতারিত করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে সঙ্গতভাবেই এত অভিযোগ আনা যায়, তাঁকে আপনি…'

মণিমোহন থমকে গেল। ঘরণ-ডালার মতো দুহাতে দুটো ডিশ নিয়ে হাতে মুঁইদি আর ছুটলি এসে দাঁড়িয়েছে। ছুটলির পরণে চুমকি, চিকনের কাজকরা মলমলের পাঞ্জাবি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, দুটি বিনুনি কাঁধ ডিঙিয়ে বুকের ওপর পড়েছে।

—'ইন্দ্র। মণি খুব অসুস্থ। ও বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করলেই মাথায় বাঁড়ি মারবে।'

ছুটলি অপ্রসন্ন মুখে বলল—'তাহলে তো মা তোমায় এসে বলতে হয়। বরং রান্নাটা আজ আমি আর বাবাই দেখি।'

মুঁইদি একবার চকিতে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকালেন। কি ছিল চোখে—ক্ষোভ? ভর্ৎসনা? সকলের হাতে কফির কাপ ধরিয়ে দিতে দিতে বললেন—'থাক, আর অত আদিখ্যেতার কাজ নেই। রান্নাঘর থেকে এবার তুমিও কেটে পড়ো বাছা—তোমার ফ্রেণ্ডরা আমাদের ওপর এই বুড়ো-হাবড়াদের বক্তিমে শুনছে আর মনে মনে আমার মুণ্ডুপাত করছে। ওরা তো জানে না এ সংসার এখন তুমিই চালাচ্ছ, গল্প করার সময় পাবে কোথায়?'

ছুটলি ইন্দ্রাণীর দিকে তাকাল। কি ছিল চোখে? ক্ষোভ? লজ্জা?

—'তুমি একটু বোসো না মুঁইদি। কদিন পরে এলুম। রান্না পরে হবে। তারী তো আড়াইজনের রান্না। তাও যদি না গ্যাস থাকত।'

—'আসছি রে। ওর চিকেন স্টুটা—'

মীনা উঠে দু'টাদির হাতটা শক্ত করে ধরে বলল—'বোসো তো। এই ছুটলি, যা সব ক্রীমে ভরে রেখে আয়। ঠ, আমিও যাচ্ছি।'

—'না না, তুমি বোসো না। আমি এক্ষুনি বলে।' সময় আর পার্থর দিকে তাকিয়ে শেষ কথাটা বলে ছুটলি দ্রুত বেরিয়ে গেল।

—'তারপর মহী? বেচারাকে আর কত ঘোরাবে বাবা, এইবার দুপদা বলে ফুলে পড়ো।'

—'এ তো আর তুমি নও যে ইন্দ্র ফোনে বলল আজ তিনটের ক্লি আছ? নেই? চারটের? আসতে পারবে ওয়েলিংটনে? ঠিক চারটের তুমি স্যাঙ্কুআলিতে হাজির হয়ে দেখলে মহীন আর কেউ চায়ে চুমুক দিচ্ছে। ওরা বলল—তুমি? তুমি বললে—তোমরা? তারপর সকলেই একসঙ্গে বলে উঠল ইন্দ্র কই? সে এলো কাড়া আলবৎটা পরে। চুকতেই বলল—চলো চলো। আবার একসঙ্গে সবলে বলল—কোথায়? তখন ইন্দ্র বি গ্রেট ঘাড় চুলকে গরু চোরের মতো মুখ করে তোমায় বলল—ইয়ে, দু'ই, চলো আজ রেজিস্ট্রেশনটা সেরে ফেলি।'

অট্টহাসিতে ঘর ফেটে গেল। সব থেকে বেশি হাসছে দূর্বা। চিৎকার করে দু'টাদি বললেন—'কি গুল, কি গুল। রেজিস্ট্রেশন করে সই করতে হয় না, এক মাসের নোটিশ লাগে না? এই, চুপ করে আছ কেন?'

ইন্দ্রদা বলল—'মহী সবই ঠিক বলেছে, শুধু তোমার ভয়ে গল্পটা একটু উলটে নিয়েছে। আসলে কোনটা করেছিলে তুমি, দেরিতেও এসেছিলে তুমিই। স্যাঙ্কুআলিতে বসে আমরা তো ভয়ে মরি। তোমার ভরসায় চা খেয়েছি। যাকে বলে বেয়ারিং চা খাওয়া। এদিকে তোমারই দেখা নেই।'

আর-এক দফা অট্টহাস। দু'টাদি বললেন—'শালা চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। দূর্বা, মহীর কিছু সিক্রেট তোমায় বলে রাখব, বেশি টাকা চেয়ে করলেই ছেড়ে দেবে। এই যে, বাবাজীবনরা তোমাদের বলছি গো, কনিকর কাপ নিয়ে ওটি ওটি যাও না পাশের ঘরে—এই বুড়ো ভামদের সঙ্গে বসে সন্ধেবেলাটা মাটি করছ কেন? ছুটলিটাইরা আজকাল এত কাজ দেখাচ্ছে কেন? হ্যাঁরে পার্থ, প্রেমে টেমে পড়িস নি তো বাবা? তুই, বাদর? তোর ব্যাপারখানা কি? কদিনই দেখছি সবাই সবাইকে এড়িয়ে বেড়াচ্ছিস। খবর্দার, ছুটলির প্রেমে পড়েছ তো ঠ্যাং ভেঙে দেব।'

—'আহ্ মা!' ছুটলি প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। একটা তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে সে কখন দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে কেউ তা লক্ষ্য করে নি। তার কণ্ঠস্বরের কারুণ্য ও তীব্রতা প্রত্যেককে প্রায় চমকে দিল। সমস্ত প্রগলভতা ভুলে দু'টাদি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ইন্দ্রদা বললেন—'যাও না, তোমরা পাশের ঘরে গিয়ে গল্প করো। মা, মেয়েরটা নিয়ে একটু গানটান শোন। ততক্ষণ আমরা একটু মন খুলে আড্ডা দি।'

ঘণ্টিত অপরাধীর মতো পার্থ সময় উঠে গেল। ছুটলি প্রায় খুলে গেলার আর রেকর্ডের গোছা নিয়ে এদের অনুসরণ করল।

ইন্দ্রদা বললেন,—'দু'ই, তুমি সেই ছোটটিই রইলে আর ছুটলি ওদিকে বড় হয়ে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দু'টাদি বললেন—'তাই দেখছি।' তাঁর বিস্ময়বোধ এতই প্রবল ছিল যে প্রত্যেকেরই নজরে পড়ল। দু'টাদি আবার বললেন—'এই রকমই হয়, না?' দু'টাদির গলায় কান্না। কিন্তু কেন? মণিমোহন ভাবল দু'টাদি কি চান না তাঁর মেয়ে বড় হোক, বাড়ি হোক!

চিরকালের বিদ্রোহী, সংসার আপরূপ এবং ব্যক্তির সামগ্রিক আর অবাধ মুক্তি ও বিকাশে বিশ্বাসী দু'টাদি কি ছুটলিকে নিজের খেলাঘরের পুতুল হিসবেই দেখতে পছন্দ করেন? ঠিক এই অভিযোগেই না তিনি পর পর দুবার বিবাহবিচ্ছেদ করেছিলেন? কিন্তু সে তো দুই প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর ব্যক্তিত্বের সংঘাত। এখানে সংঘর্ষের প্রকৃতি যে একেবারেই আলাদা। এর সমাধান হবে কোন আদালতে?

মণিমোহন বলল—'ইন্দ্রদা, বাঙলাদেশের একজনকে একশোটা টাকা দিতে চাই। সাতাশ টাকা কম পড়ছে। কনক সাত টাকা দিয়েছে, বাকিটা তুমি দাও।'

ইন্দ্রদা বললেন—'শেষ মাসে তোমার কনকের থেকে চাঁদা নেওয়া উচিত হয় নি। আমি সাতাশ টাকাই দিচ্ছি, তুমি কনকের টাকা ফেরত দিয়ে দেবে।'

—'রক্ষে করো, কনক তাহলে কালীঘাটের কুকুর ভাববে।'

দূর্বা বলল—'আমি কিছু ডোনেট করতে পারি না? দেবেন?'

মণিমোহন হেসে বলল—'না।'

ফোঁস করে উঠে পূর্বা বলল—'কেন? আমার কি ক্লায়েন্ট নাই?'

—'না না, ছি ছি।' মণিমোহন হাতজোড় করে বলল—'আপনার বিষয়ে আমি কিছুই জানি না, কেন ওরকম ভাবব? আসলে কি জানেন এই টাকাটা আমি কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নিচ্ছি না, রসিদ দিতে পারব না। অপরিচিত বা সদ্য পরিচিত কারোর কাছ থেকে বিনা রসিদে টাকা নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

মহীন একটা চোখ টিপে বলল—'পরিচিত হয়ে যান, তাহলেই তো লাঠা চুকে যায়।'

মণিমোহন এই প্রথম ছোকরাটিকে চোখ করল। সুদর্শন সুস্বাস্থ্য মূল্যবান পোশাক দামী সিগারেট খা খেকে একটা হালকা সুগন্ধ বেরোচ্ছে চোখে মুখে বুদ্ধি সাফল্য সপ্রতিভতা। আর বাড়িতে তোমার বউটা—পরনে ছেঁড়া শাড়ি, পেট ভরে খেতে পায় না, দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে। আর শত্রুদল বস্তিতে একবুক দেশপ্রেম আর এক-পেট খিদে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের কবিতা লিখছেন। নিজেকে মণিমোহন প্রশ্ন করল Where are you my son?

—'কি, বলুন?'

—'আজ্ঞে?'

—'উত্তর দিন আমার প্রশ্নের?'

মণিমোহন হাতজোড় করে বলল—'একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। অনুগ্রহ করে আরেকবার বলবেন?'

পূর্বা স্পষ্টতই অবাক হল। মুখোমুখি বসে তার কথা কেউ না শুনে পারে এমন অভিজ্ঞতা পূর্বার ছিল না। স্থিরচোখে মণিমোহনের দিকে তাকিয়ে বলল—'বাঙলাদেশের যাঁর কথা বলছিলেন তিনি কি মুক্তিযুদ্ধের সোলিয়া?'

—'না।'

—'মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত নিশ্চয়ই।'

—'ঠিক জানি না।'

—'অনুমানও করেন না?'

—'করি। মনে হয় যুক্ত।'

—'তাহলে ওঁকে সাহায্য করা মানে তো মুক্তিযুদ্ধকেই সাহায্য করা।'

—'বলতে পারেন।'

—'আপনার ব্যক্তিগত নৈতিকতার জন্য এই মহৎ অধিকার থেকে আমি বঞ্চিত হব তো?'

মণিমোহন চমকে পূর্বার মুখের দিকে তাকাল। হাসিমুখে পূর্বা বলতে লাগল—'আপনার ব্যক্তিগত নৈতিকতার জন্য বাঙলাদেশের মুক্তি-যুদ্ধকেও—যত সামানাই হোক—আমার এই সাহায্যটুকু না পাওয়ার ক্ষতি সইতে হবে তো?'

অভিভূত মণিমোহন বলতে লাগল—'ঠিকই তো, ঠিকই তো। আপনি যথার্থ বলেছেন। এ আমি কিছুতেই পারি না। আমার সে অধিকার নেই। আচ্ছা দাঁড়ান। ইন্দ্রদা তো আপনার অনেকদিনের চেনা। চাঁদা আপনি ওঁর কাছে জমা দিন। লোক এসে নিয়ে যাবে।'

—'না।' পূর্বা নিরুদ্বেগে বলল—'এ চাঁদা এক আপনাকেই দিতে পারি। জোন বায়েজের গান শুনতে শুনতে আপনার চোখে জল বেরিয়েছে। জেনেছেন কেউ দেখতে পায় নি। ইয়র চাঁদার্স ওউন ইট। আপনার চোখের জল আপনাকে বাঙলাদেশের হয়ে চাঁদা চাইবার অধিকার দিয়েছে। প্লীজ মণিমোহন, অনার এ লেডি বাই অ্যাকসেপ্টিং ইট।'

—'বেশ দিন। টাকাটা কিন্তু আমি ইন্দ্রদার কাছেই রেখে যাব, পরশু কেউ এসে নিয়ে যাবে।'

—'মান অফ মাই বিলনেস বাগে আমার দু-পাঁচেক টাকা আছে কাল সন্ধ্যের এখানে যদি একবার আসেন দয়া করে—আমি হাজার খানেক টাকা দেওয়ার সুযোগ পাই।'

—'না।' মহীন দৃঢ়স্বরে বলল—'কাল উনি আসতে পারবেন না।'

মণিমোহন চমকে তাকাল। মহীন বলল—'কি যা তা বলছি। মানে, তুমি আসতে পারবে না। কাল আমাদের বক্সির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে না? তুমি চেক দাও।'

—'শোনো।' মণিমোহনকে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত করে ইন্দ্রদা তাড়াতাড়ি বললেন—'চেকই দাও, তবে আমার নামে।'

—'বুঝেছি, ওঁকে আমি কোনো অনুবিধেয় ফেলব না, আপনাকেই বা ফেলতে যাব কেন? আজকাল ইনকাম টাক্স বা হয়ে উঠেছে। চেক আমি নিজের নামে কাটছি, বিশ্বাস।'

প্রসন্ন আর মীনা উঠে দাঁড়াল। মু'ইদি বললেন—'কিরে মিনি, আমাকে চেনে বসিয়ে এখন নিজেরা কাটছিস?'

—'না মু'ইদি, যাই। যে গরম! বাড়ি গিয়ে চান করে বাঁচি। আবার টিউটোরিয়ালের খাতা রয়েছে একগাদা।'

—'হ্যাগো প্রসন্নবাবু, তোমাদের ওসব ছেলে-ফেলের হাঙ্গামা মিটল?

সেই যে বলেছিলে চট্ট জি সি এল চালু হলে প্রত্যেককে পরীক্ষার খাতা দেখতে হবে, আর তার জন্য আলাদা পয়সা পাওয়া যাবে না—'

প্রসন্ন বলল—'নাহ্, কই আর মিটল!'

ইন্দ্রদা বললেন—'দেখালি বটে তোরা। এমার্জেন্সির ভেতর কংগ্রেস কমিউনিস্ট সি পি এম নকশাল তাবৎ দলের অন্যাপক্ষ রাজভবনের সামনে পাশাপাশি বসে প্রতিবাদ জানাল—পরীক্ষার খাতা দেখা না-দেখার স্বাধীনতা খর্ব করা চলবে না। খাতা দেখার মজুরি দিতে হবে দিতে হবে।'

প্রসন্ন বলল—'ভারতের সব পার্টি ভেঙেছে, সব গণসংগঠন টুকরো টুকরো হয়েছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, আমাদের ওভারঅল্‌ফিউটা, একমাত্র গণসংগঠন যা ভাঙে নি, আরো প্রসারিত হয়েছে।'

মীনা বলল—'সি পি আই সি পি এম যখন মুখ দেখাদেখি বন্ধ, সি পি নকশাল যখন খুনোখুনি চলছে, কংগ্রেস যখন সি পি এম ভেঙেছে—ওদের আঙিনায় তখন এইসব দলের মাস্টারমশাইরা পাশাপাশি বসে চা খাচ্ছে আর—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ইন্দ্রদা বললেন—'তা এ বুদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ করছে। মানলুম তোরা ঐক্যবদ্ধ। মহৎ নিদর্শন সন্দেহ নেই। কলেজ টিচারদের মাইনেও ধাপে ধাপে বাড়ছে। কিন্তু তাতে কিছু ফ্রিজ কিছু রেকর্ড' প্রেসার আর পুজোর সময় বোনাস কিছু রেলের টিকিট রিবিট ছাড়া দেশের কোন উপকারটা হয়েছে? শিক্ষা নীতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, সুস্থ সাহিত্য সংস্কৃতি—জাতীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রে জাতির বাবুদের এই ঐক্যবদ্ধ শক্তির ইন্টারভেনশন আছে? কথা কি জানিস প্রসন্ন? ভারতের সব কটা কমিউনিস্ট ও বামপন্থী দল হল পেটিবুর্জোয়া পার্টি। বুর্জোয়া দলগুলির পেছনে বিশ্ব বিজনেস থাকলেও তাদের মূল নীতি মালিক-বাবুরা ঠিক দিলেও—দেশটাকে ইমপ্রেশন করে পেটিবুর্জোয়া নেতা আর কর্মীরাই। একদিকে পুঁজিবিহীন অন্য দিকে প্রত্যক্ষ উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত এই সরলাঙ্গ শ্রেণীকে খুব হিসেবে কিছু কিছু উচ্ছিষ্ট দিয়ে আরো ভরাপেট করা হয়েছে। আন্তর্কেন্দ্রীক উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সর্ববিধ ক্ষমতা বিহীন এই শ্রেণী নানা নামে পরিচয়ে আসলে পুঁজিবাবেরই সেবা করছে, অনেকে অবশ্য না মেনে করছে। এই শ্রেণীর একটি চমৎকার নিদর্শন যদি দেখতে চাও তবে এঁকে ডাকাও।'

ইন্দ্রদা ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি নিজের বুকে রেখেছে বললেন—'হ্যাঁ, আমি। মণি আমার কোচার ছিল, ওর পার্টি মেয়রশীপ ফরাম আমি রেজমেও করেছিলাম। কী রাইট ছিল মণি! ঐ তো দেখছ চেহারার খাঁচাখানা—ফুঁ দিলে উড়ে যায়, অথচ কতজনে যে ওকে—। আর আমি তাকিয়ে থাকো—লেখক হয় নি, সাংবাদিক হয় নি, নেতা হয় নি—পার্টির একজন সাধারণ হোলটাইমার। ওর বন্ধুরা অনেকেই আজ বিখ্যাত, নয় সুখী লোক। কিংবা দুই। আর আমি? যে ওকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে দিয়েছিলাম? চাটা-বিড়লা মোটা লোকের পকেট কাটে। আমি তাদের পকেট কেটে বিজ্ঞাপনের কোম্পানি চালাই। আর মাল খেতে খেতে উপমহাদেশের অসমাপ্ত বিপ্লবের জন্য চোখের জল ফেলি।'

মহীন বলল—'রিডিকিলাস। আজ বড় বেশি চোখের জল পড়ছে। সিচুয়েশন ইজ অ্যাট দ্য—'

—'স্টিল মহী ইজ।' প্রায় ছিটকে উঠে দূর্বা বলল—'পৃথিবীতে এখনও কতগুলো সলেম ব্যাপার আছে তোমার ঠাট্টা সেখানে পৌঁছয় না।'

দাঁতে দাঁত চেপে মহীন উত্তর দিল—'যা তোমার চেনালি সেখানে কাজ করে না। এখন ওঠা হোক!'

—'মহী।' দু'ইঞ্চি ছেটে পড়ে বললেন—'একটি চড়ে তোমার বদন বিগড়ে দেবো। নচ্ছার কোথাকার।'

ইন্দ্রদা হঠ হেসে বললেন—'দূর্বা, তুমি আমার পাশে এসে বোসো। মহীটা চিরকালই ক্রীতদাস।'

দূর্বা উঠে দাঁড়াল যেন ইন্দ্রাণী, রাজরাণীর মতো গ্রীবা ঘুরিয়ে গর্বে অনুকম্পায় একবার মহীনের দিকে তাকাল। তারপর ঝলমল করতে করতে পায়ে পায়ে এসে ইন্দ্রদার গা ঘেঁষে বসে পড়ল। ইন্দ্রদা দূর্বার পিঠে দুই তিন চাপড় মেরে যেন অন্যমনস্কভাবে একটু সরে বসলেন।

দু'ইঞ্চি বললেন—'মণি তুমি এইখানে এসে বোসো।' সকলেই বুঝল দূর্বার আগমনে মহীনের বসার রাস্তা বন্ধ হল। মীনা চোখে চশমা ঘামি নিয়ে একবার মণিমোহন একবার প্রসন্নর দিকে তাকাল।

—'এহ্ উঠতে বলতে এত কষ্ট তোমার?'

—'আধাইটিসটা দু'ই বি দিনে দিনে অ্যাকিউট হচ্ছে। আরও সব উপসর্গ আছে।'

মহীন বলল—'চিকিৎসা করছেন ?'

—'এইবার করব।'

—'ভালো অর্থপেডিক সার্জন কেউ জানা আছে ?'

—'না হাসপাতালে—'

—'হাসপাতালে কি চিকিৎসা হয় ?'

—'ঐ যা হয়।

—'আমি বলব একজনকে ? দেখাবেন ?'

মণিমোহন হেসে বলল—'না। একটু অসুবিধে আছে।

ভুরু কুঁচকে উঠে বললেন—'কি অসুবিধে ?'

—'আমি না দু'ইদি লিখনিরই কলকাতার বাইরে যাচ্ছি। কিছুকাল বাইরেই থাকব।'

—'কোথায় ? কেন ? বৌ বাচ্চা কোথায় থাকবে ?'

—'ওরা আপাতত এখানেই থাকবে—কনকের চাকরি, মিতুর স্কুল। কোথায় তা এখনো ঠিক নেই। আমার নিজের ইচ্ছে ছাড়গ্রামের আদিবাসী অঞ্চলে থাকব। চার জায়গায় আজই চিঠি দিলাম। কৃষকসভা বা ইউনিয়নের কাজ করে যেতে—খাকতে খেতে দিতে হবে, গোটা দশ পনেরো টাকা হাত খরচ পেলে ভালো হয়। বাকি সময়টা পার্টি করব।'

—'একেবারে ক্ষেপে গেছ ? এই শরীর নিয়ে একা গাঁয়ে থাকবে ? কনক রাজি হল ?'

—'কেন ? ওখানেও নিশ্চয়ই ব্লকের সেন্টার আছে। গ্রামের লোকেরও তো চিকিৎসা হয়।'

—'কিন্তু কেন ?'

—'প্রথম কারণ পার্টি হোলটাইমারের সংখ্যা কমাবে, ওদের দিতে পারছে না। এম এল এ-এম পি দের কয়েক হাজার টাকা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল তো ! আমরা অনেকে ভেবেছি পার্টিকে বলব কয়েক দিতে হবে না। বুঝলে ইন্দ্রদা, জ্যোতিষবাবু ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন। আর নতুন বিয়ে করেছে আমাদের এক বাচ্চা কমরেড, বেচারার বেশি এখনও কলেজে পড়ে। সেও জানাবে। ভেবো না আমি একা খুব দারুণ কিছু করছি। দ্বিতীয় কারণ—ছাত্রজীবন থেকে সারে রাজনীতি করলাম। এবার আসল জায়গায় যেতে চাই।'

ইন্দ্রদা বললেন—'শরীরটা একটু সারিয়ে তারপর যাও। ঠিকই তো, এই পেটিবুর্জোয়া পরিবেশ থেকে বেরোতে না পারলে কিছু হবে না। পেটিবুর্জোয়া ইন্টেলেকচুয়ালগুলো পার্টির ভেসে সাজানো উচিত, কিন্তু কিছু একেবারে তুলে দিলে ভালো হয়। আমি প্রথম মন দেওয়াছিলাম চাইনীজ কনসালেটে। তারপর একটা টেনডিটিলনের জন্য ওঁত পেতে থাকতাম। চোরাই-এ হল। যাক, এসব কথা বলার কোনো নৈতিক অধিকার আমার অবশ্য নেই। কিন্তু তুমি অন্তি একটু অপেক্ষা করো, শরীরটা কাজ চালাবার মতো সারিয়ে নাও।'

মণিমোহন বলল—'কিন্তু ইন্দ্রদা, সিদ্ধান্ত আমাদের এখন নিতে হবে। পার্টিকেও তো এবার একটা ডিসিসনে আসতে হয়।'

—'কালই তো'—বলতে শুরু করে মহীন হঠাৎ চুপ করে গিয়ে সিগারেট ধরাতে লাগল। মণিমোহনের বুকটা ধক্ করে উঠল। মাই গড। কালই তো কি ? মাই গড। দুর্বা। অবনের মতো এই লোকটাও কাল দেখা করতে চাইবে নাকি ? কিন্তু একটু আগে নিজেই তো বলল কাল আমি আসতে পারব না। বলে আবার কথাও চাইল, বলল—ওরা আসতে পারবে না। জানে নাকি কেন কাল আসার অসুবিধে ?

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মহীন বলল—'কি লাভ ? ততদিন না কমিউনিস্ট ইউনিটি হচ্ছে সবটাই হবে ভস্মে ঘি ঢালা। বুঝলেন প্রসন্নবাবু, যদি আপনাদের পার্টি মেম্বার। ভালো ছেলে, ইনকাম টাকাকে ভালো প্রাকটিস। নেতাদের কাকে বোকাতে গিয়েছিল। খেয়েছে দাবড়ানি। ও ও ছোড়নেওয়ালা পার্টি নয়। বাড়িতে কাল কাকে কাকে চায়ে ডেকেছে। কিছু নকশাল, কিছু সি পি এম, সি পি আই ইন্টেলেকচুয়ালও কয়েকজন থাকবে। আমি বলেছি—যো অন মেজ বস। কোনো চাপের সামনে মাথা নত করবে না।'

মণিমোহন স্থির দৃষ্টিতে মহীনকে দেখছে। লোকটি একবারও আমার দিকে তাকাচ্ছে না, যেন চেনা নেই। তাহলে এই মহাত্মাও কমিউনিস্ট ইউনিটির প্রবক্তা ! বলছে—কোনো চাপের সামনে মাথা নত কোরো না। এসব মানে কি, মণিমোহন, মানে কি এসবের ? আমি নিশ্চয়ই আন্টি ইউনিটি হয়ে যাব !

হঠাৎ মণিমোহনের দিকে ঘুরে মহীন বলল—'আপাতত কিছুদিন কলকাতায় চাকরি নিয়ে থেকে চিকিৎসাটা করান না। পরে ছেড়ে দেবেন !'

—'কি চাকরি করব ? ইন্দ্রদা আমায় স্নেহ করেন তাই অনেক কিছু বললেন। আসলে আমি যে একেবারেই অপদার্থ।'

—'লাইট অফ এশিয়া গ্রুপ. বুঝলি ইন্দ্র, সামনের মাস থেকে কলকাতায় একটা লাক্সুরেস হোটেল বার করছে। এক কোটি টাকা নিয়ে নামছে।'

—'জানি।'

—'মণিমোহনবাবু তো ওখানেই একটা দারিংয়ের চাকরি পেতে পারেন। হাজারখানেকের ওপর দেবে।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে মণিমোহন তাকিয়ে রইল। ইন্দ্রদা বললেন—'কি মণি, করবে নাকি চাকরিটা?'

—'কেন করবেন না? ওঁর স্বাধীন মতামতে তো আর কেউ হাত দিতে যাচ্ছে না।'

স্বাধীন এই শব্দটি যেন কাতুকুতু দিতে মণিমোহনের ঘোর ভাঙাল। হেসে ফেলে বলল—'লাইট অফ এশিয়া গ্রুপে স্বাধীন সাংবাদিকতা? যতদিন বাঁচি শাঁখা সিঁদুরটুকু বজায় রাখতেই চাই।'

থমথমে গলায় দুর্বা বলল—'আপনার বড্ড অহঙ্কার, না?'

মণিমোহন বলল—'ঈশ্বর জানেন আমার বুকে অনবরত রক্ত ক্ষরছে। আর বেদনা···কান্না···'

—'ইন্দিরার কোর্ট জেস্টারদের মুখে দেশপ্রেমের এই বড়াই, ভাল ইট মুক ডিসেন্ট, ব্রিটার কি যেন? হ্যাঁ, রামমোহনবাবু?'

প্রসন্ন বলল—'চল মণি এবার ওঠা যাক। ওঠো গো। দু'ইদি চলি। নেলাম ইন্দ্রদা।

—'না না, আপনাদের আর এগিয়ে দিতে হবে না। হ্যাঁ, গুডনাইট।'

রাস্তায় পা দিয়ে মণিমোহন বলল—'কটা বাজল রে?'

একই সঙ্গে ওরা হাতঘড়ি দেখল। প্রসন্ন বলল—'নটা বাইশ।'

মীনা বলল—'তোমার বাড়ি পাঁচ মিনিট ভাস্ট।'

নিঃশব্দে কয়েক পা হেঁটে প্রসন্ন বলল—'মণি, কেন তুই আমাদের পার্টিতে এলি না। কেন আজও ওখানে পড়ে আছিস?'

মণিমোহন থমকে দাঁড়িয়ে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল. প্রসন্নর কণ্ঠস্বর মীনাকেও কম অবাক করে নি।

তারপর হেসে মণিমোহন বলল—'এ. এটা তুই কি বললি—সাত কাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার বাপ? কমিটমেন্ট পার্টি ছেড়ে আমি কোথায় যাব?'

—'তেষট্টি সালে বলেছিলি, তবু তার মানে ছিল। আজও তোর মুখে সেই কথা।'

—'হ্যাঁ। আজও তাইতো প্রাসঙ্গিক।

—'মার্কসবাদ কোনো ধর্মবিশ্বাস নয়।'

—'বটেই তো। মার্কসবাদ বিজ্ঞান, সেই তত্ত্বকথাই তো পাঁচে বাচ্ছি। এ, বিরাট আর বিচিত্র এই দেশ। শুধু ওদেরই বেদন আর ত্রিপুরা দিয়ে এর ভাষা নির্ধারিত হবে না। না, শুধু কেরালা দিয়েও না। সাম্রাজ্যবাদের গ্লোবাল স্ট্রাটেজির মোকাবেলা করা আর কারুরকে তার নিজস্ব নিরিখে পরিস্থিতি পরিমাপে পৌঁছে দেওয়ার শক্তি একা কমিটমেন্টের নেই। তাই সে সহযাত্রী খোঁজে এবং খুঁজবে।'

—'তাই বলে হাতে এয়ার্ডেলির রক্তের দাগ বজায়ো? মাকে, জনগণকে, ত্যাগ করা?'

—'আমরা কিছু কিছু ভুল করেছি। কিছু কেন, বলা উচিত অনেক ভুল করেছি। কিন্তু সে ভুলের কারণ কোনো ব্যক্তির স্বার্থ নয়, এমন কি নিজেদের সংকীর্ণ পার্টি-স্বার্থও না। চিলির ঘটনা আমাদের বিচলিত করেছিল। পরে বুলগেরিয়া-হাঙ্গেরি আমাদের আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করে। ভেবে দেখ দুরন্তের পঞ্চাশের দশকের সেই দিনগুলো। সাম্রাজ্যবাদ আর দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার যৌথ আক্রমণ থেকে আমরা ভারতের সাংবিধানিক গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম এই দেশকে কয়েক টুকরোয় ভাগ করার ষড়যন্ত্র রুখতে। শুধু সেই কারণে. বিশ্বাস কর—শুধুই সেই কারণে পেছার দিকে অনেক কিছু আমরা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছি। পরে, আজ বিশ্লেষণ ঠেঙানো গেল, ভেবেছিলাম ওসব কড়কালা করা যাবে। অনেক কিছু আমরা জানতাম না। স্বয়ং চাবন বলেছেন প্রেস সেনসরশিপ চালু থাকার ফোটা ভারতে কোথায় কি হচ্ছে কংগ্রেস বসই তা জানতে পারে নি। আর. যে খেলার যা নিয়ম—জানা সত্ত্বেও অনেক কিছুর ওজর বুঝতে আমরা ভুলে গিয়েছিলুম। আমাদের আসি পাপটা ছিল এইখানে, বুঝতে পারি নি আমরা ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। বুঝতে পারি নি যে লোকে কংগ্রেস বল থেকে আমাদের আলাদা করে দেখতে ভুলে যাচ্ছে। এত বড় কথা বললি—যাকে আমরা ত্যাগ করেছিলাম। কিন্তু মনে রাখিস গোটা ভারতে আমরাই একমাত্র পার্টি, যে. প্রাথমিক একটা পর্যায়ের পর একা কিছু নিরবচ্ছিন্নভাবে সংবিধান-বহির্ভূত ক্ষমতা চক্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছিল। তোরা নয়। অন্য কেউ নয়।

কিন্তু সেই বিরোধিতা লোকের মনে কোনো দাগ কাটে নি। লোকের আস্থা চলে গিয়েছিল আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। রাত্রিতে ঘুম হয় না। গণতন্ত্র রক্ষা করতে গিয়ে কত বড় স্বৈরতন্ত্রকে আমি সমর্থন করে বসেছি। ঠিকই তো, জরুরী অবস্থার হতাশ পালের পতনের দায় আমি কি করে অস্বীকার করব?'

কয়েক পা নিঃশব্দে হেঁটে মণিমোহন হাসিমুখে বলল—'কমিউনিস্ট পার্টি ভুল অতীতেও করেছে, আবার হয়তো ভবিষ্যতেও করবে। আমরা তো ভুলের প্রকৃতি আলাদা, গুরুত্বও সাংঘাতিক। কিন্তু দেশের মানুষের কাছে আমরা নতজানু হয়ে ভুল স্বীকার করেছি। দেখবি তুই, ভারতের রাজনীতি ছ-মাসের মধ্যে অন্য খাতে বইবে। দেখবি বামপন্থীদের এপাশে সামনের সারিতে কমিউনিস্টরাই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রু, তোদের ভুল তোরা আজও স্বীকার করলি না। যুক্তফ্রন্টকে বাঁচানো গেলে ইতিহাস অন্য হত, গোটা দেশে তার প্রভাব পড়ত। পশ্চিমবঙ্গে তো কংগ্রেস ডুবেই গিয়েছিল। তোদের বড় পার্টির দম্ভ আর সংকীর্ণ স্বার্থ সব তছনছ করে দিল। অথচ আজও প্রমোদবাবু যুক্তফ্রন্ট ভাঙার দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে হাত ধুয়ে ফেলছেন। গণতন্ত্রের লড়াই লড়তে গিয়ে কংগ্রেসের ক্ষেত্রে যে ভুল আমরা করেছি—সেই একই ভুল তোরা করছিস জনতা পার্টির ক্ষেত্রে। তোরা মনে রাখছিস না জনতা পার্টি মানে হল একদিকে মার্টিন্যাশনাল অন্যদিকে গোহত্যা নিবারণ আর হরিজন হত্যা। আমি নিশ্চয়ই জানি একদিন লোকে তোদেরও প্রশ্ন করবে—যেদিন যখন আলা-ঐলা-নিরপেক্ষ অর্থনীতি চালু হচ্ছিল, তখন তোমরা কি করছিলে? বলবে—দেশকে যারা আমেরিকার কাছে বেচে দিতে চায়—তোমরাই না ছিলে তাদের সহযোগী, বল?'

প্রসন্ন বলল—'তুই কি আমাকে তোর পার্টিতে ডাকছিস নাকি?'

মণিমোহন বলল—'ক্ষেপেছিস? আমি পাগল বলে কি তত পাগল যে তোদের এই নির্বান্ধব জগতের আত্মসন্তুষ্টির মধ্যে তোর মতো একজন তোটারের সি পি এম কমরেডকে আমার ঐক্য ও সংগ্রামের, বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের, রাজনীতি বোঝাতে যাব?'

প্রসন্নর মুখ দেখে বোঝা গেল সে বিরক্ত হয়েছে। মণিমোহন তার হাত ধরে বলল—'আমি তোদের পর নই। তোদের পার্টিতে আমার কত মাসি পিসি ভাই বন্ধু পাড়া রয়েছে। এ যে রক্তের সম্পর্ক। রাগ দেখাই গাল দিই বিরোধিতা করি আবার ভালোও বাসি। কটা বছর তোদের অনেক সইতে হল। কি করে জানবি কত রাত আমি তোর এবং আরো কতজনের কথা ভেবে ঘুমোতে পারি নি। সীট অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য তোরা জনতা পার্টির পা ধরতে যাচ্ছি রাখছিস দেখে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়েছে। অ্যাসেম্বলি ইলেকশনে আমাদের কোনো ক্যানডিডেট ছিল না, আমি সি পি এমকে ভোট দিয়েছি। তোরা মস্তিষ্ক করছিল—আমি খুব খুশি। আমি চাই তোরা থাক, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ কর। তোরা যদি ব্যর্থ হস তাহলে হাতে বামপন্থী শক্তির ক্ষতি, দেশের ক্ষতি, আমাদেরও ক্ষতি। প্রু, তোরা যদি অন্তত কিছুটাও এইভাবে ভাবতি তাহলে বামবেধে ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে হারিয়ে অশোককৃষ্ণ দত্তকে জেতাতে পারতি না।'

—'ততদিন কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ না ছাড়ছিস ততদিন তোরা শত্রু

—'জনতা পার্টির সঙ্গে এত ঠাট্টাবেলা সত্ত্বেও তোরা আমার শত্রু নস। আমার শত্রু আমেরিকা, পুঁজিবাদ, প্রতিক্রিয়া।'

মণিমোহন হাসল—'বক্তৃতার মতো শোনাল, কিন্তু মনে করিস না। আমার মন ভালো নেই। সামনেটা আমি ভালো দেখছি না। অনেক বড় বড় বিপর্যয় হতে পারে। ইন্দিরা গান্ধীকে আবার ফিরিয়ে আনা হতে পারে। জেলখানার দেশে পাশাপাশি থাকার সময় হয়তো তোরা আর আমরা কাছাকাছি হব।'

প্রসন্ন মৃদু হেসে মণিমোহনের কাঁধে হাত রাখল। মীনা হঠাৎ বলে বসল—'মণিদা, রাত তো বেশি হয় নি, একবার আপনার বাড়ি গেলে হয় না?'

প্রায় চমকে উঠে মণিমোহন বলল—'আমার বাড়ি? যাবে? দারুণ হয়!'

প্রসন্নর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ফ্যাল ফ্যাল করে সে মীনার দিকে তাকিয়ে রইল। ক্রমে তার চোখ কুঁচকে গেল, চোয়াল শক্ত হল, আস্তে কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল—'সরজিৎদের ওখানে যাবে না?'

—'কাল গেলেই হবে। তোমার অসুবিধে হবে?'

—'হবে না? খাওয়ার নেমন্তন্নটা আজ, তুমি যাবে কাল!'

—'খাওয়ার নেমন্তন্ন? কই তুমি তো

—'তোমাকে সারপ্রাইজ দেবো।'

মীনা হেসে বলল—'তাহলে থাক। তোমার বসন অনুযায়ীই হবে…'

প্রসন্ন মিথ্যেটা সেভাবে হাসি দিয়ে প্রকাশ করে দিল। বলল—'দাঁড়ান মণিদা, আপনাকে কিছু ফুল কিনে দি।'

পরপর কয়েকজন বসে ফুল বিক্রি করছিল—রজনীগন্ধা, লাল গোলাপ, চাঁপা। বেল আর যুঁইয়ের মালা। মীনার পেছন পেছন ওরা ফুটপাতের এই কোনটায় এসে দাঁড়াল।

লাল গোলাপের একটা গোছা মণিমোহনের দিকে এগিয়ে ধরে মীনা বলল—'নিন মণিদা।'

মণিমোহন হাসিমুখে ফুলটা নিল। প্রসন্ন হঠাৎ মণিমোহনকে জড়িয়ে ধরে বলল—'কনককে বলিস। আমরা একদিন যাব।'

একটা মিনিবাস থামিয়ে প্রসন্ন আর মীনা চলে গেল। মণিমোহন আবার সেই দোকানে ফিরে এল। অকারণে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে কটাচাপা কিনল তারপর বাসস্টপে এসে দাঁড়াল।

চাঙা লোকটি ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছিল—যেখানে, বাসের দেওয়ালে, এখনও জ্বল জ্বল করছে জরুরী অবস্থার অনুজ্ঞা : "কথা কম কাজ বেশী"।

—'তাড়া পঁচাত্তরটি মিনিট, চিন্তা করুন, স্টেট বাসগুলোও কি সিদ্ধার্থ রায় পকেটে পুরে নিয়ে গেল মশাই? খালি কমিশন বসাচ্ছে—কি সেন্টারে কি স্টেটে। ইলেকশনের সময় তেলের দর এগারো টাকা হতে বাবুরা বললেন ইন্দিরা গান্ধী তেল কলের টাকা খেয়েছে—দাম বাড়বে না? বিপুল সব উল্টে। ছুত লেখা হল—তেল আর ছেলে টাঁসকরাতে মেলে। সর্ষের তেল এখন চোদ্দ টাকা কিলো। টাকা আজ কে খাচ্ছে মশাই? কেন এত লোডশেডিং হয়, কেন সব রুটে বাস উধাও হয়ে গেল, প্রত্যেকটা জিনিসের দাম কেন প্রতিদিন বাড়ছে—এসব নিয়ে কমিশন কোথায়? বলেছিলে বেকার ভাতা দেবে—কেন দিচ্ছ না?'

নিপুণ অভিনেতার মতো প্রতিবার লোকটি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় 'কেন' শব্দটা উচ্চারণ করল। কনডাক্টর সহ বাসের যাত্রীরা অনেকেই মন দিয়ে তার বক্তৃতা শুনছিল। মণিমোহন লক্ষ্য করল ইন্দিরার পক্ষে বা বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে বলার জন্য একজনও আপত্তি প্রকাশ করল না।

কিন্তু বক্তৃতা বন্ধ হল। হঠাৎ শটকা ফটার শব্দ। মণিমোহন চমকে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল মহানন্দে পাতাল রেলের কাজ চলছে। ফ্লাড লাইটের আলোয় জায়গাটা দিনের মতো ফুটফুটে। ক্রেন। মাথায় সাদা হেলমেট পরা একজন ফোরম্যান। কিছু মজুর। "কলকাতার বুকে আমরা জুড়ে দিতে চাই সেই শুটি ডানা যার অপর নাম গতি।" মস্ত বড় হোর্ডিং আলোয় ঝলমল করছে।

বাসটা দাঁড়িয়ে গেল। টায়ার বার্স্ট করেছে, ব্রেক ডাউন। হুড়োহুড়ি করে সব নেমে পড়ল। যাত্রার কান্না, নারীকণ্ঠের বিলাপ, এক যুবকের গর্জন—'স্টেট বাস যমটিওলে ছাপিয়ে দিতে হবে। এক ঘণ্টায় একখানা বাস…তারও টায়ার পাংচার। কেন? বেরোবার আগে চেক করতে পারো নি? এক একটা বাস পিছু তো আটজন করে লোক পোষা হচ্ছে।

এক বৃদ্ধ এক যুবককে বললেন—'আর মিলিটারির হাটু আগে এসে এখানেই দলটা বানাবে।'

যাত্রীরা টাটা সেন্টার এর সামনে ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাসটা এক ধারে সার্ভ করা হচ্ছে। একটা মিনিবাস দাঁড়িয়ে পড়ল—দু তিনজন উঠে গেলেন। কনক আজ তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছিল, ফুলও ফুটে গেছে। কিন্তু তার বাসে আরেকটা পেতে ঘণ্টাখানেক লাগবে। বলতে বলতে যাওয়া যায়—তিনবার টিকিট কেনার পয়সা নেই। তাড়াহুড়ি বুকের ওপরটা একবার ছুঁয়ে দেখল, না, পকেটের টাকাগুলো ঠিকই আছে। আজ আর হল না, ভাদুড়ীদার বাড়ি কাল যেতেই হবে।

দুজন কণ্ডাক্টরই বেশ ভালো। যারা ভয় পেয়েছে তাদের জনে জনে প্রবোধ দিল—বাসে আপনাদের তুলে না দিয়ে আমরা কেউ বাড়ি ফিরব না। কিন্তু ভিন্ন বাস ধরে তারা কাঁধেপিঠের কিছু কিছু যাত্রীকে একে একে তুলেও দিতে লাগল।

মণিমোহন পেছন ফিরে ফুটপাতটা দেখল। হ্যাঁ, ঐ দরজার সামনে সিঁড়িটায় বসা যায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তিন-চারজন ভদ্রমহিলা ঐখানে একটা গ্রুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। বেচারা, হয়তো হয়তো পা ধরে গেছে,

কিন্তু রাস্তায় বসার সঙ্কোচ কাটাতে পারছেন না।

পায়ে পায়ে মণিমোহন সিঁড়িতে গিয়ে বসল।

আহা, কলকাতার বুকে আমরা জুড়ে দিতে চাই সেই দুটো ডানা। ফেন চলছে। অপারেটরের কেবিনটা এখন দোতলা উঁচুতে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে লোহদণ্ডের ওপর হাতুড়ির ঘা পড়ছে এক দুই তিন চার পাঁচ আবার শুনল। এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ ঘা পড়ছে পাঁচ সেকেণ্ড অন্তর যেন কিছু হয় নি। বড়জোড় দশটা চৌরঙ্গির মোড়ে এখনও সন্ধ্যা। কিন্তু মহানগরীর অন্য প্রান্তে রাত। মাঝে মাঝে ছায়া ছায়া অন্ধকার লোক কম। তবু রাস্তায় গাড়ি চলার কোনো বিরাম নেই।

—'আপনার ঘড়িতে কটা বাজে?' দূরে দাঁড়ানো সেই দলের একটি মেয়ে হঠাৎ ছিটকে এগিয়ে এসে ধম চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল।

—'আমার তো ঘড়ি নেই।' অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিতে দিতে মণিমোহন মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল আর, কিসে যেন তাকে কামড়াল। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে সে টলে পড়ে যাচ্ছিল। মেয়েটি তাকে দুহাতে ধরে ফেলল। 'না-আ'—অস্ফুটে মণিমোহন প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। ভয়ে মেয়েটি ছিটকে সরে দাঁড়াল। আর তখনই হেড লাইটের তীব্র আলোর ফুটপাতের এই অন্ধকার কোণটা কালা কালা হয়ে ফিরে গেল। একটা প্রিজন ভ্যান, হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছিল। মণিমোহন দেখল অল্প বয়েসী একটি মেয়ে, তার অস্তিত্ব ভুলে শুধু ভয়। জানে না এবার কোন দিকে পালাবে। মনটা হায় হায় করে উঠল। কিন্তু, বাসের অপেক্ষমাণ যাত্রীদের দিকে চোখ পড়া মাত্র সমস্ত বেদনা-বোধ উবে গিয়ে মণিমোহনের অন্তরাত্মা একেবারে শুকিয়ে গেল। কি করবে কিছুই যখন বুঝতে পারছে না, প্রিজন ভ্যানটা ঠিক তখনই স্টার্ট নিয়ে চলে গেল। দূরে দাঁড়ানো মেয়েগুলি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এসে অল্প বয়েসী মেয়েটিকে বকতে লাগল—'পালালি কেন রে চুড়ি নিজেও মরবি, আমাদেরও একদিন মারবি।'

মণিমোহন দেখল সেই মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে। মেয়েটি এক লম্বা শ্বাস ফেলল, তারপর হাসল। বলল—'চলো চলো।' দু-পা এগিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে মণিমোহনকে বলল—'ভদ্দরলোক।'

—'কি হয়েছিল দাদু? মাগি-গুলো এত দৌড়ঝাঁপ করছিল কেন?' প্রায় অভিযোগের সুরে এক বৃদ্ধ তাকে প্রশ্ন করলেন।

মণিমোহন বাসযাত্রীদের দলে ফিরে আসামাত্র সকলে তাকে ঘিরে ধরেছে। মণিমোহন শান্তভাবে বলল—'ঠিক জানি না।' বৃদ্ধের অশালীন শব্দ প্রয়োগের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাবার সাহস শক্তি কিছুই সে খুঁজে পেল না। অথচ দুর্বাকে বমক দিয়েছিলাম। ভণ্ড!

মুচকে হেসে একজন প্রশ্ন করল—'ঐ অন্ধকারে কি করছিলেন?'

—'আর দাঁড়াতে পারছিলাম না। ঐ সিঁড়িতে একটু বসেছিলাম।' কেন আমি এত ব্যাখ্যা করছি? কারা এরা?

—'বসার পক্ষে ভালো আয়গা। নয়?'

মণিমোহন উত্তর দিল না। ভদ্দরলোক! এ সবই তো তার প্রাপ্য। পারো নি, পারো নি তুমি নামহীন সাধারণ হতে। সমস্ত সাফল্যের পথ পরিহার করে একদিন চেয়েছিলে অ্যাবসলুট অ্যাননিমিটি। অথচ, পেটি বুর্জোয়া সামাজিক সম্ভ্রমটুকু অক্ষত রাখতে কত ছেলেমানুষই না তুমি হতে পারো।

—'দাদুর হাতে আবার লাল গোলাপ।'

—'যাদু আমার রসিক নাগর।'

হে হে হে। সেই কুড়ি-পঁচিশ জন লোক মণিমোহনকে ঘিরে টেনে টেনে হাসতে লাগল। দুটি জোয়ান ছেলে সিটি মারল।

স্থির দাঁড়িয়ে জ্বালাভরা চোখে মণিমোহন তাকিয়ে রইল সামনের আলোকিত অন্ধকারের দিকে। তার কান্না পেল। বড় বেশি করে কনকাকে মনে পড়ছে।

অনেক রাতে মণিমোহন বাস থেকে নামল। চারদিকে অন্ধকার—লোডশেডিং। দুটি একটি দোকানের ঝাঁপ খোলা—লণ্ঠন জ্বলছে।

আর, চরাচর ব্যাপ্ত করে হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল। মণিমোহনের হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। সে ভয় পেল। 'এইবার'—কে যেন কাকে চিৎকার করে বলল। চমকে তাকিয়ে মণিমোহন দেখল আশে-পাশের অনেক ছাদেই মানুষের

ঘটনা। অন্ধকারে, তাই খেয়াল করে নি।

মিলিটারির টার্চ্চ আকাশে এখন দুটো উড়ছে। ছেলেবুড়ো মেয়ে পুরুষ সবাই তাই হাতে উঠেছে।

ওদিকে ওদিকে সাইরেনের একটানা আওয়াজ। আর অন্ধকার।

—'ওই যে, ওই শুরু হয়ে গেল।' একটা মেয়েলি গলা যেন মণিমোহনের কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল।

চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল কেউ নেই। চমকে চারদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ নেই।

—'ও-ই ও-ই শুরু হল।' একটা মোলায়েম চিৎকারে আকাশ চিরে গেল। দোকানের লোকগুলিও ছুটোছুটি নেমে এসেছে। ঘাড় তুলে মণিমোহন দেখল আকাশে আলোর মালা। দুলছে। তারপরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়তে লাগল।

প্রায় টলতে টলতে মণিমোহন বাড়ির রাস্তা ধরল। অন্ধকার এখানে আরও জমাট। কিন্তু সবগুলো বাড়িই জেগে আছে। ছাদে উঠে উৎসবের মেজাজে মিলিটারির বাড়ি পোড়ানো দেখছে।

রক্ত গোলাপের গোছাটা বুকে জাঁকড়ে মণিমোহন বাড়ির কড়া নাড়ল। তারপর বলল—'দরজা খোলো। কনক, আমি এসেছি।'

উদয়শঙ্কর ও লোকায়ত জীবন

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

১৯৩১ সালের ২২ জুন। ঐদিন হিটলার আক্রমণ করল সোভিয়েত ইউনিয়ন। এর আগে স্পেনের ফ্যাসিবিরোধী মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৩৬ সালে এদেশে গঠিত হয়েছিল প্রগতি লেখক সংঘ।

সমাজতন্ত্রের প্রথম দুর্গ আক্রান্ত হওয়ার পর প্রগতি লেখক সংঘ রূপান্তরিত হল ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ নামক সংগঠনে।

এর কিছুদিন আগে ভারত তরুণ লেখক সোমেন চন্দ ফ্যাসিবাদী গুণ্ডাদের হাতে নিহত হয়েছেন।

নতুন সংগঠন গঠিত হওয়ার পর আরও স্পষ্টভাবে এগিয়ে যাওয়া গেল সমাজতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবিরোধী লক্ষ্যের দিকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উদয়শঙ্করের গণনাট্য আন্দোলনের সংযোগে আসা একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

কবি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে আমরা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে যুক্ত থাকতে দেখেছি। তাঁর কাছে তখনকার বহু প্রসিদ্ধ গান, যেমন 'দুরন্ত ঝড় হো যদি' এবং 'আজ নতুন করে নাচতে হবে' প্রভৃতি গান আমরা অনেকেই শিখে নানান জলসায় দল বেঁধে গেয়ে বেড়িয়েছি।

তিনি এলাহাবাদে ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী নট, সঙ্গীতশিল্পী, কবি ও সুরকার। তাঁকে পেয়ে আমাদের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন বহুভাবে পুষ্ট হয়েছিল।

আধুনিক সংস্কৃতিক সঙ্গীতের তিনি ছিলেন প্রধান প্রবক্তা ও পথিকৃত।

ইতিমধ্যে সেই সময়ে তাঁর নৃত্যশিল্প দেখিয়ে বহুবার মানুষের মনোরঞ্জন করেছেন ও আমাদেরও অনুপ্রাণিত করেছেন।

গণনাট্য সংঘে যে নৃত্যছন্দ হওয়া উচিত সে চেতনাও তিনি এনে দিয়েছিলেন।

ঠিক এই রকম একটা সময়ে উদয়শঙ্করের আলমোড়া কালচারাল

সেন্টারের অনেকেই গণনাট্য যোগ দেওয়ায় (বিশেষভাবে শান্তি বর্ধনের নাম উল্লেখযোগ্য) গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় দল সংগঠনের কাজে সাহায্য হয়।

এরপর ১৯৪০ সালে বোম্বাই সম্মেলনে এই সংগঠন প্রগতি লেখক সংঘ ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘে বিভক্ত হয়ে যায়।

এই গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠার সূত্রেই আমরা পেয়ে গেলাম কবিতা, গান, নাটক ও নৃত্যকলার প্রচেষ্টা।

ঠিক এই সময়ে চলছে বাংলাদেশে মন্বন্তরসৃষ্ট পঞ্চাশের মন্বন্তর। অন্যদিকে ভারতের পূর্ব সীমান্তে হানা দিচ্ছে জাপানী ফ্যাসিস্টরা।

এই সময়ে আলমোড়ায় বিখ্যাত উদয়শঙ্করের আলমোড়া কালচারাল সেন্টার খোল হোচ্ছে।

ক্রমশঃ নৃত্যের যাদুকর উদয়শঙ্কর এর আগেই দেশের সাধারণ মানুষের লোক সংগীত, লোকনৃত্য প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'রাজপুত নৃত্য', 'সাঁওতাল নৃত্য', 'অগ্নি নৃত্য,' 'মানি এ্যাণ্ড মেসিন' প্রভৃতি সৃষ্টি এই প্রেরণারই ফলশ্রুতি।

তিনি ছিলেন মানবপ্রেমী। কাশ্মীর সাধারণ মানুষ, পাহাড়ী উপজাতি বা আসাম, মণিপুর, রাজস্থানী ও অন্যান্য জাতি উপজাতিদের নৃত্যশৈলীকে তিনি তাঁর নৃত্য রচনায় অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপিত করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, তাঁর বাদিত সংগ্রহে বহু লোকবাদ্যযন্ত্র বিশিষ্ট স্থান পেয়েছিল।

সুতরাং যখন শুনতে পাওয়া গেল যে উদয়শঙ্কর বোম্বাইয়ের মজুরদের নামমাত্র মূল্যে নৃত্য দেখাবেন ও এই সংগৃহীত অর্থের অধিকাংশই ধর্মঘটী সংঘকে দেওয়া হবে এবং এই অর্থ বাহুল্যে ভক্তিপরীক্ষিত ভূস্বামীর জন্য ব্যয়িত হবে তখন আমরা আশ্চর্য হইনি।

মানবিক সৌন্দর্যবোধই পরিণত হয় নৈতিক সৌন্দর্যবোধে। এই সৌন্দর্যবোধের শাশ্বত নীতি উদয় শঙ্কর তাঁর শিল্প সৃষ্টিতে অনুসরণ করেছিলেন।

গানের মতো নৃত্যও মানুষের সুখ, দুঃখ, সংঘর্ষ, খেলা, প্রেম সবই ফুটিয়ে তুলবার একটা উজ্জ্বল ও শাণিত হাতিয়ার।

তিনি দেশের দিকে এটা স্বীকার করেছেন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের দৃষ্টান্ত তিনি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন।

উদয়শঙ্কর যখন বোম্বাইয়ে মজদুরদের সামনে, তাঁর অভিনব নৃত্যকলা দেখাচ্ছেন তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না।

আমি বিনয় ও গোবিন্দ বিহারীর কাছে এ সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করি।

একটা জিনিস আমার মনে হয়েছে উদয়শঙ্কর আলমোড়ার নির্জনতা থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে নেমে আসতে পারলেন তারও বিমুক্ত, দৃষ্টিভঙ্গি, মহামায়ী তাঁর শিল্পচৈতন্যের বিচিত্রতাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।

এরপরেই প্রগতি লেখক সংঘ ও বোম্বাই-এর ধর্মঘটী সংঘ উদয়শঙ্করকে একটি সভায় সংবর্ধিত করেন। এই সংবর্ধনাসভায় উদয়শঙ্কর একটি মূল্যবান তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করেন। সেটা আমার মনে হয় সাধারণভাবে সমস্ত সৎ শিল্পীরই প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেন 'আমার জীবনের একটা স্বপ্ন আছে। তেমনি প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে একটা স্বপ্ন থাকা উচিত। স্বপ্ন না থাকলে শিল্পীর জীবনে রইল বা কি?

এই স্বপ্নের সাধনা থেকেই তো আসে সংগ্রামী চেতনা। জীবনকে গভীর ও নিবিড়ভাবে ভালবাসার প্রেরণা। আর এই প্রেরণাই অবহেলিত, শোষিত ও পদদলিত জীবনকে দৈনন্দিন তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে তুলে এক মুক্তিযুক্ত আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করে দেয়।

এই অনুপ্রেরণাতেই আমরা সৈনিক হয়ে উঠি নতুন জীবন সৃষ্টি করার কাজে। ■

উদয়শঙ্কর তাঁর বিখ্যাত 'শঙ্করাভরণম' ছবিতে নৃত্যশিল্পীর ভূমিকায় চিত্রিত হয়েছেন

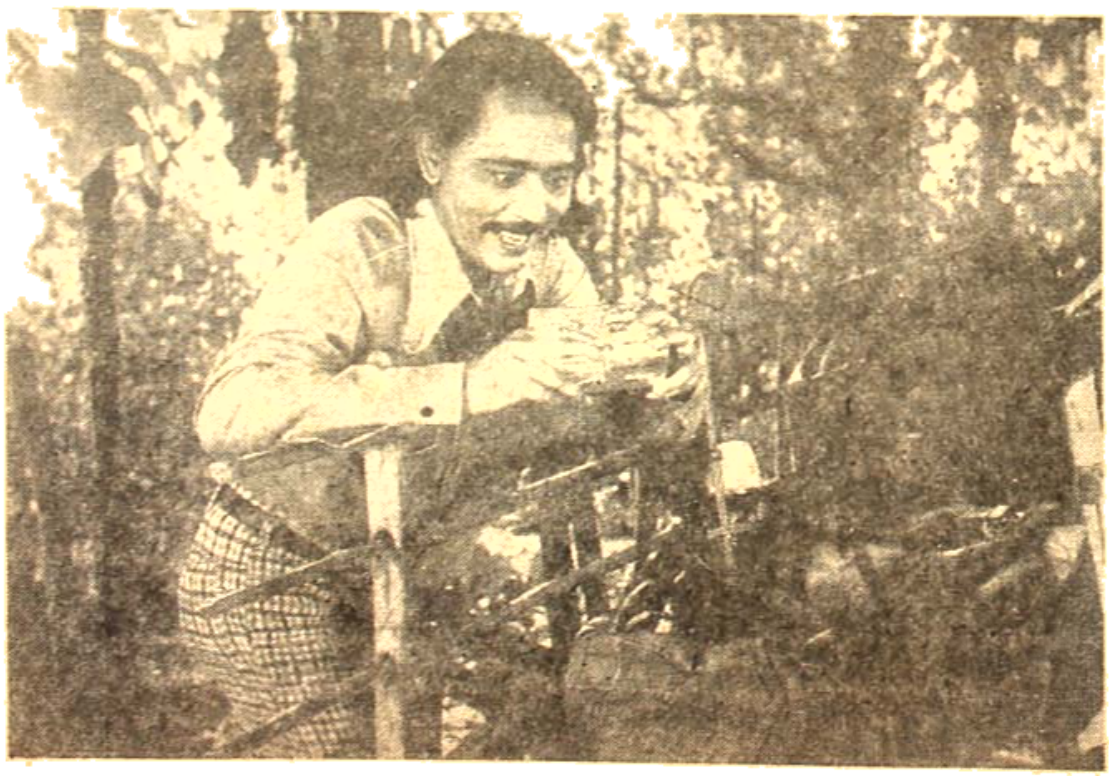

মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই :

পুঁজিবাদী সমাজে চলচ্চিত্রের সমস্যা বলতে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের সমস্যাকেই বুঝতে হবে। শিল্পের সমস্যা অনেক পরে। সংগীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, নৃত্য, নাট্য—ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের নিয়ম-নীতি অগ্রাহ্য করে শিল্পসৃষ্টির কথা এখনও হয়তো ভাবা যেতে পারে, (যদিও আমরা জানি, আর বেশিদিন এভাবে চলবে না, ব্যবসায়ীর সোনার শিকল এদেরও সবাইকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তোলার জন্য মনে-মনে অগ্রসর হচ্ছে) কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এমন চিন্তার অবকাশ নেই। কারণ একটি চলচ্চিত্র তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করতে বহু অর্থের প্রয়োজন অর্থাৎ প্রয়োজন পুঁজির। পুঁজি বিনিয়োগের অর্থ লাভ-লোকসানের হিসেব। এসে গেল ব্যবসায়ের আইন-কানুন। সুতরাং চলচ্চিত্রের সমস্যা মানে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের সমস্যা। তবে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন, শিল্প বাদ দিয়ে চলচ্চিত্র ব্যবসা ঠুঁটো জগন্নাথ। তাই আমরা মাঝে-মধ্যে দু-একটা ভালো ছবির সন্ধান পেয়ে যাই, যদিও তার পেছনেও সেই ব্যবসায়ের হিসেব-নিকেশ।

প্রশ্ন ওঠে, তাহলে বাঙলা ছবির দুর্দিন—এই কথা বলে আমরা সবাই যে হা-হুতাশ করছি, তার মূল কারণও কি ওই পুঁজি-বিনিয়োগ-ব্যবসায়ের নিয়ম-নীতির মধ্যে নিহিত? অবশ্যই। কি ভাবে, একটু খোলাখুলি আলোচনা করা যাক।

একদল ছবি করতে আসেন অনেক টাকা সঙ্গে নিয়ে। যেহেতু অনেক টাকা, সুতরাং তাঁর বড় ছবি।

বাঙলা চলচ্চিত্র বিষয়ে কিছু ভাবনা

—পর্যবেক্ষক

এবং যেহেতু বড় ছবি, সুতরাং পরিচালক, সঙ্গীত পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী—সবাই বড় বড়। অর্থাৎ তারকার ভীড়। ভোক; তাতে আপত্তি নেই কিন্তু সেই ভীড়ের মাঝখানে তিনি নিজেও যখন আর একটি তারকা হয়ে সবার মাঝখানে বিরাজ করার বাসনা প্রকাশ করেন, তখন মনে হয়, ছবি করার জন্য তিনি যাদের সমবেত করেছেন, তাদের ওপর তাঁর আস্থা নেই। ফলে যা হবার, তাই হয়। টাকার অপব্যয়; ছবি জলছবি। ব্যবসায়ের হিসেবে লোকসান। দর্শকরা বললেন, আর একটা বাজে ছবি। বাঙলা ছবির দুর্দিন। স্টুডিও পাড়ার কলাকুশলীরা বললেন, এটাও গেল; তার মানে, এ ছবিটা ফ্লপ হলে উনি হয়তো আর একটা ছবি করতেন; আমরা আবার কাজ পেতাম; তা আর হল না। সত্যিই বাঙলা ছবির বড়ই দুর্দিন। আসলে কিন্তু ব্যবসার অঙ্কেই ওঁর ভুল হয়েছিল—এক, বাঙলা ছবির বাজার সীমিত। সেখানে অতেল টাকা খরচ করে ছবি তৈরির চিন্তা ব্যবসায় নিরপেক্ষ অবিবেচনাপ্রসূত। দুই, পরিচালক-শিল্পী-কলাকুশলীর ওপর নির্ভর না করে সৃষ্টির আঙিনায় অনাহূত প্রবেশের চেষ্টা, যার ফলে ছবি শিল্প হয়ে উঠতে পারল না; ব্যবসায়ে লোকসান হয়ে গেল।

দ্বিতীয় আর একদল ছবি করতে আসেন সামান্য কিছু পুঁজি নিয়ে। তাদের নির্ভর করতে হয় পরিবেশকের দাদনের ওপর। ফলে, ছবি ভালো-মন্দ যাই হোক, প্রায়ই ক্ষেত্রেই প্রযোজকদের ঘরে টাকা ফেরত আসে না। কারণ, ছবি বিক্রির টাকা থেকে পরিবেশক প্রথমেই তার দাদনের টাকা, তার সুদ, পরিবেশনার বাবদ মোটা অংকের কমিশন ইত্যাদি কেটে নেবেন (হিসেবের কারচুপির কথা বাদ দিলাম)। এরও আগে মেটাতে হবে প্রদর্শক অর্থাৎ হল মালিকদের পাওনা; সাদা-কালোয় মোট টিকিট বিক্রির অর্ধেকের বেশি তাদের ঘরেই রয়ে গেল। মোট কথা, অল্প পুঁজি নিয়ে যাঁরা ছবি করতে আসেন প্রায়ই তাঁদের সেই পুঁজির টাকা কাটাও ফেরত পাওয়া হয়ে ওঠে না। ফলে তাঁরা ওই একবারই আসেন; দ্বিতীয়-বার ছবি করার কথা আর চিন্তা করেন না।

বাঙলা ছবির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে, এর কারণ মূলত এই। ছবিই যদি না হয় তাহলে ভাল ছবি আশা করব কি করে? দুর্দিন তাহলে কেন?

এবারে আরও একটা সমস্যার কথা বলা যেতে পারে। স্টুডিও পাড়ায় উটকো লোকের ভীড় যত্র বেড়ে গেছে। নবাগত চিত্র পরিচালকদের ওপর আমাদের অনেক আশা ভরসা; কিন্তু এই 'নবাগত' তকমা এঁটে কিছু অর্বাচীনের দৌরাত্ম্য একদিকে বাঙলা ছবি সম্পর্কে দর্শকদের মনে হতাশা সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে নতুন পুঁজির আগমনে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যাদের বাদ দিয়ে ছবির কথা ভাবা যায় না, অর্থাৎ

ক্যামেরাম্যান, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট, এডিটর ইত্যাদি—এঁদের সবাইকেই হাতে-কলমে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়, তবেই তাঁরা এক একটা বিভাগের দায়িত্ব নিতে পারেন ; কিন্তু এই 'নবাগত' পরিচালকরা মনে করেন, পরিচালনার কাজে শেখার কিছু নেই, কোনো অভিজ্ঞতারও দরকার নেই ; ইচ্ছে করলেই এবং কিছু পুঁজি সংগ্রহ করতে পারলেই, পরিচালক হওয়া যায়। হচ্ছেও তাই। তাঁরা (অর্থাৎ এই "নবাগত"-রা) হয়তো "পরিচালক" হতে পারছেন, কিন্তু তাদের "পরিচালনা"র নীট ফল দাঁড়াচ্ছে বাঙলা ছবির প্রতি দর্শকের বিমুখতা ও সম্ভাব্য ভালো ছবির জন্যে পুঁজির সঙ্কোচন।

সমস্যা আরও আছে। সে বিস্তৃতির মধ্যে না-গিয়ে এবারে একটা প্রশ্ন করা যাক—চলচ্চিত্র কি শিল্প, না ব্যবসা ? এর উত্তর দুই-ই। চলচ্চিত্র স্রষ্টার কাছে এটা শিল্প ; পুঁজি লগ্নীকারকের কাছে এটা ব্যবসা (ব্যতিক্রমের কথা আমাদের আলোচ্য নয়)। পুঁজিবাদী সমাজে এ দুইয়ের সম্মিলন ছাড়া ছবি করার কথা ভাবা যায়না। তাহলে কি ভালো ছবির কথা আমরা ভুলে যাবো ? পুঁজির নির্দেশে তৈরি জলছবিতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে ? আমাদের দুর্দিন ঘুচবে না ?

তা কেন ? সত্যজিৎ-মৃণাল সেন-তরুণ মজুমদাররাও তো ছবি করছেন ; সেখানেও তো পুঁজি খাটছে ; জলছবি তো হচ্ছে না। তাহলে উপায় একটা আছে। তা হল—চোরাকারবারের ট্যাক্সিশন নিয়ে যে পুঁজিদাররা ছবি করে রাতারাতি আরও অনেক টাকা করার জন্যে এ চত্বরে আসেন তাদের সম্পর্কে সচেতন হওয়া। কিন্তু এতে ইনভাস্টিতে পুঁজির ঘাটতি পড়বে, ছবির সংখ্যা কমে যাবে যে। ঠিক কথা। এবং এই ঘাটতি পূরণ করার জন্যে সরকারের দায়িত্বের কথা এসে পড়ে। চলচ্চিত্র থেকে সরকারের কোষে জমা হয় অনেক কোটি টাকা। তার থেকে একটা মোটা অংশ সরকারকে ফিরিয়ে দিতেই হবে (নইলে আগামী ভবিষ্যতে এ-নদী মরুপথে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা)। উদ্যোগী পরিচালক অথবা প্রযোজক যাতে কম খরচে সত্যিকারের ভালো ছবি করার কথা ভাবতে পারেন, সেজন্যে সরকারের তরফে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে। তাকে পুঁজির যোগান দিতে হবে। সবটাই নেবো, কিছুই দেবো না : এ হয় না। অন্য কয়েকটি প্রদেশের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি, তারা কিন্তু এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। নানাভাবে তারা উদ্যোগী পরিচালক-প্রযোজক-দের সাহায্য করার চেষ্টা করছেন। ফলে তথাকথিত পিছিয়ে-পড়া অনেকটি প্রদেশে সত্যিকারের ভালো ছবি তৈরি হচ্ছে ; আমরা দেখছি। সংখ্যায় তারা কিছু কম নয়। সরকারি কোষে টাকাও জমা হচ্ছে, ছবিরও সুনাম হচ্ছে, সর্বোপরি চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কলা-কুশলীরাও সুদিনের মুখ দেখছেন। আমাদের পশ্চিমবাঙলায় কেন তা হবে না ?

এর আরও একটা দিক আছে। সম্প্রতি অপসংস্কৃতি নিয়ে কিছু কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে সরকারি-বেসরকারি উভয় মহলেই। আমরা জানি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণু স্তরে পুঁজিবাদের ধর্মই হচ্ছে সাংস্কৃতিক অবমূল্যায়নের মাধ্যমে জনগণের চেতনাকে বিকৃত করা, তাকে বিপথে চালিত করা। অতএব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অস্তিত্বই বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা। কিন্তু সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির বজ্জাতির বিরুদ্ধে শুধু বক্তৃতা-বিবৃতিই কি যথেষ্ট ? না। বোঝা দরকার, এ শুধু সহর কলকাতা বা শুধু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা নয়। অপসংস্কৃতির বন্যা আজ সারা দেশকে ভাসিয়ে নিতে চাইছে। এর উৎসমুখ অক্ষিষ্ণু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। এর ধারক-বাহক দেশী একচেটিয়া ও বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলি। সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে এদের আধিপত্য। সুতরাং অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াইও হওয়া উচিত অনেক ব্যাপক। এ লড়াই কঠিন লড়াই। রাজনীতি-অর্থনীতির প্রাঙ্গণে লড়ছে শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধেও লড়তে পারে তারাই, এবং সেইসঙ্গে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু শুধু মুখে নয়, বক্তৃতা-বিবৃতিতে নয়। পাল্টা সংস্কৃতির উৎসমুখ খুলে দিতে হবে। ছবির জগতে চিরাচরিত পুঁজি সামগ্রিকভাবে এ কাজের দায়িত্ব নেবে না। দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে। ছবি থেকে যে টাকা রাজকোষে জমা পড়ছে তাকে আবার ছবি তৈরির কাজে ফিরিয়ে দিতে হবে। ভাল ছবি, সুস্থ ছবি তৈরি করতে পারে এবং তৈরি করতে চায়, এমন কলাকুশলীর অভাব নেই। তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

দেশজুড়ে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই আজ তুঙ্গে ওঠার অবস্থায়, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ মানবিক প্রগতিশীল সংস্কৃতির পক্ষে দাঁড়িয়ে সেই সামগ্রিক লড়াইয়ে শামিল হওয়ার অধিকার আমরা বহুকাল আগেই অর্জন করেছি ; আজ বামফ্রন্ট সরকারের সহায়তায় সেই অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব কি আমরা করতে পারি না ? ■

ষাট বছরের অতুলনীয় অগ্রগতি

এল. ভালোদারস্কি

অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে বিগত ষাট বছরে সোভিয়েত রাষ্ট্র যে পথ অতিক্রম করে এসেছে, যে পথের তুলনায় বিশ্বের অন্য কোনো দেশের অগ্রগতি ম্লান হয়ে পড়বে এই তথ্যটি থেকে : এ বছর (১৯৭৭) দেশের বিদ্যুৎউৎপাদন এবং উৎপাদনের উপায় ১৯১৭ সালের তুলনায় যথাক্রমে ২২০ এবং ৪৯৭ গুণ বেড়েছে। সোভিয়েত শিল্প এখন সারা বিশ্বের মোট শিল্পোৎপাদনের ২০ শতাংশ অধিকার করে আছে। সমাজতান্ত্রিক নিয়মনীতি পুরোপুরি সঠিকভাবে অনুসরণ করার ফলেই এ সম্ভব হয়েছে।

এই ভাবেই কৃষিক্ষেত্রেও লেনিনের সমবায় পরিকল্পনার রূপায়ণ এবং পার্টির বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিনীতির ফলে দেশের কৃষি উৎপাদনের এবং কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিকশক্তি, বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ প্রাক-বিপ্লব পর্যায় থেকে যথাক্রমে ৪৪ শতাংশ এবং ৩১ গুণ বেড়েছে।

জাতি-অধিজাতি সম্পর্কে লেনিনবাদী নীতির অবিচল রূপায়ণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল জাতি-অধিজাতির মধ্যে সম্ভাবনার সমতা এনেছে, তাদের সম্পর্ককে আরো ঘনিষ্ঠতর করেছে। সোভিয়েত জনগণের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার ভিত্তিতে যুগে যুগে সৃষ্টি হয়েছে সারা দেশে অসমানুপাত অবলুপ্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

উন্নত সমাজতন্ত্র জনগণের নিরবচ্ছিন্ন সমৃদ্ধিকে নিশ্চিত করে। শিল্প ও নির্মাণকর্মী এবং কৃষকদের প্রকৃত আয় প্রাক-বিপ্লব স্তর থেকে যথাক্রমে ১৩ এবং ১৪ গুণ বেড়েছে ১৯৭৭ সালে, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের ৬০তম বার্ষিকীতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় আয় ১৯১৭ সালের তুলনায় ১০৩ গুণ বাড়বে।

শিল্প

দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বৃহত্তর অংশই এখন শিল্পে নিযুক্ত। ১৯৭৬ সালে শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২·৬ কোটি, ১৯১৩ সালে ছিল ৩৩ লক্ষ। ১৯৭৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে আধুনিক মিল থেকে স্বয়ংক্রিয় লিনসংখ্যার সংখ্যা ছিল ৪৩,০০০টি। বর্তমানে যেসব ৩,০০০-এরও বেশি উৎপাদন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক-উৎপাদন সমবায় হয়েছে—মোট শিল্পের ৪৩ শতাংশই হচ্ছে এদের দায়ভার। গুণগত দিক থেকে, উৎপাদন এবং শিল্প সমবায়, শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা। বিভিন্ন সংস্থার এ-কোনো যান্ত্রিক একীভবন নয়, এ হলো, গুণগতভাবে ধরে বিজ্ঞান ও উৎপাদন এবং যান্ত্রিক বিশেষীকরণ ও সহযোগিতাভিত্তিক একটি একক উৎপাদন-অর্থনৈতিক সমাহার।

১৯৭৭ সালে, প্রথমটি বর্ষে, দেশের শিল্পোৎপাদন ১৯১৭ সালের স্তর থেকে ২২৩ গুণ এবং ১৯৪০ সালের প্রাক-যুদ্ধ-স্তরের থেকে ১১ গুণেরও বেশি বাড়বে। ১৯৪০ সালে সমস্ত বছরে যা উৎপাদিত হয়েছে, এ বছর তার ১১ দিনেই দেশ তা উৎপাদন করতে সমর্থ। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সম্ভারের ক্ষেত্রে উৎপাদনের এই বৃদ্ধি উদ্ধৃতিচিহ্ন থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যাবে :

মোট শিল্পসামগ্রী উৎপাদন

	১৯১৭	১৯৪০	১৯৬৫	১৯৭৫	১৯৭৭ পরিকল্পনা
বিদ্যুৎ (১০ লক্ষ কিলোওয়াট ঘণ্টা হিসেবে)	৪৮·৩				১,১৬০
তেল (জমাটবদ্ধ গ্যাস সহ) (১০ লক্ষ টন)	৩১·১				৪৪০
ইস্পাত (১০ লক্ষ টন)	১৮·৩				১৫২
খনিজ সার (১০ লক্ষ টন)	৩·৩				১৪.৫
মোটরগাড়ি (মোট)	১৪৫·৪				২,০৭১
সকল প্রকার বিদ্যুৎ (১০ লক্ষ কিলোওয়াট ঘণ্টা)	৩,৩২০				১০,৪৪১

সোভিয়েত ক্ষমতার ৫০তম জন্মতিথি পর্যন্ত অতিক্রান্ত পঞ্চাশটি সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন এবং কমিউনিজমের সর্বাত্মক নির্মাণ-কর্মের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করে আছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে দেশ, বলতে গেলে তার অর্থনৈতিক সবকিছুকে বিপরীতে রূপান্তরিত করেছে, এর মধ্যে শিল্পোৎপাদন বেড়েছে বিশগুণেরও বেশি। প্রায় ৪,০০০টি বড় বড় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-সংস্থা চালু করা হয়েছে এবং এক হাজারেরও বেশি কল-কারখানাকে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিষয়ের সাহায্যে সজ্জিত করা হয়েছে। দশম পাঁচসালা পরিকল্পনার শুরুতে শিল্প-শ্রমিকদের মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার ১৯১৩ সালের তুলনায় ৫৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রযুক্তিবিদ্যা

বেসব শাখা আজকের অর্থনীতিতে কারিগরী অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করেছে তাদেরও দ্রুত অগ্রগতি ঘটেছে। ১৯৭৭ সালে মোট শিল্পোৎপাদন ১৯৪০ সালের থেকে ১১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যান্যভাবে বিদ্যুৎ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে ২১ গুণ, রসায়ন এবং পেট্রো-রসায়নে ৫১ গুণ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতু প্রক্রিয়ণে ৫৮ গুণ। ১৯৭১ সালে মোট শিল্প উৎপাদনে ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতু প্রক্রিয়ণে শিল্পের অংশ ছিল ২৫·২ শতাংশ এবং রসায়ন ও পেট্রো-রসায়ন শিল্পে ৬·৮ শতাংশ। গত বছরে যেসব নতুন শাখার দ্রুত বিকাশ লক্ষ্য করা গেছে, তার মধ্যে রয়েছে, পরমাণু শক্তি ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স, মহাকাশ-বিজ্ঞান, লেসার শিল্প এবং অতি বিশুদ্ধ ধাতু উৎপাদন।

গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির ব্যবহার, মহাকাশ গবেষণা সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম শুরু করে এবং এসব ক্ষেত্রে তার অবিশ্বাস্য সাফল্যের ফলে আমাদের দেশ বৈজ্ঞানিক-কারিগরী অগ্রগতির দিক থেকে প্রথম সারির একটি দেশে পরিণত হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০ম পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে শিল্পোৎপাদন বাড়বে ৩৬ শতাংশে। বিভিন্ন উৎপাদনের পরিমাণ : ইস্পাত ২·৭২ কোটি টন, তেল (ঘনীভূত গ্যাস সহ) ১৪·৯২ কোটি টন, কয়লা ১৩·৩৭ টন, বিদ্যুৎ ৩৪,১৪০ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা এবং ৪,৩১০ কোটি টাকা মূল্যের ভোগ্যপণ্যও উৎপাদিত হবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ধাতু-প্রক্রিয়ণ শিল্পের উৎপাদন বাড়বে ১·৫ গুণ, ৭·১ কোটি কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন কেন্দ্রও চালু হবে। এই সময়ে পরিমাণের উৎপাদন বাড়বে দ্বিগুণেরও বেশি।

১৯৪০ সালে সারা দেশে ২৮ দিনে যে পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হতো, ১০ম পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৮০ সালে সে পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হবে ১ দিনে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এর হিসেব দিয়েছি ২৩ দিন, খনিজ সার ৪৩ দিন, তেল (ঘনীভূত গ্যাস সহ) ২১ দিন, মোটরগাড়ি ১৬ দিন, ট্রাক্টর ১১ দিন, ইস্পাত ১ দিন এবং গ্যাস ১২০ দিনের বেশি।

ভোগ্যপণ্য

ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে একথা বলাই যথেষ্ট হবে যে ১৯২৮ সালে সারা দেশে যে পরিমাণ ভোগ্যপণ্য উৎপাদিত হতো ১৯৮০ সালে তা একদিনেই উৎপাদিত হবে।

বিগত দশটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দেশে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন কি পরিমাণ বেড়েছে নিচের তথ্য থেকে তা বোঝা যাবে। ১৯২৮ সালে যেখানে দেশে সুতীবস্ত্র প্রস্তুত হতো ২২০ কোটি বর্গমিটার, সেখানে ১৯৮০ সালে তৈরি হবে ১২৭৫ কোটি বর্গমিটার। আর তৈরি করা পোষাকের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৮৩ লক্ষ এবং ১৮৮·৬ কোটি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক সমাজের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সুবিধার সুষম বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিক বিন্যাসের সমন্বয় এবং অর্থনৈতিক উন্নতির নিবিড় পদ্ধতির দিকে বড় দিক্ পরিবর্তন।

এক কথায়, গত বছরের এবং ১৯৭৭ সালের প্রথম ছ'মাসের ফলাফল দেখে বোঝা যায় যে সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তোলার লেনিনবাদী পথে আস্থার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

the pioneer

SHALIMAR TAR

-still pioneering

TAR AND BITUMEN MASTERS

WE MANUFACTURE

WATER PROOFING FELTS, EMULSIONS,
ANTICORROSIVE PAINTS, SEALANTS,
PIPE COATINGS, PRESS-STICK SEALERS,
CABLE COMPOUNDS, VAPOUR BARRIERS,
ADHESIVES, EXPANSION JOINTINGS,
UNDER BODY COATINGS,
BLOWN BITUMEN, COALTAR EPOXIES,
COALTAR PITCHES, ROAD TARS,
CREOSOTE OIL ETC.

WE EXPORT

WATER PROOFING FELTS,
PIPE LINE PROTECTION MATERIALS,
ANTICORROSIVE PAINTS,
ADHESIVE TAPES, SEALING COMPOUNDS

WE UNDERTAKE

WATER PROOFING, DAMP PROOFING,
FOAM CONCRETING, MASTIC FLOORING,
CIVIL CONSTRUCTIONS AND
VARIOUS OTHER APPLICATION WORKS.

SHALIMAR TAR PRODUCTS (1935) LTD.

Regd. Office : 6, LYONS RANGE, CALCUTTA-700001

Telex : 021-3530 Gram : SHALIMATAR Phone : 22-2305/BA-22-6960

• CALCUTTA, BOMBAY, DELHI, MADRAS.